অলকাপুরী আসাম

শঙ্কু মহারাজ

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ১৯৫৯

প্রকাশক :

এন. চক্রবর্তী

অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন

কলিকাতা ৯

আলোকচিত্র :

সুজয়া গুহ ও অসিত বসু

মানচিত্রের ব্লক :

দে'জ পাবলিশিং-এর সৌজন্যে

মুদ্রাকর :

শ্রীএককড়ি ভড়

নিউ শক্তি প্রেস

১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন

কলিকাতা ৬

খুকু

বুলা

অশোক

ও

ববি-কে

॥ বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী ॥

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ

যাঁদের বই থেকে সাহায্য নিয়েছি :

E. A. Gait—A History of Assam.

Suniti Kumar Chatterjee—The Place of Assam in the History and civilisation of India.

Nirmal Kumar Basu—Assam in Ahom Age.

Varrier Elwin—A Philosophy of NEFA

Mrs. P. H. Moore—Twenty Years in Assam.

B. K. Barua—A Cultural History of Assam.

Hem Barua—Assamese Literature.

Gabrielle Bertland—Secret Land where Women Reign.

Shekhar Gupta—Assam : A Valley Divided.

Sitaram Johuri—Where India China and Burma Meet.

Siddheswar Varma—Bengali, Assamese and Oriya.

Naren Kalita (Editor)—A Descriptive Catalogue of Manuscripts (Batadrava•).

মহেশ্বর নেওগ—পবিত্র অসম

নরেন কলিতা—বরদোয়ার শিল্পবস্তু

ঐ —কপিলীপার কছারীপার

গোবিন্দ তালুকদার—শ্রীশ্রীমাধবদেব স্মৃতিগ্রন্থ

ঐ —মহাপুরুষ শ্রীমাধবদেব

অক্ষয়কুমার মিশ্র ও অন্যান্য—ঐ (সুন্দরীদিয়া)

প্রহ্লাদচন্দ্র দাস—স্মরণিকা : শ্রীশ্রীশঙ্করদেব (পাটবাউসী)

বীরেশ্বর বরুয়া—সুন্দরীত শ্রীশ্রীমাধবদেব মাধবমরল

অতিরাম বরুয়া আরু অন্যান্য —স্মরণীয় বরণীয় যাঁরা

অলকাপুরী আসাম

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

অমরতীর্থ অমরনাথ

অমরাবতী আসাম

উর্বশী এথেন্স

কুম্ভমেলায়

গঙ্গা-যমুনার দেশে

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে

দ্বারকা ও প্রভাসে

বেলজিয়াম থেকে বাভেরিয়া

ব্রহ্মলোকে

ভাঙা দেউলের দেবতা

মধু-বৃন্দাবনে (ব্রজপর্ব, বনপর্ব ও মহাবন পর্ব)

যদি গৌর না হ'ত

রাজভূমি রাজস্থান

লীলাভূমি লাহুল

হিমতীর্থ হিমাচল

বৈষ্ণোদেবীর দরবারে

ও

সংহতি—পথে পথে

লেখকের অন্যান্য কয়েকখানি জনপ্রিয় গ্রন্থ

কাশীখণ্ড

এক ফরাসী নগরে

এবার বুঝি ভোলার বেলা হ'ল

চিত্রকূট

জয়ন্তী জুরিখ

তমসার তীরে তীরে

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

ব্যাঙ্কক ও সিঙ্গাপুরে

মায়াময়-মেঘালয়

রমণীয়া রোম

রূপতীর্থ খাজুরাহো

সোনা সুরা ও সাকী

হিমালয় (অমনিবাস : প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)

ফুলাম গামোছা দেবার পরে — বাঁদিক থেকে অশোক, ইন্দিরাদি, দিলীপবাবু ও লেখক।

পাটবাউসী সত্রের নামঘর ও অন্যান্য মন্দির।
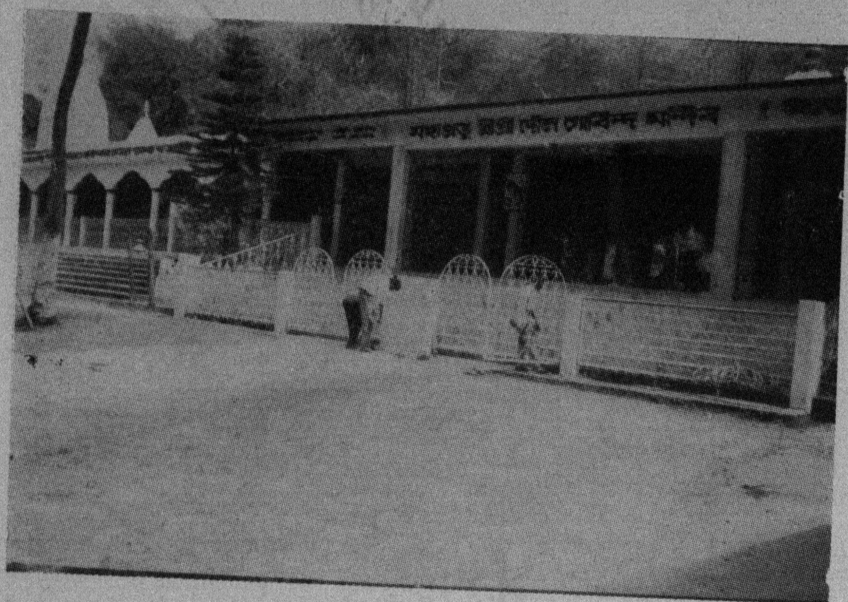
দৌলগোবিন্দ মন্দির।
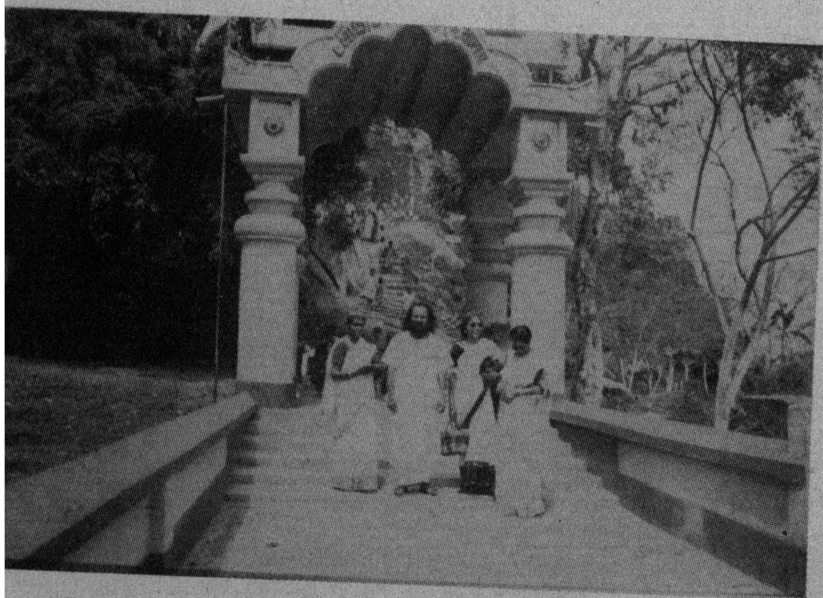
দীর্ঘেশ্বরী মন্দিরের প্রধান তোরণ।
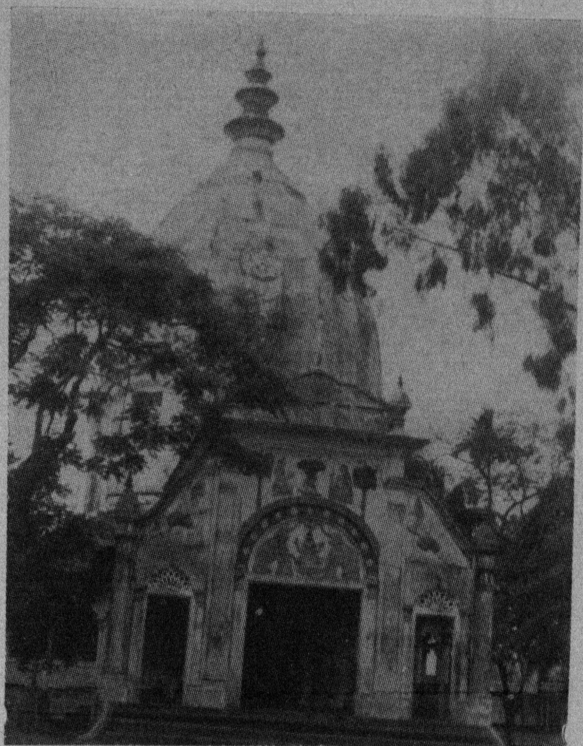
শ্রীশঙ্করদেবের সমাধিমন্দির — মধুপুর সত্র, কোচবিহার।
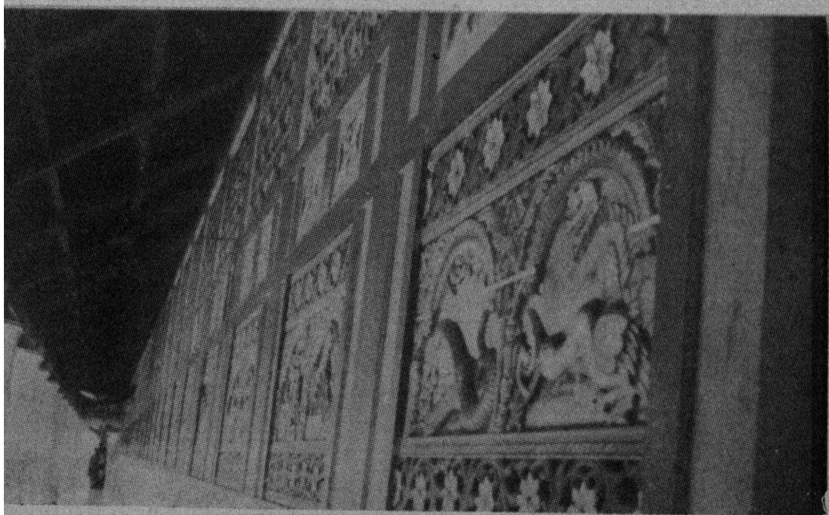
বরপেটা নামঘরের দেওয়ালে দারুশিল্প।

শ্রীশঙ্করদেবের জন্মভূমি বরদোয়ায় সত্র।
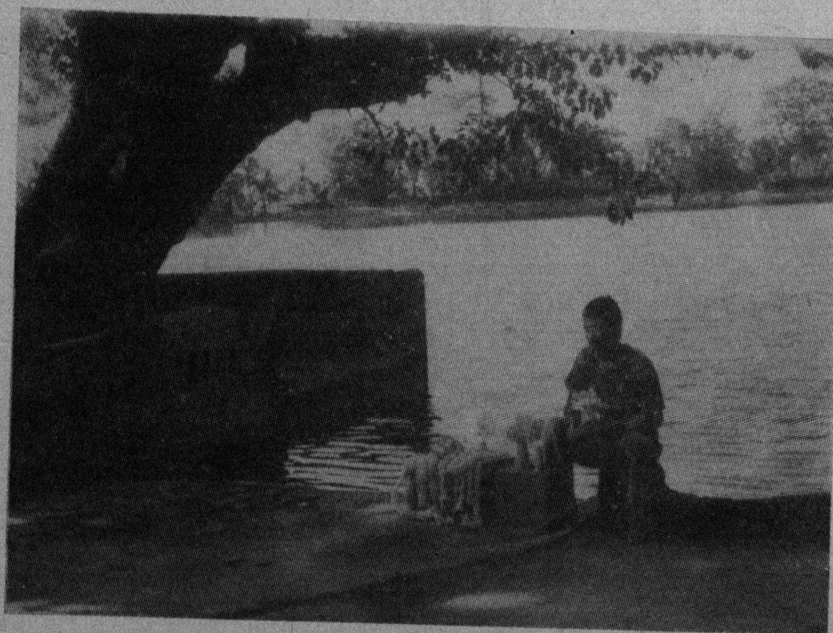
বরদোয়া সত্রের আকাশগঙ্গা।

আবার আসামের কথা বলতে বসলে, যেখানে 'অমরাবতী আসাম' শেষ করেছিলাম, সেখান থেকেই শুরু করতে হয়।

কিন্তু সে তো পনেরো বছর আগের কথা। এই বছরগুলোতে যে ব্রহ্মপুত্র বেয়ে বহুজল পদ্মায় পড়েছে। শান্ত আসাম বার বার অশান্ত হয়ে উঠেছে। কখনো প্রাদেশিকতা, কখনো সাম্প্রদায়িকতা, কখনও বা বিচ্ছিন্নতাবাদ। হিংসার বিষবাষ্পে মাঝে মাঝেই মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসতে চেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব পড়েছে সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ওপরে।

তাহলেও যখন নিজেকে জিজ্ঞেস করি—এই বিচ্ছিন্নতা, স্বার্থপরতা আর নিষ্ঠুরতায় কি আসামের মানুষের বুকভরা ভালোবাসা কিছুমাত্র কমে গিয়েছে?

আমার মন বলে ওঠে—না।

আর এই কথাটি শোনাবার জন্যই আজ আমি আবার আসামের কথা বলতে বসেছি।

কিন্তু আজকের কথা পরে হবে, সেদিনের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। সেদিন সেই শীতের অপরাহ্ণে আমার অসমীয়া বোন প্রগতি শর্মা চোখের জলে আমাকে বিদায় দিল গুরাহাটী বিমানবন্দরে। বিদায়বেলায় কোনমতে বলল—দমদমে ল্যাণ্ড করেই একটা পোস্টকার্ড ড্রপ করে দেবেন।

—হ্যাঁ। আমি ওকে আশ্বস্ত করেছি। আর আমার তখুনি মনে পড়েছে, বাড়ি থেকে আসামে রওনা হবার সময় আমার মা আমাকে একই কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

সেদিন তারপরে একসময় বোয়িং ৭৩৭ মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল—আসামের আকাশে। কিছুক্ষণ বাদে সে আসামের আকাশ থেকে বাংলার আকাশে পৌঁছল। আর আমার তখুনি মনে হল—মাটি নিয়ে যতই ভাগাভাগি হোক, আকাশের কোন ভাগ নেই। আকাশ এক এবং অখণ্ড। সে ঈশ্বরের মতই অসীম ও অনন্ত। আমি একই আকাশের বুক বেয়ে আসামের মাটি থেকে বাংলার মাটিতে ফিরে এলাম।

সেবারে আসামে আসার আগে গোয়ার ওপরে একখানি বই লিখতে শুরু করেছিলাম। আসাম থেকে ঘরে ফিরে মনে হল, আর গোয়ার ভ্রমণকাহিনী এখন নয়, আগে আসামের কথা লিখে ফেলা যাক। গোয়ার কাগজপত্র তুলে রেখে 'অমরাবতী আসাম' লেখা শুরু করে দিলাম। বছরখানেক বাদে বইখানি প্রকাশিত হল।

বই পড়ে প্রগতি লিখল—

"...'অমরাবতী আসাম' কাল পেলাম। পাবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে ফেলেছি। কি বলব? আমরা যা, তার চেয়ে আমাদের অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছেন।

…আপনার 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' পড়ে, অমূল্য সেনের প্রতি আপনার স্নেহ দেখে আমার ভারি হিংসে হয়েছিল। তখন তো আর কল্পনা করতে পারিনি যে আমিও একদিন আপনার বোনের আসনে বসতে পারব। তাই অমূল্যদার প্রতি এখন আমার আর কোন ঈর্ষা নেই।

শঙ্কুদা, বাংলা আমার খুব প্রিয় ভাষা। আর কেনই বা তা হবে না? যে ভাষার সাহিত্য আমার মানসিক উৎকর্ষ সাধন করে চলেছে, সে ভাষাকে তো আমার ভালোবাসতেই হবে। তবে কি জানেন, স্বার্থান্বেষী কিছু লোক সব ভাষাভাষীদের মধ্যেই থাকে। তাদের প্ররোচনায় ভাই ভাইকে ভুল বোঝে, তাদের ভেতর বিবাদ বাধে।… আজকের যুগে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির চেষ্টা না করে ভাষা নিয়ে বিবাদ করাটা যে বড়ই সংকীর্ণতার পরিচয়! সবার উন্নতিতেই তো দেশের উন্নতি।…

যাঁরা আজও আসামে আসেননি, তাঁদের ধারণা আসাম শুধুই জঙ্গলময়। এই ধারণার জন্য দায়ী আমরা, অসমীয়ারা। কারণ আমরা নিষ্ক্রিয়, আমরা নীরব। আপনার এই বই পড়ে বহু বাঙালির ধারণা পালটাবে। তাই আসাম আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইল।…"

আজও অবাক হয়ে ভাবি, তখন ওর কতই বা বয়স? সতেরো—আঠেরো, গুয়াহাটী কটন কলেজে হায়ার সেকেণ্ডারি পড়ে।

ওর বাবা শ্রীদ্বিজেন শর্মা জোড়হাটে একটি কলেজের অধ্যক্ষ। ওর মা-ও স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ওরা দু-বোন ও এক ভাই। প্রগতি সবার বড়। সে বেশ ভালভাবে মাধ্যমিক পাশ করেছিল। দ্বিজেনবাবুর বড় আশা প্রগতিকে তিনি ডাক্তারি পড়াবেন। আর তাই তিনি ওকে গুয়াহাটী কটন কলেজে ভর্তি করে দিলেন। দীঘলপুখুরির পুবপারে শহীদ কনকলতা ছাত্রীনিবাসে সে থাকত। সেখানেই ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা।

কিন্তু এসব কথা বলা হয়েছে অমরাবতী আসামে। অতএব পুরনো কথা থাক। যেকথা বলা হয়নি, সেই কথাতেই আসছি। ঐ বয়সে এমন বুদ্ধি-বিবেচনা ও দরদী মনের অধিকারিণী হয়েও প্রগতি তার বাপ-মায়ের আশা পূর্ণ করতে পারে না। পরীক্ষায় আরও ভাল ফল করার আশায় দ্বিজেনবাবু তাকে জোড়হাট থেকে গুয়াহাটী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরীক্ষার ফল ভাল হল না। সে নিজেই আমাকে লিখল—

"...আমার ডাক্তারি পড়ার খুবই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। আপনি জেনে তুঃখিত হবেন, আমার 'রেজাল্ট' ভাল হয়নি। মা-বাবা ভীষণ আঘাত পেয়েছেন। বাবা বলেছেন, আমাদের বাড়ির সামনে একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেবেন। তাতে লেখা থাকবে—'House of idiots'..."

হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার পর প্রগতি গুয়াহাটী থেকে জোড়হাটে ফিরে গিয়েছিল। পাশ করার পরে সে আর গুয়াহাটী এলো না। জুলজি অনার্স নিয়ে জোড়হাটেই বি. এস-সি. ক্লাসে ভর্তি হল।

সেই বছরেই আমি দ্বিতীয়বার আসামে আসি। আসি আমার পাঠক-পাঠিকার আমন্ত্রণে। আসার আগে ওর চিঠি পেলাম—

"এবারে জোড়হাট এসে কিন্তু আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে, আগেই বলে রাখছি। আর কারও বাড়িতে আপনাকে আমি কিছুতেই থাকতে দেব না। এবারে আমি ও আমার বোন লিবি আপনাকে কাজিরাঙা অভয়ারণ্য দেখাতে নিয়ে যাবো।"

গিয়েছিলাম। রতনবাবুর (রত্নশম্ভু নাগ) সঙ্গে তাঁর গাড়িতে আমরা তিনজন, প্রগতি লিবি ও আমি, কাজিরাঙা গিয়েছিলাম। বন্ধুবর দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তখন জোড়হাটের ডেপুটি

কমিশনার। তিনিই আমাদের ফরেস্ট রেস্ট হাউসে থাকা-খাওয়া ও বন-ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, আসামের বিভিন্ন প্রান্তের পাঠক-পাঠিকাদের আমন্ত্রণে সেবারে আমার আসামে আসা। তাই জোড়হাটে বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি। একদিন আবার চোখের জলে প্রগতি আমাকে বিদায় দিল।

আর কেবল একা প্রগতির কথাই বা বলি কেন? ওর বোন লিবি, ভাই প্রাঞ্জল, বাবা দ্বিজেনবাবু এবং মা। ওর মা তো আগের দিন প্রায় সারারাত জেগে আমার স্ত্রীর জন্য একখানি তাঁতের চাদর বুনেছেন। তাছাড়া সস্ত্রীক রতনবাবু, সুবোধবাবু, দুই সুনন্দা, দুষ্টুবাবু ও পল্টন, ডাক্তার মুখার্জি, রবীনবাবু এবং লক্ষ্মী ইউনিয়ন বেঙ্গলি ক্লাবের বেশ কয়েকজন সদস্য দুঃখের সঙ্গে বিদায় জানালেন আমাকে।

তাঁদের প্রায় সবাইকে বার বার বলতে হল—আবার দেখা হবে। আমি আবার জোড়হাটে আসব।

দুর্ভাগ্যের কথা, সে প্রতিশ্রুতি আর পালন করা হয়ে ওঠেনি। কেন? সেকথা এখন থাক। কেবল বলে রাখি তার পরেও আমি বার পাঁচেক আসাম এসেছি। কিন্তু একটি দিনের জন্যও জোড়হাট যাইনি। যাওয়া সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। কারণ জোড়হাট এখন আর আমার আনন্দ নিকেতন নয়, শুধুই বিষাদসিন্ধু।

কিন্তু এবারের কথা পরে হবে, আগে সেদিনের কথা শেষ করে নিই। সেদিন জোড়হাট থেকে যে প্রাণময় তরুণটি আমাকে লামডিং পৌঁছে দিয়েছিল, তার নাম বিশ্বনাথ সেন।

অমরাবতী আসাম পড়ে সে আমাকে প্রথম চিঠি লেখে। অনেক কথার মধ্যে লিখেছিল—

"...আপনি সেই মানুষ যিনি আসাম আর বাংলার মধ্যে সুয়েজ-খাল খনন করলেন। এবং এই খাল দিয়ে কি জল বইবে জানেন, ঐক্য মিলন ও সংহতির জল।..."

স্বাভাবিকভাবেই আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমাদের মাঝে নিয়মিত পত্র-যোগাযোগ ছিল। তাই সেবারে জোড়হাটে সে প্রায় আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়েছিল। একা লামডিং যাচ্ছি শুনে বলে বসল—আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

আমার কোন আপত্তিই শুনল না বিশ্বনাথ। শেষ পর্যন্ত সে আমার সঙ্গী হল। একসময় গাড়ি ছেড়ে দিল। প্রগতিরা হারিয়ে গেল।

নীরব কিছুক্ষণ। তারপরে বিশ্বনাথ বলে—কালরাতে বাড়ি ফেরার পরে আজকের কথা নিয়ে একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলাম।

পকেট থেকে কাগজখানি বের করে সে আমার হাতে দেয়। আমি পড়তে শুরু করি—

"কাকু তুমি চলে গেলে
কি হবে তা জানো না,
প্রথমেই সকলে
জুড়ে দেবে কান্না।
চোখের কোলে আসবে জল
হাতে নেবে রুমাল
কিম্বা শাড়ির আঁচল,
চোখ হবে জবা-লাল।
ফুলে যাবে দুটি গাল।
তারপরে পড়ার ঘরে ছুটে যাবে
কাগজ-কলম নিয়ে বসবে
লিখতে তোমায় চিঠি···"

জীবনে যাঁরা কবিতা না লিখে লেখক হয়েছেন, আমি তাঁদেরই একজন। সুতরাং জোড়হাটের ব্যবসায়ী শ্রীতারক সেনের ছেলে ও হায়ার সেকেণ্ডারি ক্লাশে পাঠরত বিশ্বনাথের এই পঙক্তিগুলো কবিতা হতে পেরেছে কি না জানা নেই আমার। তবে সেদিন সেই কিশোর

বালকের ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম বলেই আজ এই পঙক্তিগুলো পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিলাম।

এবং এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, এই সময় বিশ্বনাথ আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখত। আর তার প্রায় সব চিঠিতেই এ ধরনের কবিতা থাকত। যেমন সে আরেকখানি চিঠিতে লিখেছিল—

"প্রজা নও, রাজা নও,
মহারাজ তুমি।
তোমারই আলোকে উদ্ভাসিত
এই পুণ্য-ভূমি॥"

কিম্বা—

"সময় হোল যাবার
তুমি যাও চলে যাও,
বিদায় বেলায় শুধু
আমার প্রণামটুকু নাও।"

এ রকম আরও অনেক। এবং এ সম্পর্কে সে নিজেই একবার লিখেছে—"এসব কবিতা নয়, খিচুড়ি। কিন্তু কাকু, বিশ্বাস করুন, এগুলো সবই আমার মনের কথা।"

বিশ্বাস করেছি বৈকি। এবং আজ এতবছর বাদেও সে বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি। কেবল দুর্ভাগ্যের কথা দীর্ঘকাল ধরে তার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। এমনকি চিঠি লিখেও জবাব পাইনি। তবে আমার বিশ্বাস সে জীবনে বড় হয়েছে এবং যেখানেই থাকুক, ভাল আছে, সুখে আছে, শান্তিতে আছে।

আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক। আমাকে লামডিং পৌঁছে দিয়েই বিশ্বনাথ বিদায় নিল। রাতের বাস ধরে জোড়হাট ফিরে গেল। পরদিন কলেজে ওর কি একটা জরুরি ব্যাপার ছিল।

লামডিং নগাঁও জেলার হোজাই মহকুমায় একটি বর্ধিষ্ণু শহর।

কিন্তু শহর নয়, রেল-জংশন হিসেবেই লামডিং বেশি পরিচিত। এখানেই এন. এফ. রেলওয়ের ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার্স। গৌহাটি থেকে লাইন এখানে এসেছে। এখান থেকে একটি লাইন গিয়েছে মারিয়ানী ও তিনসুকিয়া হয়ে ডিব্রুগড়। আরেকটি উত্তর-কাছাড়ের পার্বত্য জেলায়—হাফলং ও বদরপুর লামডিং-হাফলং-বদরপুর লাইনটি ভারতের একটি সুন্দরতম রেলপথ।

বদরপুর থেকে একটি লাইন গিয়েছে শিলচর আরেকটি করিমগঞ্জ হয়ে ত্রিপুরার ধর্মনগরে। সেখান থেকে বাসে আগরতলা যাওয়া যায়।

লামডিং-তিনসুকিয়া রেলপথের মারিয়ানী জংশন থেকে একটি লাইন প্রসারিত হয়েছে জোড়হাট। এই পথেই বিশ্বনাথের সঙ্গে আমি আজ লামডিং এসেছি। কিন্তু জোড়হাট থেকে বাসযোগে লামডিং যাতায়াত অপেক্ষাকৃত সহজ বলে বিশ্বনাথ বাসযোগে জোড়হাট ফিরে গেল।

যাক্‌গে, আবার লামডিঙের কথায় ফিরে আসা যাক। লামডিঙের উত্তর-পশ্চিমে কারবি-অ্যাংলঙ আর দক্ষিণে উত্তর-কাছাড় জেলা। অর্থাৎ যে দুটি পার্বত্য জেলা এখনো আসামে রয়ে গিয়েছে।

কাছাড়ের সঙ্গে লামডিঙের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। কারণ লামডিং নামটিও এসেছে কছাড়ি ভাষা থেকে। কছাড়ি ভাষায় 'লাম' শব্দের অর্থ 'জল' আর 'ডিং' শব্দের মানে 'নেই'। যে জায়গায় জল নেই, তার নাম লামডিং। কথাটা মিথ্যে নয়। লামডিং শহরের ১২ কিলো-মিটার বৃত্তের ভেতরে কোন বারোমেসে জলের উৎস (Perennial natural water source) নেই।

এখান থেকে জেলাসদর নগাঁও ১১০ কিলোমিটার। লামডিং নগাঁও জেলার দ্বিতীয় জনবহুল শহর। তখনও প্রায় হাজার পঁয়ত্রিশ মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। এখন অনেক বেশি। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী লামডিং শহরের জনসংখ্যা ৪৬,০৬৪ জন। এবং এই জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলা ভাষাভাষী।

ব্যবসা-বাণিজ্যের বিচারেও লামডিং নগাঁও জেলার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এ অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন তুলা ও কাঠ। এ ছাড়া এখানে কয়েকটি মোম ও বাক্স তৈরির কারখানা রয়েছে। এখান থেকে জোড়হাট, ডিব্রুগড়, ডিফু, হোজাই, লঙ্কা, নগাঁও, গুয়াহাটী ও হাফলঙে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। হাফলং একটি রমণীয় স্বাস্থ্যকর স্থান।

লামডিঙে রয়েছে রেল ও বন বিভাগের ডাকবাংলো এবং একটি-মাত্র কলেজ। সেই কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী উমা ভৌমিকের আগ্রহেই আজ আমাকে লামডিং আসতে হল। জোড়হাটে আসার অনেক আগেই সে আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। লিখেছে—

"দাদা, আপনার 'অমরাবতী আসাম' এখানে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের বাড়িতেই স্থান করে নিয়েছে। সেদিন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, অসমীয়া ও ইতিহাস বিভাগেও বইখানি দেখলাম। দেখে খুব ভাল লাগল। আমার মনে হয় এখানি আপনার সবচেয়ে প্রশংসিত প্রামাণ্য গ্রন্থ।...

আমাদের আগামী সাহিত্য অধিবেশনে আপনাকে আসতেই হবে।..."

অতএব এসেছি। এবং এসে বুঝতে পারছি, না এলে অন্যায় করা হত। এঁরা আমাকে বড্ড ভালোবাসেন।

উমা ছাড়াও লামডিং শহরে আমার আরও কয়েকজন পরিচিত হিতার্থী আছেন। তাঁদের মধ্যে যে কয়েকজনের নাম মনে পড়ছে, তাঁরা হলেন—অজয় বসু, মানিককর গুপ্ত, কবীন্দ্রনাথ দাস, বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, নিখিল চক্রবর্তী, শেখর দাস ও বাণীকান্ত শইকীয়া এবং মনমোহন পাল।

দুর্ভাগ্যের কথা সেবারে মনমোহনবাবুর সঙ্গে দেখা হল না আমার। কারণ তার কিছুদিন আগেই সেই জনপ্রিয় বিদগ্ধ অধ্যাপক

অকালে অমরলোকে মহাপ্রস্থান করেছেন। আমরা তাই অধিবেশনের শুরুতেই তাঁর স্বর্গগত আত্মার শান্তি কামনা করেছি।

অধিবেশন শুরু হয়েছে পরদিন সকাল ন'টায়। প্রথমেই শ্রীশেখর দাস তাঁর বক্তব্যে নিবেদন করলেন—

"একটু আলো। একটু বাতাস। চাওয়াটা কি অন্যায়? পাওয়া কি যায় না?....

ঐ তো দূরে মসীলিপ্ত আকাশের গায়ে নতুন চন্দ্রচ্ছটা। ছোট্ট একটি প্রচেষ্টা। কতক সবুজ প্রাণের। কতক আবেগ। কতক যন্ত্রণা। কিছুটা আবার নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। শান্ত-স্নিগ্ধ সুখের আবেশ।...

সামাজিক, অস্থিরতার অরাজক পরিস্থিতিতে কোন কিছুর যথার্থ মূল্যায়ন করা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবুও একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে যতদিন মানবিকতা, বিবেকচেতনা, অন্তর্দৃষ্টি, সৃজনক্ষমতা ইত্যাদির অনুমাত্র মানুষের রক্তমাংসে থাকবে, ততদিন এ পৃথিবীতে সাহিত্য-সংস্কৃতির গতিধারা অব্যাহত থাকবে।

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, লামডিং শাখার জন্ম এই তো সেদিন। তথাপি সদস্য-সদস্যা ও সমর্থকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আজকের এই প্রথম শাখা অধিবেশন। বিগত সর্বভারতীয় বোম্বাই অধিবেশনে আসাম রাজ্য সমিতির সাংগঠনিক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন।... সারা ভারতকে যদি আসাম পথ দেখাতে পারে তবে লামডিং কেন আসামকে পথ দেখাতে পারবে না?

...সত্যিকারের সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়েই কেবল ধ্বংসোন্মুখ বিভ্রান্ত সমাজের অবক্ষয়কে রোধ করা সম্ভব।... তাই দলীয়, গোষ্ঠীগত সর্বপ্রকার সংকীর্ণ চক্রান্ত থেকে সাহিত্যাঙ্গনকে মুক্ত রাখার জন্য আমাদের বিবেকবুদ্ধিকে সদাজাগ্রত রাখতে হবে। এই শুভ প্রচেষ্টার অংশীদার হতে আমি আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।..."

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে বিকেল তিনটায় শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রখ্যাত ভাষাবিদ হরিনাথ দে মহাশয়ের জন্ম-শতবার্ষিকী পালিত হল। আর বিকেল সাড়ে ছ'টায় রেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউটে অধ্যক্ষ নিখিল চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে শুরু হল প্রকাশ্য অধিবেশন। অধ্যাপক বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য ভারি সুন্দর বক্তব্য রাখলেন। তার পরে···

তারপরে যে ঘটনাটি ঘটল, সেটির কথা ভেবে আজ ভাল লাগলেও সেদিন সভামঞ্চে বসে বড়ই লজ্জিত বোধ করেছিলাম। তাহলেও কথাটা বলতে হচ্ছে। কারণ আমার প্রতি আসামের মানুষের ভালোবাসা যে কতখানি স্বতঃস্ফূর্ত এটি আজও তার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

বিবেকানন্দবাবু ভাষণ পাঠ করার পরে সভাপতি ঘোষণা করলেন—এবারে লামডিং অরুণোদয় সাহিত্য সভার পক্ষ থেকে শ্রীবাণীকান্ত শইকীয়া শঙ্কু মহারাজকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

শ্রীশইকীয়া মঞ্চে উঠে এলেন। সভাপতি ও আমাকে নমস্কার জানিয়ে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে একখানি কাগজ বের করে পড়তে শুরু করলেন—

"···বৈচিত্রপূর্ণ ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বৈচিত্রপূর্ণ জনগোষ্ঠী, সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি আৰু অসংখ্য লোকগাঠাবে (লোকগাঁথায়) পৰিপূর্ণ এইখন (এই) অসম ৰাজ্য। চলমান সংঘাতপূর্ণ জীৱনৰ কৰ্মেৰে (কৰ্মে) মুখৰিত বিভিন্ন ভাষাভাষী বর্ণ ধর্ম আৰু নানা জাতি উপ-জাতিৰে বসতি এইখন লামডিং চহৰলৈ (শহরে) আপোনাৰ শুভাগমনত (শুভাগমনে) আমি (আমরা) নথৈ (অতিশয়) আনন্দিত হৈছো (হয়েছি)।

অসমৰ (আসামের) বুদ্ধিজীবি আৰু পঢ়ুৱৈ (পাঠক) সমাজত (সমাজে) আপোনাৰ নাম সুপৰিচিত। আপোনাৰ ভালেমান (অনেক) ৰচনা অসমীয়া ভাষালৈ (ভাষায়) অনুদিত হৈছে (হয়েছে) আৰু সেইবোৰ (সেগুলো) পঢ়ুৱৈ সমাজত সমাদর লাভ

কৰিছে। আপোনাৰ লিখনিয়ে (লেখনী) ভাৰতীয় সাহিত্যৰ ভড়ালত (ভাণ্ডারে) এক স্বকীয়া (স্বকীয়) মর্যাদা লাভ কৰিছে।

লামডিং অৰুণোদয় সাহিত্য সভায়ে আপোনাৰ নিচিনা (মতো) গুণী সাহিত্যিকক আজি আদৰিবলৈ পাই (সম্বর্ধনা জানাতে পেরে) গৌৰব অনুভব কৰিছো।..."

রাত দশটা নাগাদ সভা শেষ হল। খাবার পরে উমা আমাকে ডাকবাংলোয় নিয়ে এলো। আমি একা থাকব, তার ওপর অনেক রাত। উমা আর হস্টেলে ফিরল না। ডাকবাংলোতেই রয়ে গেল।

বাথরুম সংযুক্ত ডাব্‌ল-বেড রুম। হাত-মুখ ধুয়ে দুজনে দুখানি খাটে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে বেশ কিছুক্ষণ গল্প। নানা গল্প। সাহিত্য দিয়ে শুরু আর নিজেদের কথা নিয়ে শেষ। উমা এখানে একা থাকে। বাকি সবাই গৌহাটিতে। ওর বাবা গত হয়েছেন। মা আছেন। দাদা সংসারের কর্তা।

কথা বলতে বলতে একটু একটু করে উমা নীরব হয়ে গেল। অন্ধকারেও বুঝতে পারলাম, ক্লান্ত উমা নিজের অলক্ষ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমাক উমা। ঘুম ওর সকল ক্লান্তি দূর করুক। শান্ত-সুন্দর স্বপ্ন-সুমধুর ঘুম।

কিন্তু ঘুম নেই আমার চোখে। আমি এক অভূতপূর্ব আবেশে উদ্বেল হয়ে ভেবে চলেছি আসামের সাহিত্য-সুরসিক প্রাণময় মানুষগুলির কথা। আমার প্রতি তাঁদের ভালোবাসার কথা, বিশ্বাসের কথা।

উমা অধ্যাপিকা হলেও অবিবাহিতা এবং সে যুবতী। আমি লেখক হলেও প্রৌঢ় নই এবং সন্ন্যাসী নই। অথচ উমা তার সকল সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে এবং সামাজিক সমালোচনার কথা বিস্মৃত হয়ে আমার সঙ্গে একই ঘরে রাত্রিবাস করছে।

কৃতজ্ঞতায় আমার বুকখানি ভরে উঠল। দুহাত জোড় করে আমার জীবনদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করলাম—ঠাকুর,

আমার প্রতি মানুষের এই ভালোবাসা তুমি অবিচল রেখো। তাদের এ বিশ্বাসের মর্যাদা যেন আমি রক্ষা করতে পারি। আর তুমি আমাকে এঁদের যোগ্য করে তোলো।

লামডিং থেকে লঙ্কা। লঙ্কা নগাঁও জেলার চতুর্থ শহর। অর্থাৎ শহর হিসেবে নগাঁও লামডিং এবং হোজাইয়ের পরেই লঙ্কার স্থান। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী লঙ্কার স্থায়ী জনসংখ্যা ১৯০৪৪ জন। এটি হোজাই মহকুমার অন্তর্গত। অর্থাৎ লঙ্কার অবস্থান আসামের শস্যভাণ্ডার হোজাই অঞ্চলে। ছোট শহর হলেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এখানে রাজ্য সরকারের রেভিনিউ সার্কেল অফিস ও ব্লক ডেভেলপ-মেণ্ট অফিস আছে। আছে কয়েকটি স্কুল ও একটি কলেজ, কয়েকটি ব্যাঙ্ক ও ডাকবাংলো এবং একটি টাউন কমিটি। তাঁরাই শহরটির রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আর রয়েছে চার-পাঁচটি চালকল, কয়েকটি স' মিল্‌স মানে কাঠ চেড়াইয়ের কারখানা।

চাল ও কাঠের পরেই লঙ্কার উল্লেখযোগ্য উৎপাদন পাট সর্ষে ও কলাইর ডাল এবং শাক-সবজি।

হোজাই-লামডিং রেলপথের ওপরে অবস্থিত এই জনপদটি মোটর-পথে আসামের সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। এখান থেকে নিয়মিত সরকারি ও বেসরকারি বাস যাতায়াত করে হোজাই লামডিং ডিফু এবং নগাঁও।

আমি লামডিং থেকে লঙ্কা গিয়েছি। না, কোন সভা নয়। গিয়েছি আমার দুজন পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে পরিচিত হতে। নীল শইকীয়া আর বেলা দে (এখন চক্রবর্তী হয়েছে)। নীল আমাকে লিখেছে—

"অচিনাকী (অচেনা) ছোট ভাইৰ ভক্তি লব। অচিনাকী কোৱাটা (বলাটা) মোৰ উচিত হোৱা (হয়) নাই। কাৰণ মই

আমি) ভাৱো (মনে করি) আপনালোকৰ (আপনাদের) দৰে (মতো) সুবিখ্যাত সাহিত্যিক সকলৰ আত্মা বোৰে (সমূহ) পৃথিবীৰ প্ৰত্যেক জন-জাতিৰ, প্ৰত্যেক জন-লোকৰ (লোকের) আত্মাৰ লগত (সঙ্গে) সুপৰিচিত।…

আপোনৰ ভ্ৰমণকাহিনী অমৰাবতী আসাম, গঙ্গাসাগৰ, তমসাৰ তীৰে তীৰে, মধু-বৃন্দাবনে, পুণ্যতীৰ্থ প্ৰভাস ইত্যাদি কিতাপ বোৰে (বইগুলো) আপোনাৰ আত্মাৰ লগত চিনাকী (পরিচয়) কোতয়া-ৱায়েই (অনেকদিন আগেই) কৰিলে (হয়ে গিয়েছে)।

আজি খু-উ-ব আনন্দ লাগিছে, এটা (একটা) খবর পায় (পেয়ে)। আপোনাক যে দেখা পাম। আপুনি লংকা আহিব, এই খবৰ দিদিৰ পৰা (কাছে) জানিব পাৰিলো। দাদা, আপোনাক (আপনার) দেখা পাম (পাবো), আপোনাৰ লগত (সঙ্গে) কথা পাতিম (বলব), সেইটো ভাবি আজি ইমান (এত) ভাল লাগিছে, তা কল্পনা কৰিব পাৰি না।…"

নীল তার চিঠিতে দিদি বলতে বেলাকেই বুঝিয়েছে। বেলার সঙ্গে আমার চিঠিতে যোগাযোগ অনেক দিনের। বেলা লঙ্কার নেতাজী বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলে শিক্ষকতা করে। তার মা-বাবা ও দাদা নগাঁও থাকেন। কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে তার চিঠি পেয়েছি। বেলা লিখেছে—

'অমরাবতী আসামের এক বাঙালি বোনের পরম শ্রদ্ধা, অসীম শুভেচ্ছা ও ভূমিষ্ঠ প্রণাম গ্রহণ করবেন। রূপসী-বাংলার লেখক হয়ে আপনি আসামকে আখ্যা দিয়েছেন 'অমরাবতী' বলে। আমাদের জন্মভূমি, চির পরিচিত সুন্দরী আসামের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যকে আপনি অবলোকন করেছেন উদারদৃষ্টি দিয়ে। সত্য শিব ও সুন্দরের মিলন-ভূমি আসামের বুকে আত্মগোপন করে থাকা সৌন্দর্য আপনার দরদী লেখনী স্পর্শে অপরূপা হয়ে উঠেছে। মহানদ ব্রহ্মপুত্রের স্বচ্ছ-

সলিল ধারা এই পবিত্র উপত্যকাকে পবিত্রতর করে তুলেছে।' কোমল প্রকৃতি আসামের মানুষকে গড়েছে ভাবুক আর সরল, প্রাণময় আর সঙ্গীতপ্রিয় রূপে। তাই আসামবাসীদের সারল্য আতিথেয়তা আর ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে আপনি সহৃদয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সেজন্য আপনাকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর পাঠক-পাঠিকার জন্য আপনার অসামান্য প্রীতি সত্যই আপনার কাছে আমাদের চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে রাখল।...

সবশেষে আমার অসমীয়া বোন প্রগতি শর্মাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই কারণ সে আপনাকে সর্বপ্রথমে আসামে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।...'

সেবারে কলকাতায় ফিরে যাবার পরে বেলার যে চিঠিখানি পেয়েছিলাম, তা থেকে কয়েকটা লাইন উদ্ধৃত করে, তার পরের কথায় আসছি। বেলা লিখেছিল—

"পবিত্র ভারতভূমিতে যারই জন্ম হয়, সে সৌভাগ্যবান। কেননা এখানে জন্ম হবার ফলে মানুষ বৈদিক সভ্যতার মূল-মন্ত্র শিক্ষা পাবার সুযোগ লাভ করে। এবং সেই শিক্ষা প্রচার করার মাধ্যমে মানুষ জগতের অভাবনীয় উপকার করতে সক্ষম হয়।...

ভারতবর্ষ মহামানবের মিলন-মন্দির। এই পবিত্রতীর্থে জন্মলাভ করে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আজ আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।...

সেদিন আপনার পদধূলি গ্রহণ করে আশীর্বাদ লাভের পরে মনে হয়েছিল, এর চেয়ে বড় গৌরব আমার আর কী হতে পারে? যাঁর লেখনীর মাধ্যমে আমি মানসনেত্রে আমার ধ্যানের গুরু স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-জননীর শাশ্বত রূপ অবলোকন করেছি, তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে গেলেন।... মনে হয়েছিল, যিনি সংসারী হয়েও ত্যাগের গৈরিক উত্তরীয় ধারণ করে ভারতের পথে পথে পদ-

চারণা করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংহতির মূল-সুরটিকে বাজিয়ে চলেছেন, আমি আমার সেই পরম-প্রিয় লেখককে প্রণাম করেছি।

আপনাকে প্রণাম জানিয়ে সেদিন আমি প্রণাম করেছি সেইসব সাহিত্যিকদের, যাঁরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে আপনারই মতো সমাজের হিতসাধন করে চলেছেন, ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কারণ আমি বিশ্বাস করি আপনাদের মহতী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না। আমরা একদিন সত্যই

'জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে,
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।'..."

চিঠির শেষে বেলা আমাকে আবার আসামে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কিন্তু সেকথা এখন থাক, আগে সেবারের আসাম ভ্রমণের কথা শেষ করে নিই।

সেবারে আমি লঙ্কা থেকে হোজাই এলাম। নগাঁও জেলার একটি মহকুমা হোজাই। শহরটি গুয়াহাটী-লামডিং রেলপথের ওপরে অবস্থিত। রাজ্যের সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয় এই উপত্যকায়। তাই হোজাইকে বলা হয় 'Granary of Assam.' অর্থাৎ আসামের শস্যগোলা। অনেকগুলি বড় বড় চালকল রয়েছে এই মহকুমায়। আসামের চাল ব্যবসার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হোজাই।

তবে কেবলি ধান নয়, এই উর্বর অঞ্চলে প্রচুর আখ, সর্ষে, পাট ও তরি-তরকারি উৎপন্ন হয়। কয়েকটি তেলকলও রয়েছে এখানে। রেল অথবা মোটরযোগে উৎপন্ন দ্রব্যাদি রাজ্যের সর্বত্র এবং রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাবার সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

মহকুমাটি কিন্তু মোটেই পুরনো নয়। ১৯৮৩ সালের অগাস্ট মাসে লঙ্কা ও লামডিং অঞ্চল নিয়ে হোজাই একটি পৃথক মহকুমার স্বীকৃতি পেয়েছে। আবার হোজাই শহরও মহকুমার সদর নয়। এখান থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে শঙ্করদেব নগর নামে একটি নতুন শহরের পত্তন করে সেখানেই মহকুমা-সদর স্থাপিত হয়েছে। হোজাই শহর এখনও কেবল কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ব্লকের হেড কোয়ার্টার্স।

একটি থানা, কয়েকটি সিনেমা হল, হাইস্কুল, কলেজ এবং কয়েকটি ইন্সপেকশান বাংলো ও সার্কিট হাউস রয়েছে হোজাই শহরে। রয়েছে বিভিন্ন জাতীয় ব্যাঙ্কের শাখা। কারণ হোজাই বেশ বড় ব্যবসাকেন্দ্র।

কেবল ব্যবসায়ীদের জন্য নয়, পর্যটকদের কিছু আকর্ষণও রয়েছে হোজাইতে। কাছেই আমতল নামে জায়গায় একটি প্রাচীন শিব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। সেখানে কয়েকখানি পাথরের ওপরে কিছু জীবজন্তুর মূর্তি এবং লতাপাতা ও ফুল খোদাই করা রয়েছে। এগুলি পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাছাড়া হোজাই শহরেও প্রাচীন শিব ও বিষ্ণুমন্দিরের অবশেষ আছে।

এখান থেকে জেলাসদর নগাঁও ৬১ কিলোমিটার। ১৯৯১ সালের আদমসুমারির সময়ে হোজাই শহরে ৩১, ৯১৬ জন নর-নারী ও শিশু স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। বলা বাহুল্য বিগত দু-বছরে জনসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালি মুসলমানদের সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য।

হোজাই থেকে মোটরপথে রাজ্যের সর্বত্র যাতায়াত করা যায়। নগাঁও লামডিং ও গুয়াহাটীতে নিয়মিত বাস চলাচল করে এখান থেকে।

খুবই দুঃখের কথা, বিরানব্বুই সালের ডিসেম্বরে সেই অন্ধকার-ময় দিনগুলিতে হোজাই মহকুমার ডবকা অঞ্চল জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অকুস্থলে পরিণত হয়েছিল। একই ভাষাভাষী মানুষ একে অপরের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে পশুর মতো হত্যা করেছে।

খবরের কাগজে এই অমানুষিক বর্বরতার কথা পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ সেবারে লঙ্কা থেকে হোজাই এসে এখানের হিন্দু-মুসলমান, অসমীয়া-বাংলা-হিন্দি ভাষাভাষী মানুষদের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। রাজনীতি মানুষকে কত নিচে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে, হোজাইয়ের দাঙ্গা তার একটি নিকৃষ্টতম উদাহরণ।

কিন্তু রাজনীতির কথা থাক, আমার নিজের কথায় ফিরে আসা যাক। সেবারে হোজাই এসে আমার অসমিয়া ও বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের আন্তরিক অভ্যর্থনায় এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে পরের বছর সাহিত্য সম্মেলনে আবার হোজাই আসার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছি। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য পরের বছর আমাকে আবার আসামে আসতে হয়েছে। এবং তাও একা নয়। হোজাইবাসীদের অনুরোধে বন্ধুবর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে সঙ্গে নিয়ে। হোজাই প্রসঙ্গে সেবারের কথাই বড় বেশি মনে পড়ে যাচ্ছে। সেটি আমার তৃতীয় আসাম ভ্রমণ।

আমি ও সিরাজসাহেব বিমানে কলকাতা থেকে গৌহাটি এলাম। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আসাম রাজ্য সমিতির সাধারণ সম্পাদক শান্তিকুমার আইন সদলবলে বিমানবন্দরে আমাদের স্বাগত জানালো।

বিমানবন্দর থেকে আমরা এলাম মালিগাঁও, রেলওয়ে কলোনিতে। আমার জনৈকা বিদগ্ধ-পাঠিকা ডাঃ (মিসেস) বাণী ভট্টাচার্যের কোয়ার্টার্সে। সেখানেই মধ্যাহ্নভোজন সারতে হল। আমি আবার আসামে আসছি শুনে মিসেস ভট্টাচার্য আগেই নেমন্তন্ন করে রেখেছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্যা এবং নিরামিশাষী হলেও আমাদের আমিষ ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। বলা বাহুল্য শান্তি এবং গাড়ির চালকও বাদ পড়েননি।

মালিগাঁও থেকে শান্তি আমাদের গুয়াহাটী রেলস্টেশনে নিয়ে এলো। ইতিমধ্যে ওদের সাহিত্য সম্মেলনের আরও কয়েকজন সদস্য সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। রিটায়ারিং রুমে বসে বেশ কিছুক্ষণ জমিয়ে আড্ডা দেওয়া গেল। সম্মেলনের প্রাক্তন শাখা-সম্পাদক সোমেশ ভট্টাচার্য তারপরে কবি নবকান্ত বরুয়া ও গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শুকদেব সিন্‌হাকে নিয়ে উপস্থিত হল। খুবই খুশি হলাম। কারণ নবকান্তবাবু কেবল অসমিয়া সাহিত্যের একজন প্রথিতযশা কবি নন, তাঁর মতো ভদ্র বিনয়ী ও বন্ধুবৎসল বিদগ্ধ অধ্যাপক আমি খুব বেশি দেখিনি।

ওরা আমাদের ট্রেনে করে হোজাই নিয়ে এলো। সন্ধে নাগাদ ট্রেন হোজাই পৌঁছল। সম্মেলনের শাখা সভাপতি নিকুঞ্জবিহারী বণিক-সহ বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তা স্টেশনে স্বাগত জানালেন। তারপরে প্রায় শোভাযাত্রা করে আমাদের নিয়ে এলেন নেতাজী স্কুলে। সেখানেই সমিতির অফিস এবং সম্মেলনের সভামণ্ডপ। আসামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সম্মেলনের প্রতিনিধিরাও এখানেই রয়েছেন। নিকুঞ্জবাবু স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এখন স্কুল বন্ধ তাই এখানেই সব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রবীণ শিক্ষক নিকুঞ্জবাবুকে ভারি ভাল লাগে। বার বার নিজেদের অক্ষমতার উল্লেখ করে সবিনয়ে জানালেন—ছোট জায়গা, আমরা গরিব মানুষ, আপনাদের যোগ্য সমাদর করতে পারব না। আমাদের অক্ষমতা ক্ষমা করে নেবেন।

দরিদ্র হলেও তাঁরা যে আমাদের জন্য রাজকীয় আয়োজন করবেন, তা আমার জানা ছিল। কারণ আসামের মানুষদের আতিথেয়তা তুলনাহীন। কিন্তু সেদিন রাতে হোজাই শহরে আমার ও সিরাজ সাহেবের যে অমন একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে, তা তখনও জানা ছিল না।

নেতাজী স্কুল থেকেই রাতের খাওয়া সেরে আমরা চারজন আবার গাড়িতে উঠলাম। কয়েক মিনিট বাদেই আলো-ঝলমল সার্কিট হাউসের সামনে পৌঁছন গেল। কেবল আলো নয়, সেই সঙ্গে বেশ কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিস। একটু বিস্মিত হই।

যে স্বেচ্ছাসেবকটি আমাদের পৌঁছে দিতে এসেছে, সে গাড়ি থেকে নেমে যায়। গেটের পুলিসদের কী যেন একটু বলে। গেট খুলে যায়। ড্রাইভার গাড়ি ভেতরে নিয়ে আসে। আর তখুনি দেখতে পাই, কেবল বাইরে নয়, সার্কিট হাউসের ভেতরেও পুলিস, প্রচুর পুলিস।

স্বেচ্ছাসেবকটি গাড়ির দরজা খুলে বলে—আসুন স্যার।

আমি ও সিরাজসাহেব গাড়ি থেকে নেমে আসি। নবকান্তবাবু

ও ডঃ সিন্‌হা কিন্তু গাড়িতেই বসে থাকেন।

অবাক কণ্ঠে নবকান্তবাবুকে জিজ্ঞেস করি—আপনারা নামবেন না?

—না। নবকান্তবাবু উত্তর দেন—মাত্র দুখানি ডাব্‌ল-বেডরুম নিয়ে সার্কিট হাউস। তার একখানিতে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী-কাল তিনিই সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। দ্বিতীয় ঘরখানিতে আপনাদের দুজনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আপনারা আমাদের সম্মানিত অতিথি।

—তা, আপনারা কোথায় থাকবেন?

—কাছেই, একটা ইন্‌সপেক্‌শান বাংলোয়। স্বেচ্ছাসেবকটি বলে ওঠে।

ড্রাইভার গাড়ির পেছন থেকে আমাদের স্যুটকেস দুটি বের করে দেয়। সার্কিট হাউসের জনৈক কর্মী সে দুটো দু-হাতে নিয়ে বলে—চলুন, স্যার!

নবকান্তবাবু ও ডঃ সিন্‌হা গাড়ির ভেতর থেকে বলে ওঠেন—চলি। কাল দেখা হবে। নমস্কার।

আমরাও হাতজোড় করি। গাড়িটা চলতে শুরু করে।

কী বলব? ওঁরা দুজনেই অতিশয় সম্মানিত, ওঁরাও এখানে বিশিষ্ট অতিথি। তবু ওঁরা থাকবেন সাধারণ বাংলোয় আর আমরা আলো-ঝলমল সার্কিট হাউসে, মুখ্যমন্ত্রীর পাশের ঘরে। এই শ্রদ্ধা, এই ভালোবাসা—আমি কি সত্যই এর যোগ্য?

কিন্তু থাকগে, এসব ভাবনা। তার চাইতে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক ভারতে জনৈক মুখ্যমন্ত্রীর পাশের ঘরে রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতাটুকু সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক।

আসামের তৎকালীন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার পূর্ব পরিচিত। বিগত জোড়হাট অধিবেশনের সময় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। আমি অমরাবতী আসাম বইতে তাঁর কথা লিখেছি। বই প্রকাশিত হবার পরে তাঁকে একখানি বই পাঠিয়েও দিয়েছি।

কিন্তু এসব কথা থাক, তার চাইতে সেই রাত্রিবাসের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

আগেই বলেছি, ছোট সার্কিট হাউস। অসমিয়া গড়নের টিনের বাড়ি। সামনে পথের দুপাশে সবুজ লন ও কিছু ফুলের টব। চারিপাশে লোহার তারের বেড়া। দুখানি বেশ বড় ঘর, কাচের দরজা-জানালা। ঘর-দুখানির চারিদিকে চওড়া বারান্দা। সামনের লনে এবং দু-পাশে ও পেছনে বেড়ার পাশে পাশে ফ্লাড-লাইট। উজ্জ্বল আলোয় সারা বাড়িখানি ঝলমল করছে।

লোকটির পেছনে আমরা সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় উঠে আসি। ডানদিকের ঘরখানি দেখিয়ে সে চাপাস্বরে বলে—চিফ মিনিস্টার রয়েছেন।

তাকিয়ে দেখি ঘরখানির দরজা বন্ধ, সামনে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দুজন বন্দুকধারী।

লোকটি বাঁদিকের ঘরখানির সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা খোলে। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালায়।

কার্পেটে ঢাকা ও আসবাবপত্রে সুসজ্জিত একখানি ডাব্‌ল-বেড রুম। সঙ্গেই স্নানাগার। এক কথায় চমৎকার ব্যবস্থা।

স্যুটকেশ নামিয়ে রেখে লোকটি বিদায় নেয়। যাবার সময় বলে—কিছুক্ষণ আগে জল এনে দিয়েছি। গ্লাস দুটিও ধুয়ে রেখেছি। তবু কোন দরকার হলে বেল বাজাবেন।

লোকটি চলে যায়। আমরা স্যুটকেস খুলে সব গুছিয়ে নিই। জামা-কাপড় পালটে বাথরুম সেরে শুয়ে পড়ি। সারাদিন খুবই ধকল গিয়েছে। ভোর পাঁচটায় বাড়ি থেকে দমদম রওনা হয়েছি! সওয়া সাতটায় বিমান ছেড়েছে। বড়ঝাড় থেকে মালিগাঁও। খেয়ে নিয়েই গুয়াহাটী। তারপরে আবার এতটা পথ রেলে। এখানে এসেও এতক্ষণ সমানে কথা বলতে হয়েছে। কালও এভাবেই ব্যস্ত থাকতে হবে। আজকের রাতটা ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। এমন আরামদায়ক শয্যা। এখুনি ঘুম এসে যাবে।

সে ভাবনা সত্য হয়নি। প্রায় সারারাত আমরা দুজনে দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

প্রথম কারণ আলো। ঘরে কাচের জানলায় পর্দা ছিল না। তাই ঘরের আলো নেভানোর পরেও বাইরের ফ্লাড-লাইটের আলোয় ঘরখানি দিবালোকের মতো আলোকিত। দ্বিতীয় কারণ মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অথচ তখন আসামে সন্ত্রাসবাদীদের তেমন কোন তৎপরতার কথা কানে আসেনি।

আর একথা যে কেবল আসামের পক্ষেই সত্যি ছিল, তাও নয়। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও অনুরূপ ছিল। এবং তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম চারজন মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বিনা নিরাপত্তায় বেঁচে থেকেছেন। তাঁরা সাধারণ গাড়িতে একাকী চলা-ফেরা করতেন। সরকারি আইনানুযায়ী তাঁদের বাড়ির সামনে দু-চারজন পুলিশ মোতায়েন থাকলেও ভেতরে যাবার জন্য দেহ-তল্লাশির ব্যবস্থা ছিল না। কারণ তাঁরা ছিলেন জনপ্রতিনিধি, তাই জনগণকে অবিশ্বাস করতেন না। এবং তাঁরা কোনমতেই কাপুরুষ ছিলেন না।

অনেকে হয়তো বলবেন—তখনকার কথা জানি না কিন্তু এখন সিকিউরিটি ছাড়া কোন ভি. আই. পি.-র পক্ষে চলাফেরা করা সম্ভব নয়। কথাটা মেনে নিতে পারি না। কারণ আমি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তত একজন মন্ত্রীকে জানি, যিনি পুলিশ ছাড়া সাধারণ গাড়িতে সর্বত্র যাতায়াত করেন।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঠেলায় আমি ও সিরাজসাহেব দু-চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। কারণ আমাদের ঘরের বারান্দায় বন্দুকধারী পুলিশ সর্বদা মার্চ করেছেন। তাঁদের বুটের শব্দ নিশুতি রাতে রীতিমত হট্টগোলের মতো অনবরত কানে আঘাত করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর পাশের ঘরে রাত্রিবাসের এই যন্ত্রণার কথা আমি আজও ভুলতে পারি নি।

কী কারণে জানি না, শেষরাতের দিকে বুটের শব্দটা কিছু কমে

এসেছিল, বোধকরি বন্দুকধারীরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর সেই সুযোগে আমিও পড়েছিলাম ঘুমিয়ে।

কিন্তু আসামে এসে যে বেশি বেলা অবধি ঘুমিয়ে থাকার উপায় নেই, পাখির গানে ঘুম ভেঙে যায়। সেদিনও তাই হল। চোখ মেলে দেখি, সোনালী রোদে ভরে গেছে চারিদিক।

আমি উঠে পড়ি। বাথরুম সেরে পোশাক পালটে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে। দরজা ভেজিয়ে সিকিউরিটির বেড়াজাল পার হয়ে রাস্তায় পৌঁছই। নির্জন অচেনা পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে এগিয়ে চলি। বেশ কিছুক্ষণ পদচারণার পরে একটা চায়ের দোকান দেখতে পাই। সেখানে সবে প্রভাতী চায়ের আসর বসেছে। আমিও তাঁদের পাশে বাঁশের মাচায় বসে পড়ি। এবং কিছুক্ষণ বাদে এক গ্লাস চা হাতে পেয়ে যাই।

চা খেয়ে আবার পুরনো পথে ফিরে আসি সার্কিট হাউসে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের দরজা খোলা। তিনি সোফায় বসে আছেন। সামনে সেণ্টার টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম।

মুখ্যমন্ত্রীও দেখতে পেলেন আমাকে। আমি বারান্দায় উঠে আসতেই বলে উঠলেন—সুপ্রভাত! আসুন, ভেতরে আসুন।

ভেতরে এসে সোফায় বসি। মুখ্যমন্ত্রী আবার বলেন—কাল আপনারা আসার আগেই শুয়ে পড়েছিলাম। তা কোন অসুবিধে হয়নি তো? রাতে ঘুম হয়েছে, আশা করি!

মুখ্যমন্ত্রীর পাশের ঘরে রাত্রিবাসের যন্ত্রণার কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো উচিত হবে না। অতএব নীরবে মাথা নাড়ি।

পট থেকে চা ঢেলে বেয়ারা আমার সামনে রাখে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন—চা খান।

চায়ের স্বর্গ আসাম। আসামের মুখ্যমন্ত্রী চা খেতে অনুরোধ করছেন। অতএব মৃদু হেসে কাপটা হাতে তুলে নিই। বলি—আপনার দেখতে পাচ্ছি স্নান হয়ে গেছে, কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি?

—আর বলেন কেন? ইলেক্‌শন মিটিং। সেটা সেরে দশটার

মধ্যে সাহিত্য অধিবেশনে উপস্থিত হতে হবে।

সুতরাং তাঁর সময় নষ্ট করি না। চা শেষ হতেই উঠে দাঁড়াই। নমস্কার করে বলি—আসি তাহলে। আবার দেখা হবে।

—নিশ্চয়ই।

এবারে সাহিত্য অধিবেশনের কথায় আসা যাক। সকাল সওয়া দশটায় মুখ্যমন্ত্রী অধিবেশন উদ্বোধন করলেন। তারপরে তিনি তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে বললেন, সাহিত্যই কেবল বিভিন্ন ব্যক্তি সমাজ ও রাজ্যের মাঝে মিলনের সেতুবন্ধন করতে পারে। তিনি আশা প্রকাশ করলেন যে এই সাহিত্য সম্মেলন আসামের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মাঝে বিশেষ করে বাংলা ও অসমিয়াদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে এক মহতী ভূমিকা পালন করবে। এখানে বাংলা ও অসমিয়া সাহিত্যের সঙ্গে হিন্দি সাহিত্যালোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তিনি খুবই সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীপুষ্পেন্দ্রনাথ বরা তাঁর মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করলেন। তাঁর সেই জ্ঞানগর্ভ ও সুমধুর 'আদৰণি' ভাষণটির একখানি কপি আজও আমি সযত্নে সংরক্ষণ করে চলেছি। তার অংশ বিশেষ আমি আমার পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিচ্ছি—

'...হোজাই অসমৰ (আসামের) এখন (একটি) ঐতিহ্যপূর্ণ চহৰ (শহর) যত (যেখানে) এসময়ত (একসময়ে) বিভিন্ন জাতি উপজাতিয়ে বসবাস কৰি বুৰঞ্জীৰ (ইতিহাসের) একো-একোটা যুগৰ সূচনা কৰিছিল। মহাভাৰতীয় যুগৰ পৰাই (থেকেই) স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে মহীয়ান হোৱা (হওয়া) এই অঞ্চলটো বড়ো কছাৰী সকলৰ দ্বাৰা যে অধ্যুষিত আছিল তাৰ প্রকৃষ্ট প্রমাণ ওলাই (উদ্ধৃত / প্রকাশিত হয়ে) আছে ইয়াৰ (এর) নামটোত (নামে)। প্রাচীন ঐতিহ্য আৰু অর্বাচীন সভ্যতার যোগসূত্রত জিলিকি (উজ্জ্বল হয়ে) উঠা হোজাইৰ নতুন ৰূপত মুগ্ধ হৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা (থেকে) নানা লোক আহি (এসে) এই ঠাইত (এখানে) বসবাস

কৰিছে। অসমৰ শস্যৰ ভঁৰাল (ভাণ্ডার) বুলি (বলে) খ্যাতি লাভ কৰা এই ভূমিখণ্ড বিশাল ভাৰতবৰ্ষৰে এই (একটি) ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ বুলি কলেও (বললেও) বঢ়াই (বড়াই) কোৱা (করা / বলা) নহয় (হয়না)। এনে (এমনি) এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাইত (জায়গায়) আপোনাসবক (আপনাদের সবাইকে) আদৰিবলৈ (সম্বর্ধনা) পোৱাতো (জানাতে পারা) পৰম গৌৰবৰ কথা।

এটা (একটি) সুসভ্য জাতিৰ পৰিচয় সেই জাতিটোৰ ভাষা আৰু তার সাহিত্য। এটা জাতিৰ জীবন সৌষ্ঠৱপূৰ্ণ হয়, সেই জাতিৰ সাহিত্যৰ যোগেদি (মধ্য দিয়ে)। ভাৰতৰ প্ৰাদেশিক ভাষা সমূহৰ ভিতৰত বঙলা ভাষাই যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ কৰি আছিছে (এসেছে / রেখেছে) সেই কথা দোহাৰিবৰ (দ্বিতীয়বার বলার) কোনো প্ৰয়োজন নাই।

বঙলা ভাষা আৰু অসমীয়া ভাষা যে একেটি মূলৰ পৰাই (থেকে) ওলাইছে (প্রকাশিত / সৃষ্ট হয়েছে) সেই কথা ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত-সকলে ঠাৱৰ (সিদ্ধান্ত) কৰিছে। মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ শেষস্তৰ মাগধী অপভ্ৰংশৰ পৰা যথাক্ৰমে চাৰিটা ভাষাৰ জন্ম হয়— ৰাঢ়, বাৰেন্দ্ৰ, কামৰূপ আৰু বঙ্গ। ইয়াৰে (এর মধ্যে) বাৰেন্দ্ৰৰ পৰা বঙলা ভাষা আৰু কামৰূপৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি হৈছে। সেইফালৰ (সেইদিক) পৰা চাবলৈ গলে (দেখতে গেলে) বঙলা ভাষা আৰু অসমীয়া ভাষা একেগৰাকী মাতৃৰে (একই মায়ের) ছুটি সন্তান। বেলেগ (ভিন্ন) বেলেগ পৰিবেশ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ মাজত (মাঝে) বসবাস কৰিলে যেনেকৈ (যেমন) একে মাতৃৰে ছুটি সন্তানৰ স্বভাব চৰিত্ৰ ধৰণ কৰণৰ আমূল পৰিবৰ্তন হয়, ঠিক তেনেকৈয়ে (তেমনি) সুকীয়া (স্বকীয়) পৰিবেশ আৰু পাৰি-পাৰ্শ্বিক তাত অসমীয়া ভাষা আৰু বঙলা এই ছুই ভাষাই নিজ নিজ ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছে।···

এই একে কাৰণতেই বঙ্গ সাহিত্যৰ গ্ৰন্থৰাজিও অসমীয়া পাঠকে হৃদয়ঙ্গম কৰিব পাৰে।

সাহিত্যিক সকল সমাজৰ একো একোজন খনিকৰ (শিল্পী)। এখন সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ মহান দায়িত্বও সাহিত্যিক সকলৰ ওপৰতেই নির্ভর কৰিছে। সামাজিক পটভূমিত জীৱনৰ ছবি ফুটাই, জীৱনৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰি মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ ঘটাব পাৰে কেৱল সাহিত্যক সকলেহে। প্রাদেশিক সংকীর্ণতা আৰু সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতাৰ আউল (গ্রন্থি) ভাঙি ঐক্য সংহতিৰ সুদৃঢ় সেতু বন্ধাৰ দায়িত্বও সাহিত্যিক সকলৰেই। সমাজত অঙ্কুৰিত হোৱা বিভেদৰ বিহগছ (বিষবৃক্ষের) জুপি (ঝোপ) নির্মূল কৰিব পাৰে একমাত্র সাহিত্যিক সকলেহে।

বঙ্গভাষা, বঙলা সাহিত্য আজি অতি চহকী (সমৃদ্ধশালী)। যি (যে) ভাষা এজন (একজন) বিশ্বকবিৰ জন্ম দিছে, সি (সে ভাষা) কেতিয়াও (কখনও) নিঃকিন (দরিদ্র) হব (হতে। নোৱাৰে (পারে না)। ৰবীন্দ্রনাথ আজি সমগ্র বিশ্বৰে গৌৰৱ। আমি আশা ৰাখিছো ভাৰতীয় সাহিত্যই যেন দ্বিতীয়জন ৰবীন্দ্রনাথ জন্ম দিব (দিতে) পাৰে।...'

শ্রীবরার পরে মাস্টারমশাই মানে নিকুঞ্জবাবুও তাঁর মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করলেন। তাঁর সুলিখিত ভাষণটির মূল বক্তব্য হল—

'সাহিত্য সুন্দরের থালায় আনন্দের সন্দেশ পরিবেশন করে। সাহিত্যের পরশে সংসারের সকল তুচ্ছতা ও সংকীর্ণতা, শ্রান্তি ও ক্লান্তি স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মহামিলনের ধ্বনিতে, সত্য ও সুন্দরের উপলব্ধিতে মানবতার জয়যাত্রা শুরু হয়ে যায় এই ধূলি-ধূসরিত জগতে।...

দুঃখ-যন্ত্রণা ও হতাশা থেকে সাহিত্য মানবতাকে মুক্তির স্নিগ্ধ আলোয় অভিষিক্ত করে, বিচ্ছিন্ন জীবনকে ঐক্যবদ্ধ করে।...

সাহিত্যিকের সচেতন মন জগৎকে গড়ে তোলে নিত্য-নব রূপে, মিলন-মাধুর্যে পরিপূর্ণ করে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন।...

সুতরাং এই সাহিত্য-সম্মেলন সর্বপ্রকার প্রাদেশিকতা ও

সম্প্রদায়িকতা দূর করে সবাইকে মিলনমন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলবে।...'

বলা বাহুল্য আমাকে এবং সিরাজ সাহেবকেও একবার করে মাইকের সামনে দাঁড়াতে হল। দাঁড়াতে হল নবকান্তবাবু এবং ডঃ সিন্‌হা-সহ আরও বেশ কয়েকজন নিমন্ত্রিতকে। কিন্তু সেসব কথা থাক, তার চেয়ে প্রকাশ্য অধিবেশনের কথায় আসি।

প্রকাশ্য অধিবেশন বসল বিকেলে নেতাজী স্কুলের খেলার মাঠে। এমন একটা ছোট জায়গায় সাহিত্যের আকর্ষণে এত মানুষ! দেখে আমাদের দু-চোখ জুড়িয়ে গেল।

প্রকাশ্য অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা-দেবী বরকটকী। অধিবেশনের সভাপতিত্ব করলেন সিরাজসাহেব আর আমাকে করা হল প্রধান অতিথি।

রেণুকাদেবী তাঁর ওজস্বিনী ও মনোজ্ঞ ভাষণে ভারতের প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করলেন। বললেন, সাহিত্যিকদের আরও বেশি কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি আমার নাম উল্লেখ করলেন। কারণ তাঁর মতে অসমিয়াদেরও নাকি আসামের কথা জানতে হলে 'অমরাবতী আসাম' পড়তে হবে।

শ্রোতারা সোচ্চার স্বরে তাঁর মন্তব্য অনুমোদন করলেন কিন্তু আমাকে বহুক্ষণ নতমস্তকে মঞ্চে বসে থাকতে হল। কারণ এমন লজ্জা আমি জীবনে খুব কমই পেয়েছি।

রেণুকাদেবীর পরে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন রাজ্য সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ ভূমিধর বর্মণ। তিনি বললেন, অসমিয়া বই বাংলায় এবং বাংলা বই অসমিয়াতে অনুবাদ করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ সাহিত্যের এই আদান-প্রদানের মাধ্যমে দুই ভাষাভাষী মানুষ আরও কাছাকাছি আসবেন।

সিরাজসাহেব বললেন, জনজীবনের সঙ্গে সুনিবিড়ভাবে পরিচিত

হওয়া সাহিত্যিকদের কর্তব্য। কারণ তা নাহলে তাঁরা জীবনের বাস্তব চিত্র আঁকতে পারবেন না। অথবা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে পারবেন না।

আমি বললাম, সাহিত্য ভাষার মুখাপেক্ষী নয়, যে কোন ভাষাতেই শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে মানুষের কথা বলতে পারলে, তা সাহিত্যের মাধ্যমে সকল ভাষাভাষী মানুষের কাছেই সমান আদরণীয় হয়ে ওঠে। সাহিত্যে কোন জাতীয় ধর্মীয় বা ভাষাগত বিরোধের স্থান নেই। এবং সাহিত্য আন্তর্জাতিক মিলনের প্রধান ধারক ও বাহক।

আমরা হোজাই থেকে গৌহাটি ফিরে এলাম। না, ফেরার সময় আর ট্রেনে নয়, গাড়িতে। এবং তা সদ্যপরিচিত জনৈক সাহিত্য-সুরসিক ব্যবসায়ী যুবকের অনুরোধে। ভদ্রলোকের নাম কে. পি. দাশগুপ্ত ওরফে শঙ্করবাবু।

সম্মেলনের পরদিন নিকুঞ্জবাবু ও তাঁর সতীর্থরা সার্কিট হাউসে এসে আমাদের দুজনকে রেলে গৌহাটি পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন, এইসময় শঙ্করবাবু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এবং সবিনয়ে বললেন—আমার গাড়িতে আমি একা গৌহাটি ফিরছি। অসুবিধে না হলে আপনারা আমার সঙ্গে চলুন না, আমি উলুবাড়ির কাছেই থাকি, আপনাদের হিমাংশুবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দেব।

আমার বাল্যবন্ধু সৌরাংশু ঘোষের দাদা হিমাংশুদা ও তাঁর মেয়ে অধ্যাপিকা সুনন্দাকে কথা দিয়েছিলাম, সেবারে গৌহাটি ফিরে তাদের বাড়িতে উঠব এবং সুনন্দা আমাদের সঙ্গে শিলং ও চেরাপুঞ্জি যাবে। আগের দিন কথায় কথায় কথাটা বলেছিলাম শঙ্করবাবুকে। যুবক শঙ্করবাবু তখুনি গৌহাটির একজন সফলকাম ব্যবসায়ী। এখন তিনি কলকাতায় ল্যান্সডাউন নার্সিং হোমের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার এবং আমার একজন অকৃত্রিম সুহৃদ।

শঙ্করবাবু সযত্নে আমাদের হোজাই থেকে গৌহাটি নিয়ে এলেন।

সুনন্দা দিন দুয়েক ধরে সিরাজসাহেবকে গৌহাটি দেখালো। তার পরে আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু ও তখন শিলঙের রেজিস্ট্রারার অব কম্প্যানিজ স্বপন মণ্ডলের পাঠানো গাড়িতে করে আমরা শিলং গেলাম।

লাবানে স্বপনের বাসাতেই বসতি গড়া গেল। খবর পেয়ে শিলংবাসী প্রবীণবন্ধু ও সুলেখক মহেশ দেব ছুটে এলেন। এলো আরও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব। তাদের সঙ্গে সিরাজসাহেব ও সুনন্দা দিন তিনেক ধরে শিলং দেখল। তারপরে মহেশদাকে নিয়ে আমরা গেলাম চেরাপুঞ্জি। পূজনীয় স্বামী গোকুলানন্দজী মহারাজ তখন চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ। কিন্তু মিশন এবং সেই শিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসীর কিছু কথা আমি বলেছি আমার 'মায়াময় মেঘালয়' বইতে। সুতরাং চেরাপুঞ্জি ও গোকুলানন্দজীর কথা আর নয়। যাঁর কথা বলা হয়নি, তাঁকে একটি প্রণাম জানিয়েই সেবারের মেঘালয় ভ্রমণের যতি টানছি।

তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম প্রেসিডেন্ট (শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য) শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ।

প্রভু মহারাজ নামে তিনি বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। সেবারে চেরাপুঞ্জি গিয়ে তাঁকে দর্শন করবার সুদুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম।

শিলঙে বসেই শুনেছিলাম তাঁর আগমনের কথা। খাসি ও গারো ভক্তদের দীক্ষাদানের জন্য এবারে তিনি নিজেই চেরাপুঞ্জি এসেছেন। অতএব খুবই ব্যস্ত থাকবেন। ভেবেছিলাম হয়তো দর্শনই পাওয়া যাবে না। কিন্তু গোকুলানন্দজীর কাছে আমাদের কথা শুনে সেই প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাদের দর্শন দান করতে সম্মত হলেন। মধ্যাহ্নভোজনের পরে আধঘণ্টা বিশ্রামের সময়টুকু আমাদের জন্য বরাদ্দ করে দিলেন। করুণাময় প্রভু মহারাজের কৃপালাভ করে কৃতার্থ হলাম।

সিরাজসাহেবকে চেরাপুঞ্জি দেখাবার পরে মিশনে এসে মধ্যাহ্ন

ভোজ সেরে নেওয়া গেল। তারপরে যথাসময়ে গোকুলানন্দজী মহারাজ আমাদের সবাইকে সেই সেবাব্রতী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর ঘরে নিয়ে এলেন। স্বামীজি শুয়ে ছিলেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই উঠে বসলেন। তাঁকে দর্শন করলাম। প্রণাম করলাম। তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। অনেক কথা। তাঁর আশীর্বাদে আমার জীবন ধন্য হল।

দিন দুয়েক বাদে সুনন্দা সিরাজসাহেবকে নিয়ে গৌহাটি নেমে এলো। সিরাজসাহেব কলকাতায় চলে গেলেন।

আমি গৌহাটি এলাম দিন পাঁচেক পরে। ভেবেছিলাম পরদিন দুপুরের ফ্লাইট ধরে ঘরে ফিরব। কারণ জানতাম না যে আমার জন্য আসামের মানুষের ভালোবাসার ভাণ্ডার তখনও নিঃশেষিত হয়ে যায়নি।

গৌহাটি ফিরে দেখি প্রমথ আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে। কোকরা-ঝাড়ের তরুণ অ্যাডভোকেট প্রমথ ভাওয়াল। যারা আমাকে প্রথম-বার আসামে নিয়ে এসেছিল, উমা ও প্রমথ তাদের অন্যতম। গত-বছর উমার দাবি মেনে নিয়ে লামডিং গিয়েছি, কিন্তু আমার যাওয়া হয়নি কোকরাঝাড়। অতএব প্রমথ দাবি করে—এবারে একটি দিনের জন্য আপনাকে কোকরাঝাড় যেতেই হবে। আর আপনি আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করবেন না জেনেই, আমি সবাইকে বলে দিয়েছি যে আপনি যেতে রাজি হয়েছেন।

প্রমথ আমার অনুজপ্রতিম। কিন্তু সে উকিল। সুতরাং কথা শেষ করেই আমার হাতে সুবোধবাবুর একখানি চিঠি ধরিয়ে দেয়।

সুবোধবাবু মানে অধ্যাপক সুবোধ বাগচি। কোকরাঝাড় কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান। সুবোধবাবু লিখেছেন—

'...আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান প্রমথচন্দ্র ভাওয়ালের কাছে শুনলাম আপনি কলকাতা রওনা হবার আগে একদিনের জন্য কোকরাঝাড়ে আসতে সম্মত হয়েছেন। আমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ দেখানর জন্য আমি কোকরাঝাড়ের সমস্ত মানুষের হয়ে আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

এখানে একটি সম্বর্ধনা সভায় আপনাকে কষ্ট করে স্বল্প সময়ের জন্য উপস্থিত থাকতে হবে; স্থানীয় সাহিত্য রসিকদের মনের দিকে তাকিয়ে আপনি এতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবেন না বলে আমাদের বিশ্বাস আছে। এখানকার অসমীয়া ভাষাভাষীদের মধ্যে আপনার অনুরাগী পাঠক নিতান্ত কম নেই, তাঁরাও আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারলে খুবই খুশি হবেন। আমরা আড়ম্বরপূর্ণ বড় কোন সভার আয়োজন করব না: ছোট অনুষ্ঠানে পরস্পর আলাপ-পরিচয় এবং বিশেষ করে আপনার কাছ থেকে দু-চারটি অভিজ্ঞতার কথা শোনা।...'

অতএব আমাকে যেতে হল কোকরাঝাড়। তখন কিন্তু কোকরাঝাড় আজকের মতো অশান্ত ও অস্থির রাজনৈতিক তৎপরতার অকুস্থল নয়, নিতান্তই একটি শান্ত-সুন্দর ছবির মতো মনোরম মফস্বল শহর।

শুনেছিলাম সুদূর অতীতে কোকরাঝাড় ছিল একটি বনাবৃত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সেই বনের অনেকটা জুড়ে ছিল খুঙক্রা (Khungkra) নামে একজাতীয় বন্যগাছ। সেই গাছের নামেই ছিল গ্রামের নাম। সেই খুঙক্রা নামটাই কালক্রমে কোকরাঝাড় নামে রূপান্তরিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে কিছু বাঙালি এসে এখানে আদিবাসীদের সঙ্গে বসবাস শুরু করলেন।

দেশ বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দু শরণার্থী পৈতৃক ভিটেমাটি পরিত্যাগ করে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। কোকরাঝাড়ের উদার আদিবাসীরা সানন্দে তাঁদের স্বাগত জানালেন। বন কেটে বসত বাড়ে। জনপদের জনসংখ্যাও বেড়ে চলে। ১৯৫৬ সালে এখানে একটি ছোট টাউন কমিটি গঠিত হয়।

এগারো বছর বাদে, ১৯৬৭ সালে আসাম সরকার চারিপাশের বড়ো অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে এই অঞ্চলকে গোয়ালপাড়া জেলার একটি পৃথক মহকুমায় রূপান্তরিত করলেন। মহকুমার সদর দপ্তর

প্রতিষ্ঠিত হয় কোকরাঝাড় শহরে। আরও ছ' বছর বাদে ১৯৭৩ সালে টাউন কমিটিকে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে উন্নীত করা হয়। ১৯৮৩ সালে সেই মহকুমাকে জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কোকরাঝাড় এখন একটি জেলা-সদর।

৮৯° ৪৬´ ও ৯১° পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২৬° ৫১´ ও ২৬° ১৬´ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত এই শহর। শহরের উত্তরে তিতাগুড়ি দক্ষিণে জয়পুর, পুবে আদাবাড়ি গ্রাম আর পশ্চিমে গৌরাঙ্গ নদী। শহরের বর্তমান আয়তন ৮.২৪ বর্গকিলোমিটার। ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী কোকরাঝাড় শহরের স্থায়ী জনসংখ্যা ২৮,২৪০ জন। অধিবাসীদের অধিকাংশই বড়ো এবং বাঙালি। বাকিরা কোচ-রাজবংশী, সাঁওতাল, অসমিয়া ও হিন্দি ভাষাভাষী।

পুরনো ন্যারোগেজ ও নতুন ব্রডগেজ রেললাইন এই শহরের মধ্যাঞ্চল দিয়ে প্রসারিত। একত্রিশ ও একত্রিশ-সি নম্বর জাতীয় সড়ক যথাক্রমে এই শহরের ২৪ কিলোমিটার পুব ও ২০ কিলোমিটার উত্তর দিয়ে চলে গিয়েছে। নতুন দুটি পথ তৈরি করে সড়ক দুটির সঙ্গে কোকরাঝাড়ের যোগসাধন করা হয়েছে।

এখন কোকরাঝাড় কেবল সমৃদ্ধ জনপদ নয়, সেইসঙ্গে একটি বেশ বড় ব্যবসাকেন্দ্র। কাঠই প্রধান ব্যবসা। জেলাসদরে উন্নীত হবার পরে কোকরাঝাড়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের নানা অফিস স্থাপিত হয়েছে। ফুড কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার বেশ বড় খাদ্যভাণ্ডার রয়েছে কোকরাঝাড়ে। ফলে রুজি-রোজগারের আশায় চারিদিক থেকে সর্বহারার দল ভিড় করছেন এই শহরে।

কোকরাঝাড়ে এখন একটি দু-শ' শয্যার হাসপাতাল হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোকরাঝাড় বেশ উন্নত। রয়েছে, একটি করে বি. টি., কমার্স ও আইন কলেজ আর দুটি সাধারণ কলেজ, একটি বেসিক ট্রেনিং সেণ্টার ও একটি আই. টি. আই। আছে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, দুটি হায়ার সেকেণ্ডারি ও ছ'টি মাধ্যমিক স্কুল এবং অনেকগুলি প্রাইমারি স্কুল।

কোকরাঝাড়ে এখন একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও একটি লো পাওয়ার টি. ভি. রিলে স্টেশন হয়েছে। আছে গুটি পাঁচেক ব্যাঙ্ক। আর এই ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বড়ো অটোনোমাস কাউন্সিল-এর সদর দপ্তর।

তবে কোনো পরিকল্পনা ছাড়া গড়ে ওঠা পুরনো ছোট শহরের সব সমস্যাই রয়েছে, যেমন অপ্রশস্ত পথ ও জল নিষ্কাশনের সমস্যা আর খোলা মাঠ ও পানীয় জলের অভাব। তবে কয়েকদিন আগে দিলীপ-বাবুর অফিসে দেখা হয়েছিল বর্তমান কোকরাঝাড় জেলার ডেপুটি কমিশনার শ্রী ডি. ঝিংগ্রান-এর সঙ্গে। তিনি জানালেন, কোকরাঝাড়ে পানীয় জল সরবরাহের বৃহত্তর ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে।

শিক্ষার মতো সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রেও কোকরাঝাড় বেশ এগিয়ে। নাচ-গান অভিনয় ও কলাবিদ্যা এবং সাহিত্যচর্চায় কোকরাঝাড় বেশ সুনাম অর্জন করেছে। এ বছর এখানেই বসেছিল আসাম রাজ্যিক বাংলাসাহিত্য সম্মেলন।

আগেই বলেছি, তখন অর্থাৎ সেই পনেরো বছর আগে কোকরা-ঝাড় ছিল শান্তসুন্দর ছবির মতো মনোরম একটি ছোট শহর।

আন্তরিক আতিথেয়তা ও অসীম ভালোবাসার মাঝে সেই শহরে আমার সেদিনটি স্বপ্নের মতো কেটে গিয়েছে, সন্ধ্যায় আয়োজিত হয়েছে সভা।

সভাপতিত্ব করলেন অধ্যক্ষ রমণীকান্ত শর্মা। সভার শুরুতেই সুবোধবাবু আমার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। তারপরে কোকরাঝাড় সাহিত্য সভার পক্ষ থেকে শ্রীবনমালী দাস আমাকে অভিনন্দিত করে বললেন—

'আজি কোকৰাঝাড় সাহিত্য সভাই আপোনাৰ দৰে (মতো) এগৰাকী (একজন) নিপুণ কথা-শিল্পী, বাংলা ভাষাৰ সুপ্রতিষ্ঠিত আৰু প্রখ্যাত ভ্রমণ সাহিত্যিকৰ শুভ-আগমনক স্বাগতম জনাবলৈ (জানাতে) পাই (পেরে) নিজকে ধন্য মানিছে আৰু ভগ্নী-ভাষী হিচাপে (হিসেবে) গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে। আপুনি ভ্রমণ-

সাহিত্যেৰে সমুদ্ৰ মন্থন কৰি আমাৰ (আমাদের) হাতত অমৃত-কুম্ভ তুলি দিছে।

আপুনি চৰকাৰী (সরকারি) দায়িত্বত থাকিও ভাৰাৰ দুৰ্গম নদ-নদী পৰ্বত-অৰণ্য অতিক্ৰম কৰি যি (যে) দুৰ্জয় সাহস, অক্লান্ত শ্ৰম আৰু কৰ্মপ্ৰেৰণাৰ পৰিচয় দিছে, সি (তা) মানব জীৱনৰ কাৰণে চিৰদিন সত্য-অন্বেষণৰ কাহিনী হৈ (হয়ে) থাকিব।

আপুনি অসম মাতৃক (মাকে) অমৰাৱতীত (অমরাবতীতে) পৰিণত কৰিলে, সোমনাথক বিশ্ব ইতিহাসৰ আদৰ্শ আৰু মহত্তম আধ্যায়ত (অধ্যায়ে) ৰূপান্তৰিত কৰিলে, বৃন্দাবনক (কে) বংশীধ্বনিৰে (তে) পুলকিত কৰালে। দেশবাসীয়ে আপোনার সাহিত্যৰ মাজে (মধ্য) দিয়েই ভাৰত-তীৰ্থৰ পুণ্য সলিলত অবগাহন কৰি পৱিত্ৰ হব।

আপোনাৰ সৰলতা আৰু আন্তৰিকতাৰ পৰিচয় আসামবাসীয়ে কেতিয়াবাই (অনেকদিন আগেই) পাই থৈছে (পেয়েছেন)। সাহিত্যকৰ নিজা (নিজের) কোনো দেশ নাই, জাতি নাই। সেই কথা যোৱা বেলি (গতবছর) আপুনি প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে (প্রথমবার) অসমলৈ (আসামে) আহি (এসে) প্ৰমাণ কৰিলে। অসমৰ সহৃদয় পাঠকে আপোনাৰ লিখনি অসমীয়ালৈ (অসমীয়াতে) ভাঙি (অনুবাদ করে) গুণ-মুগ্ধজনৰ কাম কৰিছে।

আমাৰ আন্তৰিক প্ৰীতিসম্ভাষণ আৰু শুভেচ্ছা গ্ৰহণ কৰিব।'

অবশেষে অভিনন্দনপত্রখানি পাঠ করে শোনানো হল সবাইকে। এবং আমাকেও নীরবে সেটি শুনতে হল। কাজটা কোনমতেই সহজ নয়। কিন্তু ভালোবাসার এই বোঝা বহন না করে উপায় কী?

আর তাই আত্মপ্রচারের অপরাধ হবে জেনেও আমি সেখানি আমার পাঠক-পাঠিকার হাতে তুলে দিচ্ছি। কারণ এটি প্রকাশ না করলে আমার প্রতি আসামের মানুষের ভালোবাসার কথা সবখানি বলা হবে না। ওঁরা লিখেছেন—

'সঞ্জীবচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ—সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা সম্ভারে

পরিপুষ্ট বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে তুমি নূতন মাত্রা সংযোজন করেছ ; তোমাকে নমস্কার। গঙ্গোত্রীর পবিত্র তীর্থবারিতে পুণ্যস্নান করিয়ে আমাদের দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিত্তে তুমি প্রশান্তির স্বর্গ রচনা করেছ। জাহ্নবী যমুনার বিগলিত করুণায় অভিষিক্ত অগণিত ভারতবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দনবাণীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় প্রান্তবাসী আমরাও তোমাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই।

শুষ্ক শ্রদ্ধার কৃত্রিম উপচারে মহত্ত্বের উচ্চশাখায় তোমাকে আমরা নির্বাসিত করতে চাই না। দূরের বন্ধু, তুমি আমাদের কাছে এসেছ। আমাদের দরিদ্র কুটিরের ক্ষুদ্র আঙিনা আজ তোমার প্রতিস্নিগ্ধ প্রসন্ন চরণপাতে ধন্য। নগ-নদ শোভিত উপলবন্ধুর আরণ্যক আসামে তুমি অমরাবতীর সন্ধান পেয়েছ। তাই তো তুমি আজ আমাদের একান্ত কাছের মানুষ। তোমার লেখনীর গতিমন্ত্রে ধ্বনিত মহানদ ব্রহ্মপুত্রের অশ্রুত কলতান—যা এত কাছে থেকেও শ্রবণ-বিমুখ আমরা এতদিন শুনতে পাইনি। দিগন্ত-বিসর্পিত সবুজের সমারোহ এবং উর্ধ্বাকাশের নীলিমার পটে পার্বত্য আসামের প্রকৃতি-মানুষের যুগলবন্দীর ঐকতান। তুমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছ তাহারি গান। সেই রুদ্র-মধুর সঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ, আবিষ্ট। সে আবিষ্টতা প্রকাশের ভাষা আমাদের জানা নেই, আমাদের মুগ্ধমনের তারে শুধু অনুরণিত দূরাগত এক অস্পষ্ট অনুভূতির গুঞ্জন—ভালবাসি, ভালবাসি, এই সুরে কাছে-দূরে জলে-স্থলে বাজে বাঁশি।'

॥ দুই ॥

পনেরো বছরের কথা পঁচিশ মিনিটে বলতে চাইলে, তা না হয় কাহিনী, না হয় ইতিহাস। আমি জানি আমার এ স্মৃতিচারণ কিছুই হল না। অথবা বলা যেতে পারে পাগলের প্রলাপের মতো হল।

তা হোক্ গে। সংসারে সবাই তো আমরা কিছু না কিছুর জন্য পাগল। কেউ অর্থ-পাগল, কেউ খ্যাতি-পাগল, কেউবা আদর্শ-পাগল। আমি না হয় ভালোবাসার পাগল হলাম।

না, না। তাই বা হতে পারলাম কোথায়? তাই পাগলের প্রলাপ বকলেই কেঁদুলির মেলায় শোনা সেই বাউল গানখানি মনে পড়ে যায়—

'তেমন একজন পাগল পেলাম না,
আছে নকল পাগল সকল দেশে
আসল পাগল পেলাম না,
তাই তো পাগল হলাম না।
তেমন একজন পাগল পেলাম না....'

আমিও ভালোবাসার আসল পাগল হতে পারিনি। পারলে বার বার আসামে এসে আবার ঘরে ফিরে যাই কেন? ভালোবাসায় পাগল করা এই মানুষগুলোর মাঝেই তো বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি!

অতএব অতীতের প্রলাপ নয়, এবারে বর্তমানে ফিরে আসা যাক।

আমি গতবছরও আসামে এসেছিলাম....

কিন্তু সেও তো অতীতের কথা। সুতরাং সেকথাও থাক্। এবারের কথায় চলে আসা যাক। এই চোদ্দ শ' সালের কথায়।

বাড়ি থেকে রওনা হয়েছি গতকাল দুপুর এগারোটায়। বেলা একটা পাঁচ মিনিটের এয়ার বাস আই. সি. দু' শ' উনত্রিশের টিকেট

ছিল আমাদের। এবারে আমার সঙ্গী ভাগনে অশোক আর ভাগনী সুমিতা ওরফে বুলা। আমাদের ও. কে. টিকেট। অতএব বিমান-বন্দরে আগে পৌঁছবার তেমন একটা তাড়া ছিল না। তবু বর্ষাকাল। কলকাতার পথ। তাই প্রায় ঘণ্টাখানেক আগেই 'চেক-ইন্' কাউণ্টারে পৌঁছেছিলাম। তবুও সবিস্ময়ে শুনতে হল—

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—ছোটো সে তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।…'

কাউণ্টারে কর্মরতা সুবেশা সুশ্রী ও সপ্রতিভ তরুণীটি অবশ্য 'সোনার ধান' ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন—আজ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত 'গৌহাটি বন্‌ধ' বলে আমরা ভেবেছিলাম অনেকেই যাত্রা বিরতি ঘটাবেন। তাই এয়ার বাস ৩০০ না দিয়ে একখানি বোয়িং ৭৩৭ দেওয়া হয়েছে। সেখানি এইমাত্র ভরে গেল। আপনাদের কাল সকালে সাতটার শিলচর ফ্লাইটে গৌহাটি পাঠিয়ে দেব। আপনারা কালই অফিস করতে পারবেন।

ব্যাপারটা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। গৌহাটি বন্‌ধ একটা ছুতো মাত্র। আসল কথা ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌স-এর অবস্থা রাজ্য পরিবহন দপ্তরগুলোর চাইতে বিশেষ ভাল কিছু নয়। কারণ দশখানি A 300, পঁচিশখানি A 320 এবং আঠারোখানি B 737 অর্থাৎ মোট তেপ্পান্নখানি বিমান দিয়ে দৈনিক তাঁদের ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ও ভারতের বাইরে সাতাষট্টিটি গন্তব্যস্থলে দু'-শ' ফ্লাইট চালাতে হয়। তার ওপরে গত ছ' মাসে আশি কোটি টাকার মতো লোকসান হয়েছে। অতএব গৌহাটি বন্‌ধের ছুতোয় বড় বিমানের বদলে ছোট বিমান বরাদ্দ করেছেন।

আমরা অফিস করতে গৌহাটি যাচ্ছি না। এবং আজ না পৌঁছলে কোনই ক্ষতি হবে না। তবু বুলা বেঁকে বসল। বলল—এখানে এসে ড্রাইভার ছেড়ে দিলাম। কাজের মেয়েকে ছুটি দিয়েছি। ফ্ল্যাট তালাবন্ধ করে এসেছি। এখন আমি আবার বাড়ি ফিরে বত্রিশ ঝামেলা করতে পারব না। তোমরা হোটেলের ব্যবস্থা ক'রো।

খুবই স্বাভাবিক। ওর স্বামী উৎপল এখন নাইজেরিয়ায়, আর ছেলে অনিন্দ্য ওরফে টুকাই আমেরিকায় পড়াশুনা করছে। বাড়িতে সে একা মানুষ।

কথাটাকে অশোক অবজ্ঞা করতে পারে না। সে ইঞ্জিনিয়ার। এয়ার ফোর্সে উইং কম্যাণ্ডার ছিল। কয়েক বছর আগে ভল্যাণ্টারি রিটায়ারমেণ্ট নিয়েছে। এখন ব্যবসা করে। বিমানবন্দরে ওর প্রচুর জানা-শোনা।

আমাদের বসিয়ে রেখে সে বেশ কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করল। এবং শেষ পর্যন্ত এয়ারপোর্ট হোটেলে আমাদের রাত্রিবাস মঞ্জুর হল। আর আমাদের সুবাদে জায়গা-না-পাওয়া আরও জনাদশেক যাত্রী এই বিশেষ সুবিধে পেয়ে গেলেন। গৌহাটির মতো ছোট ফ্লাইটে জায়গা না দিতে পারার জন্য এয়ারপোর্ট হোটেলে আতিথ্যদানের নজির খুব বেশি নেই ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌স-এর ইতিহাসে। আমরা সেই বিরল ইতিহাসের অধিকারী হয়ে রইলাম।

দেশে-বিদেশে বেশ কয়েকবার ফাইভ-স্টার হোটেলে রাত্রিবাসের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু সেসব স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে গতকালের অভিজ্ঞতার একেবারেই মিল নেই। হোটেলে পৌঁছবার পরেই ওঁরা আমাদের জানিয়ে দিলেন, ঘর এবং ডিনার 'ফ্রি' কিন্তু আর কিছু পেতে হলে নগদ পয়সায় কিনে নিতে হবে।

তখন আমাদের আকণ্ঠ চায়ের তৃষ্ণা। সুতরাং চায়ের অর্ডার দিতে হল। তিন কাপ চায়ের দাম একান্ন টাকা এবং নিজেদের সম্মান বাঁচাতে ওয়েটারকে সম্মান-দক্ষিণা পাঁচ টাকা। শত হলেও পাঁচতারা হোটেল।

পাঁচতারা হোটেলের আরও কিছু মহিমা কিছুক্ষণ বাদে বুঝতে পারলাম। আমরা যে ফ্লাইট মিস্ করেছি এবং আগামীকাল সকালের ফ্লাইটে আসছি এ খবরটা গৌহাটিতে জানানো দরকার। নইলে ওরা চিন্তা করবে। অতএব গৌহাটিতে একটা ফোন করা প্রয়োজন। কিন্তু ফোন করতে গিয়ে লাক্সারি ট্যাক্স ও অন্যান্য চার্জের

কথা শুনে চক্ষু স্থির। সুতরাং সন্ধে সাতটার পরে অশোককে ছুটতে হল আবার সেই বিমানবন্দরে। টিকেট থাকায় প্রবেশ দর্শনী দিতে হল না। এবং সর্বসাধারণের মাশুলেই সে আমাদের গৌহাটি অভিযানের কাহিনী গৌহাটিতে পৌঁছে দিয়ে হোটেলে ফিরে এলো।

হোটেলের যে ঘরগুলোতে আমাদের মতো বিনে পয়সার বোর্ডারদের থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো কোনমতেই পাঁচতারা হোটেলে মানানসই নয়। তবু সে সম্পর্কে আমি কোন অভিযোগ করব না। কেবল রাতের ডিনার নামক বস্তুটি সম্পর্কে নীরব থাকতে পারছি না।

যে ডাইনিং হলে আমাদের ডিনারের ব্যবস্থা করা হল, সেখানে শুধুই আমরা, অর্থাৎ বিনে পয়সার বোর্ডাররা। ঠাণ্ডা ভাত, গরম বিরিয়ানি ও শক্ত চাপাতি। আমি বাড়ির বাইরে মাছ-মাংস খাই না। অশোক মাংস খায় না এবং বুলাও ভালোবাসে না। সুতরাং আমরা বিরিয়ানি নিইনি। যাঁরা নিলেন, তাঁরা অনেক খোঁজা-খুঁজির পরে এক-আধ টুকরো মাংসের হদিস পেলেন। আমাদের ভাত 'ডাল ও তরকারির ওপরেই নির্ভর করতে হল। ডাল জলবৎ তরলং। আর তরকারি? মটরপনিরে মটরের দানা যদিও বা গুটিকয়েক মিলল, পনিরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল পনিরের মাপে চৌকো আলুর টুকরো। আরও একটা কোর্স ছিল পাঁচতারা হোটেলের ডিনারে, আলু-ঢেঁড়শের তরকারি। কিন্তু তাতে পেয়াজ রসুনের এতই আধিক্য যে মুখে দেওয়া সম্ভব হল না।

তাহলেও পাঁচতারা হোটেলে রাত্রিবাসের বিরল সৌভাগ্য দান করার জন্য ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌স-কে ধন্যবাদ জানাবো বৈকি। ধন্যবাদ জানাবো আরও দুটি কারণে। কাল বিমানবন্দর থেকে এয়ারপোর্ট হোটেল এবং আজ হোটেল থেকে বিমানবন্দরে যাওয়া-আসার জন্য গাড়িও তাঁরাই দিয়েছেন।

আরও আনন্দের কথা আজ সকালে আমরা বিমানে জায়গা

পেয়েছি, ব্রেকফাস্ট পেয়েছি এবং নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গৌহাটির বরঝাড় বিমানবন্দরে অবতরণ করেছি।

আজ পনেরো বছর পরেও গৌহাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রথম যার কথা মনে পড়েছে, সে আমার অসমীয়া বোন প্রগতি। তারপরে আমি যতবার এখানে এসেছি প্রতিবারই এমনি তার কথা মনে পড়েছে। অথচ বিধাতার বিস্ময়কর আচরণে আজ কোথায় সে, আর কোথায় আমি!

—একি থামলেন কেন? তাড়াতাড়ি চলুন। অশোক তাগিদ দেয়। ওরা এগিয়ে গিয়েছে। আমি ওদের অনুসরণ করি।

আমার বড় ভাগনী গীতা বা খুকুর ছেলে অরূপ ওরফে ববি এখানে চাকরি করে। গতবারও গৌহাটিতে এসে আমি ওর বাড়িতেই উঠেছিলাম। তখন ওরা জু-নারেঙ্গী রোডে নারিকেল বস্তিতে অর্থাৎ শহরের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে থাকত। এখন থাকে আমবাড়িতে, ল্যাম্ব. রোডে অর্থাৎ উত্তর-মধ্যাঞ্চলে, দীঘলপুকুরির কাছে।

দীঘলপুকুরি মানে দীর্ঘ পুকুর বা সুদীর্ঘ দীঘি। এটি গৌহাটির শোভা। চারদিকেই গাছে ছাওয়া সুপ্রশস্ত পথ। উত্তরে পথের পাশে হাইকোর্ট আর দক্ষিণে স্টেট মিউজিয়াম এবং রবীন্দ্র ভবন। আর পুবপারে শহীদ কনকলতা ছাত্রীনিবাস ও নলিনীবালাদেবী ছাত্রীনিবাস। প্রথমটি কটন কলেজের এবং দ্বিতীয়টি সন্দিকৈ গার্লস কলেজের ছাত্রীদের জন্য। কটন কলেজের ঐ হস্টেলেই প্রগতির সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল আমার।....

কিন্তু না। আর প্রগতির কথা নয়। ওর কথা মনে পড়লেই যে মনটা বড় ভারী হয়ে ওঠে। আর সেই ভারে মনের সব আনন্দ চাপা পড়ে যায়। তাই ওর কথা আর নয়। তার চেয়ে এবারের আসাম ভ্রমণের কথায় ফিরে আসা যাক।

ববি নারিকেল বস্তি থেকে ল্যাম্ব. রোডে বাড়ি পালটেছে। অর্থাৎ বেশ কয়েক কিলোমিটার কাছে এগিয়ে এসেছে। তবু দু'শ টাকার কমে ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। যতদূর মনে পড়ছে নারিকেল বস্তির

জন্যও এই একই ভাড়া দিয়েছি। ওদের বক্তব্য তেলের দাম বেড়েছে। কথাটা মিথ্যে নয়।

বিমানবন্দর থেকে সেই সাঁইত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক। সংক্ষেপে এন. এইচ. থার্টিসেভেন। এ পথটা সরাইঘাট পুলের কাছে এন. এইচ. থার্টিওয়ান এবং আসাম ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে মিলিত হবে। তারপরে গৌহাটি শহরের দক্ষিণসীমা ছুঁয়ে শিলং চলে যাবে। এখন বিমানবন্দর থেকে শিলং যেতে হলে আর গৌহাটি শহরে প্রবেশ করার দরকার হয় না। ফলে বেশ খানিকটা সময় বেঁচে যায়।

পথের দু-পাশে অলকাপুরী আসামের সেই সবুজ হাতছানি। কোথাও দিগন্ত বিস্তৃত সজল সবুজ খেত। কোথাও নারকেল-সুপারি গাছ দিয়ে ছাওয়া আর দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছবির মতো ছোট-ছোট বাড়ি—টিন আর কাঠের বাড়ি, আসাম টাইপ বাংলো। আবার কোথাও বা উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ। পথের পাশে বনভূমি। যেমন সুন্দর, তেমনি শান্ত। ছেড়ে যেতে মন চায় না। কিন্তু ভাড়ার গাড়ি সেকথা শোনে না। সে এগিয়ে চলে।

পলাশবাড়ি, ঝালুকবাড়ি, মালিগাঁও। না মালিগাঁও এখনও আসে নি ঝালুকবাড়ি দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। এখানেই গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়। পথ থেকে অনতিদূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন আর হস্টেল। এরই কোন হস্টেলে প্রগতি দু-বছর বাস করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সে এম. এস-সি. পাশ করেছিল। আর বোধ করি এখানে বাস করার সময়েই সে তার 'বয়ফ্রেণ্ড'-কে জীবনসাথী নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তই…

কিন্তু একি! আমি আবার প্রগতির কথা ভাবছি কেন? তার চেয়ে পথের কথা ভাবা যাক্।

আমরা ঝালুকবাড়ি ছাড়িয়ে সরাইঘাট পুলের পাদদেশে পৌঁছলাম। ব্রহ্মপুত্রের ওপরে সরাইঘাট পুল—রেল ও মোটর চলাচলের পুল। এখনও উত্তর-আসাম থেকে দক্ষিণ আসামে আসার সবচেয়ে জনপ্রিয়

পুল। আরেকটি পুল রয়েছে তেজপুরের কাছে। এবং একটি পুল তৈরি হচ্ছে গোয়ালপাড়ার অদূরে।

একত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক এখানে নেমে এসে এন. এইচ. থার্টিসেভেন এবং আসাম ট্রাঙ্ক্ রোড সংক্ষেপে এ. টি. রোডের সঙ্গে মিলিত হল। থার্টিওয়ান থার্টিসেভেনের সঙ্গে মিশে গিয়ে দক্ষিণে প্রসারিত হল। আমরা থার্টিসেভেনের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এ. টি. রোডের শরণ নিলাম। এগিয়ে চললাম আরও পুবে।

এখন আমাদের বাঁয়ে পাণ্ডু, ডাইনে মালিগাঁও। সরাইঘাট পুল তৈরি হবার আগে রেলযাত্রীদের ওপারে নেমে স্টিমারে করে পাণ্ডু এসে আবার রেল ধরতে হত।

আমাদের ডাইনে মালিগাঁও। রেলের শহর। এন. এফ. রেলওয়ের হেড কোয়ার্টার্স। সেবারে আমি ও সিরাজসাহেব বিমানবন্দর থেকে গৌহাটি যাবার পথে রেল হাসপাতালের ডাক্তার মিসেস বাণী ভট্টাচার্যের কোয়ার্টার্সে লাঞ্চ করেছিলাম। ডাক্তার ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আজও অক্ষুণ্ণ। গতবছরও তিনি আমাকে মালিগাঁও নিয়ে এসেছেন। এবারেও আসতে হবে এখানে।

মালিগাঁও ছাড়িয়েই বাঁদিকে কামাখ্যা পাহাড়। আমরা প্রণাম করি। গৌহাটি এলে মা-কামাখ্যাকে দর্শন করতেই হয়। তাঁর করুণা ছাড়া আসাম ভ্রমণ নিরাপদ ও আনন্দময় হয় না।

কামাখ্যা পাহাড় ছাড়িয়েই শহর শুরু হয়ে গেল—গৌহাটি শহর। অসমীয়ারা বলেন গুৱাহাটী। আজকাল এই নামেই সে বেশি পরিচিত।

পথের ডানদিকে রেল লাইন, তারপরে বাড়ি-ঘর। আর বাঁদিকেও বাড়ি-ঘর। আর তারপরে ব্রহ্মপুত্র। এবারে তার সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা। তবে অনেকক্ষণ ধরেই আমি তার পাশে পাশে পথ চলছি। দূরে বলে দেখতে পাই নি এতক্ষণ, এবারে দেখি। প্রথম দর্শনেই প্রাণ আমার জুড়িয়ে আসে। সে যে আসামের প্রাণ-ধারা।

আর কেবল আসামেরই বা বলি কেন? সেইসঙ্গে বাংলার বললেও তো ভুল বলা হয় না। সে বাংলা এখন হতে পারে বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলা তো বটেই। যে বাংলায় আমি প্রথম চোখ মেলেছি, এই ব্রহ্মপুত্র সেই বাংলার গোয়ালন্দে গিয়ে মিলিত হয়েছে পদ্মার সঙ্গে। মিলিতধারা চাঁদপুরে গিয়ে নাম নিয়েছে মেঘনা। গোয়ালন্দ থেকে মেঘনাসঙ্গম ভোলা পর্যন্ত বিভিন্ন বালুকাবেলায় আমার কত শত শৈশবস্মৃতি। তাই ভারতীয় উপমহাদেশের দীর্ঘতম নদী ব্রহ্মপুত্র কেবল আসামের প্রাণধারা নয়, আসাম আর বাংলার মিলন-ধারাও বটে।

ভরালু নদীর পুল পেরিয়ে আমরা এ. টি. রোডের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মহাত্মা গান্ধী রেডে ধরে এগিয়ে চললাম। পথটি উত্তরমুখী হয়ে আবার পুবে বাঁক নিল। তারপরে ব্রহ্মপুত্রের সমান্তরাল হয়ে চলল এগিয়ে। এবারে ব্রহ্মপুত্র আরও কাছে এসেছে, খুব কাছে। তারই তীরে তীরে পথ চলেছি। বর্ষার প্লাবনে বিক্ষুব্ধ ব্রহ্মপুত্র, বিশাল ও বিমল ব্রহ্মপুত্র, অলকাপুরী আসামের স্বর্গধারা মহানদ ব্রহ্মপুত্র।

একবছর বাদে আবার ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে দেখা হল আমার। ভারি ভালো লাগছে, আমি তার তীরে তীরে পথ চলেছি। এও যে গঙ্গার মতো, কেবল নদী নয়, সেইসঙ্গে জীবন। জাতির জীবন, দেশের ইতিহাস।

ফ্যান্সি বাজার পার হয়ে এলাম। একটু বাদে পথের পাশে জনার্দন দেবালয় ও শুক্রেশ্বর মন্দির। এই মন্দিরের পেছনেই ব্রহ্মপুত্র। ঘাটে দাঁড়িয়ে তাকে ভারি সুন্দর দেখায়, একেবারে কাশীর গঙ্গার মতো।

কিন্তু গঙ্গা কিম্বা ব্রহ্মপুত্র নয়, আমার আবার মনে পড়ে যাচ্ছে প্রগতির কথা। একদিন বিকেলে সে আমাকে নিয়ে এসেছিল এই মন্দিরে। ঘাটে বসে আমরা সেদিন ব্রহ্মপুত্রকে দেখতে দেখতে তারই কথা আলোচনা করেছিলাম। প্রায় পনেরো বছর আগের

কথা। তবু মনে হচ্ছে যেন এই তো সেদিন। কিন্তু এর মধ্যে যে ব্রহ্মপুত্র বেয়ে বহুজল পদ্মায় পড়েছে।

অতএব সেদিনের কথা থাক, পথের দিকে তাকানো যাক। ডানদিকে পানবাজারের পথটা চলে গেল। আমরা এগিয়ে চললাম। ডেপুটি কমিশনারের অফিস ও সার্কিট হাউসকে বাঁদিকে রেখে ডানদিকের পথটি ধরলাম। একটু বাদে পৌঁছলাম দীঘলপুকুরির উত্তর পারে। হাইকোর্ট ছাড়িয়ে এসে আবার ডাইনে বাঁক নিলাম। অর্থাৎ দীঘলপুকুরির পুবপারে পৌঁছলাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। আমার বাঁদিকে শহীদ কনকলতা ছাত্রীনিবাস। এবারে আর সেদিনের কথা না ভেবে পরিত্রাণ পাই না। আমার পাশে বসে থাকা অশোক ও বুলার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে আমি সেদিনের কথা ভেবে চলি—

সেদিনই আমি জোড়হাট থেকে ডিব্রুগড় হয়ে এখানে এসেছি। জোড়হাটে প্রগতির সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। কারণ সে তখন কটন কলেজে পড়ে, এই হস্টেলে থাকে।

সেদিন ঐ দরজা পার হয়ে ভেতরে গিয়ে ওকে খবর পাঠিয়েছিলাম। তারপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, আচ্ছা, আমাকে দেখলে প্রগতি কী করবে? ছোট মেয়ে বই পড়ে চিঠি লিখে ফেলেছে। ভাবতেই পারেনি, সত্যি সত্যি সেই লেখক একদিন ওর সামনে এসে হাজির হবে। আজ হয়তো বেচারী লজ্জায় আমার সামনে আসতেই চাইবে না।

কিন্তু আমার সে অনুমান মিথ্যে হয়। হঠাৎ দেখি একটি মেয়ে ছুটে আসছে। একেবারে আমার সামনে এসে থামে। তারপরে সহসা নত হয়ে প্রণাম করে আমাকে। উঠে দাঁড়িয়েই বলে ওঠে, শঙ্কুদা!

আমি বলি, প্রগতি!

সে আমার একখানি হাত হাতে তুলে নেয়।

আমি জিজ্ঞেস করি, তুমি আমাকে চিনলে কেমন করে?

বাবা চিঠি লিখেছেন। তাছাড়া, আমি আমার দাদাকে চিনতে পারব না।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি ওর দিকে। উচ্চতা ও গড়ন সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মতো। গায়ের রং কালো না হলেও খুব ফর্সা নয়। পরনে শাড়ি। কথাও বলছে পরিষ্কার বাংলায়।

কে বলবে প্রগতি বাঙালী নয়, কে বলবে সে আমার সহোদরা নয়।

সে আমাকে নিয়ে আসে ভিজিটার্স রুমে, পথের ধারে এই টিনের ঘরখানিতে। আমাকে ভেতরে বসিয়ে বলে, আপনি একটু বসুন। আমি শাড়িটা পালটে আসছি।

কোথাও বেরুবে নাকি ?

বারে ! আপনি আসামে এসেছেন আর আপনাকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরুবো না ! বাবার চিঠি পাবার পরেই তো ঠিক করে রেখেছি, আপনাকে প্রথম···নিয়ে যাবো শুক্রেশ্বর জনার্দনের মন্দিরে, ব্রহ্মপুত্রের তীরে।·······

—বাঁদিকের ডঃ সূর্যকুমার ভূঁইয়া রোড ধরুন।

অশোক ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয়। প্রগতির ভাবনা হারিয়ে যায়। আমি বাস্তবে ফিরে আসি। আমরা ইতিমধ্যে শহীদ কনকলতা ছাত্রীনিবাস ছাড়িয়ে দীঘলপুকুরির পুবপার ধরে বেশ খানিকটা দক্ষিণে এগিয়ে এসেছি। এবারে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে ডঃ সূর্যকুমার ভূঞা রোড ধরতে হল। আর সেই সঙ্গে অতীত মিলিয়ে গেল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাবলাম ভালই হল। আর এই তো জীবনের নিয়ম। অতীত যতই আপন হোক, তাকে আঁকড়ে থেকে বর্তমানকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাতে কেবল কষ্ট বেড়ে যায়। সব বুঝেও মাঝে মাঝেই অবুঝ হয়ে উঠি। ভুলে যেতে চাইলেও, অতীতকে ভুলতে পারি না। আর তাই পনেরো বছর বাদেও শহীদ কনকলতা ছাত্রীনিবাসের সামনে এসে চমকে উঠতে হয়।

—ডানদিকের গেটের সামনে থামান।

অশোকের নির্দেশমত ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দেয়। তাকিয়ে দেখি বেশ বড় একখানি দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে ছোট এক-ফালি সবুজ 'লন' আর মরসুমী ফুলের বাগান। লোহার গেট থেকে বাঁধানো পথ প্রসারিত হয়েছে গাড়িবারান্দা ছাড়িয়ে গ্যারেজ পর্যন্ত। তারও পাশে পাশে সারি সারি ফুলগাছ ও লতাপাতার টব। বাড়ির গা ঘেঁষে দুটি চমৎকার দেবদারু গাছ।

বাড়িটা কেবল বড় নয়, দেখতেও সুন্দর। মাঝখানে গোল গম্বুজ সহ একফালি খোলা বারান্দা। তারই একদিক থেকে দোতলার সিঁড়ি। দোতলায়ও একই রকম বারান্দা।

ড্রাইভার হর্ন দিতেই খুকু আর অপর্ণা দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে আসে। আমাদের দেখতে পেয়েই অপর্ণা ছুটে নেমে আসে নিচে। গেট খুলে দেয়, গাড়ি বারান্দায় এসে গাড়ি থামে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে আসি। ইতিমধ্যে খুকুও নেমে এসেছে নিচে।

বিমানসেবিকার দেওয়া লজেন্স দুটি না খেয়ে রেখে দিয়েছি। সে দুটি ওদের দুজনকে দিই। ওরা খুশি হয়ে মুখে পোরে। তারপরে সহসা খুকু বলে—তাহলে শেষ পর্যন্ত আবার আসামে এলে?

—না এসে উপায় কী? এখন যে আমার ভাগনি আসামে থাকে।

—ভাগনি নয়, বলো নাতি। কাল অফিস থেকে ফিরে এসে তোমাদের না দেখতে পেয়ে সে কি দুশ্চিন্তা! তারপরে অশোকের ফোন পাবার পরে নিশ্চিন্ত। আজ লাঞ্চ নিয়ে যায়নি। বলেছে, বাড়িতে খেতে আসবে। খাবার জন্য নয়, তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে। খুকু একটু হাসে।

—তাহলে, ওকে একটা ফোন করে পৌঁছবার খবরটা দিয়ে দিই। আমি বলি।

—তার দরকার নেই। সে নিজেই ফোন করল বলে।

তাই করল অরূপ। এবং সে দুপুরে খেতে এলো। ছেলেটা লেখাপড়ায় ভালো, বেশ ভালো চাকরি করে, ভদ্র ও বিনয়ী স্বাস্থ্যবান

যুবক। কিন্তু তারপরেও আরেকটা পরিচয় আছে ওর, মনটা ভারি নরম আর মানুষ বড় ভালোবাসে। তাই খাবার টেবিলে বসেই কথাটা বলে ফেলল আমাকে—এবারে তুমি কিন্তু কাকুর সঙ্গে পালাতে পারছ না। তুমি আর মাসি দুজনেই আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরছ। ভয় নেই কলকাতার পুজো দেখতে পারবে।

—পুজো! আমি সবিস্ময়ে বলে উঠেছি।

অরূপ মাথা নেড়ে বলেছে—হ্যাঁ, পুজো, মানে দুর্গাপুজো। আমি তো মাকে নিয়ে দুর্গাপুজোর সময় কলকাতায় যাচ্ছি। তোমরাও আমার সঙ্গে যাবে।

—সে কি! পুজোর যে এখনও অনেক দেরি!

আমার পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় দৌহিত্র মাথা নেড়ে বলেছে—খুব দেরি কোথায়, মাত্র তো আড়াই মাস। দেখতে দেখতে এসে যাবে।

আমি কোন প্রতিবাদ করতে পারার আগেই খুকু ছেলের হয়ে ওকালতি করে—তুমি তো হাতের বই শেষ করে এসেছো। এখন তোমার অফুরন্ত অবসর। তাছাড়া তুমি গতবারই বলেছিলে, আসামের ওপরে আরেকখানি বই লিখবে। তার জন্য তোমার এখন বেশ কিছুদিন আসামে থাকা দরকার। সবচেয়ে বড় কথা, আসামের মানুষ ভালোবাসেন তোমাকে। তাঁদের মধ্যে থাকতে তোমার ভালই লাগবে।

কথাটা কোনমতেই মিথ্যে নয়। অতএব চুপ করে রয়েছি।

আর সেই সুযোগে অরূপ খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। বলে—থ্যাঙ্ক্‌ ইউ দাদু!

—ফর?

—অ্যাক্সেপ্টিং মাই রিকোয়েস্ট অব্‌ রিটার্নিং ক্যালকাটা উইথ মি।

আমি হেসে উঠেছি। অশোক বুলা আর খুকুও আমার সেই অসহায় হাসির সঙ্গে গলা মিলিয়েছে।

॥ তিন ॥

আবার আসামে এসে প্রথম রাতটি আনন্দে অতিবাহিত করা গেল। এবারের আসাম ভ্রমণে আজ আমার প্রথম প্রভাত। ববি অফিসে চলে যাবার পরে আমি ও অশোক প্রাতরাশ সেরে নিলাম। তারপরে বেরিয়ে পড়লাম পথে।

আগেই বলেছি পথটির নাম ল্যাম্ব্ রোড। ইংরেজি Lamb শব্দের অর্থ মেষশাবক। কিন্তু গতকাল এ বাড়িতে পৌঁছবার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোন ভেড়ার বাচ্চা চোখে পড়েনি। বোধকরি বৃটিশ জমানায় Lamb পদবিযুক্ত কোন ডাকসাইটে ইংরেজ এখানে বসবাস করতেন। নামটি আজও তাঁর জয়গান গেয়ে চলেছে।

পথটি চওড়ায় মন্দ নয়, তবে লম্বায় খাটো। দু-পাশে সব মিলিয়ে তিরিশ-চল্লিশখানি বাড়ি হবে। পথটির উত্তরে মহাত্মা গান্ধী রোড আর দক্ষিণে গোপীনাথ বরদলৈ রোড। আমরা হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণেই চলেছি। কারণ এদিকটাই সদর। প্রাগজ্যোতিষ এম্পোরিয়াম, কামরূপ ডেয়ারি, রবীন্দ্রভবন, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি, স্টেট মিউজিয়াম-সহ বহু দোকান-পাট ও অফিস।

প্রাগজ্যোতিষ এবং কামরূপ দুটিই আসামের প্রাচীন নাম। রামায়ণ মহাভারত এবং কয়েকখানি প্রধান পুরাণে বলা হয়েছে প্রাগজ্যোতিষ কিম্বা প্রাগজ্যোতিষপুর। মহাভারতে বলা হয়েছে প্রাগজ্যোতিষ রাজা ভগদত্তের রাজ্য। রাজা ভগদত্ত কোথাও ম্লেচ্ছরাজ আবার কোথাও বা যবনরাজ।

কালিকাপুরাণে আমরা প্রথম কামরূপ নামটি পাই। বলা হয়েছে মিথিলার রাজা নরক কামাখ্যা অধিকার করার পরে প্রাগ-জ্যোতিষের নতুন নাম রাখেন কামরূপ। কামরূপ নামটির প্রাচীনতম নিদর্শন এলাহাবাদে প্রাপ্ত মহারাজা সমুদ্রগুপ্তের (৩৩৫-৩৮০ খ্রীঃ)

শিলালিপি। অবশ্য সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে (৩৮০-৪১৪ খ্রিঃ) তাঁর সভাকবি মহাকবি কালিদাস 'রঘুবংশম' কাব্যে প্রাগজ্যোতিষ ও কামরূপ দুটি নামেরই উল্লেখ করেছেন। বলেছেন মহারাজা রঘু দিগ্বিজয়ের সময়ে প্রথমে প্রাগজ্যোতিষ জয় করেন। তারপর তিনি লোহিত্য নদ অতিক্রম করে কামরূপ অধিকার করেন। অর্থাৎ মহাকবি কালিদাসের কালেও দুটি নামই প্রচলিত ছিল। এবং তখন ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরের নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষ আর দক্ষিণ দিককে বলা হত কামরূপ।

তারপরে বোধকরি যুগে যুগে কামাখ্যার খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কামরূপ নামটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে এবং আস্তে আস্তে প্রাগজ্যোতিষ নামটি হারিয়ে যেতে শুরু করে। এখনও এ জেলার নাম কামরূপ।

দ্বাদশ শতকের জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্র এবং ত্রয়োদশ শতকের হিন্দু টীকাকার যশোধর কিন্তু এ অঞ্চলকে কেবলি কামরূপ বলে উল্লেখ করেছেন।

ষোড়শ শতকে রচিত যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে করতোয়া নদীর পূর্বপ্রান্তিক দেশ কামরূপ। এটি একটি ত্রিভুজাকৃতি ভূখণ্ড যার দৈর্ঘ্য একশ' যোজন এবং প্রস্থ তিরিশ যোজন। আবার বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে কামাখ্যাক্ষেত্রের চারিপাশে বিস্তৃত কামরূপ দেশটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে একশ' যোজন।

ইতিমধ্যে অবশ্য 'অসম' নামটি প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। পশ্চিম-য়ুনান (Yunnan) প্রদেশের অধিবাসী তাই (Tai) অথবা শান (Shan) উপজাতীয় অহোমগণ ১২২৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পূর্ব-দক্ষিণের পাটকৈ পর্বতমালা অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উপনীত হন। আপন শক্তি ও বুদ্ধিবলে তাঁরা কিছুকালের মধ্যে স্থানীয় আদি-অধিবাসীদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে কামরূপের রাজা হয়ে বসলেন। কামরূপের ইতিহাসে অহোম যুগের সূচনা হল।

একদল ঐতিহাসিক বলেন, অহোমরাই তাঁদের রাজ্যের নাম

রাখেন 'অসম' তাঁরা নাকি তাঁদের অধিকৃত প্রদেশের অসমান ভূপ্রকৃতি দেখে এই অসম নামটি রেখেছিলেন। আবার অনেকে বলেন, অহোম ভাষায় 'অচম' বা অসম শব্দের অর্থ অপরাজেয়। বিজয়ী অহোমরা তাঁদের রাজ্যকে 'অচম' মনে করতেন এবং কার্যক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কারণ ইংরেজ আমলের আগে অসম কখনও পরপদানত হয়নি।

আবার অনেকে মনে করেন অসম নামটি এসেছে আসামের অন্যতম প্রধান আদিবাসী বড়োদের ভাষা থেকে। বড়ো ভাষায় 'হা-চম' শব্দের অর্থ সমতল অঞ্চল। তাই তাঁরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে বলতেন 'হা-চম'। হা-চম নামটি পরবর্তীকালে অসম নামে রূপান্তরিত হয়েছে। আর ইংরেজরা অসম-কে আসাম-এ রূপান্তরিত করেছেন। এবং আমরা এই অলকাপুরীকে আজও সেই নামেই অবহিত করে থাকি।

'অলকাপুরী'! হ্যাঁ, 'অমরাবতী-আসাম' আমার কাছে 'অলকা-পুরী-আসাম'ও বটে। ধনদেবতা যক্ষরাজ কুবের-এর আলয় হল অলকাপুরী। প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালিনী আসামও ভারতমাতার এক অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। ধান, পাট, চা, কাঠ, তেল, কয়লা, কী নেই আসামে! তার ওপরে রয়েছে খনিজ ও জলসম্পদ। প্রকৃতির এই পরমানন্দ নিকেতন সত্যই কুবের-এর আলয়, সে অলকাপুরী—আসাম।

—এখন তো স্টেশনে যাচ্ছি! আসুন একটা সাইকেল রিকশা নেওয়া যাক।

অশোকের কথায় আমার ভাবনা যায় হারিয়ে। তাকিয়ে দেখি আমরা ল্যাম্ব রোড এবং জি. এন. বরদলৈ রোডের মোড়ে পৌঁছে গিয়েছি। তখন আমি সদর বলতে এই জায়গাটাকেই বোঝাতে চেয়েছিলাম। এখানেই প্রাগজ্যোতিষ এম্পোরিয়াম। কামরূপ ডেয়ারিটা অবশ্য একটু দূরে।

এ জায়গাটা খুবই জমজমাট। মোড়ের মাথায় সাইকেল রিকশা ও অটো রিকশার স্ট্যাণ্ড। তাদের দিকে তাকিয়েই অশোক কথাটা বলেছে।

কলকাতার মতো গৌহাটিতেও অটো-রিকশা মিটারে চলে না। উঠলেই দশ টাকা দিতে হয় আর দূরত্ব বেশি হলে দর-দাম করে একটা রফা করে নিতে হয়। তবে এখানে পাঁচজনের শাট্‌ল সার্ভিস নেই এবং তিনজনের বেশি যাত্রী নিলে পুলিশ পাকড়াও করেন।

অশোক ঠিকই বলেছে। আমরা স্টেশনে যাবো। দূরত্ব সামান্য কিন্তু অটো নিলে দশ টাকাই দিতে হবে আর রিকশায় দু-টাকা। অতএব আমরা সামনের রিকশায় উঠে বসি। জি. এন. বরদলৈ রোড ধরে রিকশা পশ্চিমে এগিয়ে চলে।

জি. এন. বরদলৈ রোড বেশ ব্যস্ত সরণি। বাস মিনিবাস গাড়ি ট্রাক অটো এবং রিকশা ইত্যাদি অনবরত যাতায়াত করছে। আমাদের ডানদিকে ছোট-বড় দোকানের সারি আর বাঁদিকে হস্তশিল্পাধি-কারিকের কেন্দ্রীয় দপ্তর, সুবিশাল এলাকা নিয়ে। তারপরে রবীন্দ্র-ভবন···।

আবার সেই হারিয়ে যাওয়া অতীত এসে সামনে দাঁড়ায়। সেই প্রথমবার আসামে এসে আমি আর দক্ষিণাদা যখন জোড়হাট থেকে ডিব্রুগড় হয়ে গৌহাটি এলাম, যেদিন শহীদ কনকলতা ছাত্রীনিবাসে প্রগতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল, তার পরদিন সোমেশ ও শাস্তিরা এই নাট্যনিকেতনে আমাকে ও দক্ষিণাদাকে এক সরল ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধিত করেছিল। বলা বাহুল্য সেদিন সন্ধ্যায় সবার সঙ্গে প্রগতিও উপস্থিত হয়েছিল এই রবীন্দ্রভবনে। আজ দক্ষিণাদা নেই আর প্রগতি···।

থাকগে, তার কথাও আর নয়। তার চেয়ে গৌহাটির এই ব্যস্ত রাজপথের দু-দিকটা আরেকবার দেখে নেওয়া যাক। রবীন্দ্রভবনের পরে পাশাপাশি স্টেট মিউজিয়াম এবং ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি আর রাস্তার অপর পারে দীঘলপুখুরি, সেই সুবিশাল সরোবর। সরোবরের এদিকটায় পার্ক ও সুইমিং পুল। বাকি তিনদিকেও গাছে ঘেরা রমণীয় পরিবেশ।

দীঘলপুখুরি ও ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি ছাড়িয়ে আরেকটু এগিয়ে পথের বাঁদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তারপরেই চারটি পথের সঙ্গম। আমরা বাঁদিকের পথ ধরে অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে দিয়ে দক্ষিণে এগিয়ে চলি। পথের বাঁদিকে আসাম ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের অফিস। তারপরে স্টেশন চত্বর। পথটা এখানে এসে শেষ হয়ে গিয়েছে।

রিক্সা থেকে নেমে পড়ি। স্টেশনটিকে ভাল করে দেখে নিই। আজ যে বহু বছর বাদে আমি আবার এখানে এলাম।

কারণ ইদানীং আমার বিমানযোগেই গৌহাটি আসা-যাওয়া হচ্ছে। রেল স্টেশনে আসার দরকার পড়ছে না। আজ তাই অনেকদিন পরে স্টেশনে এসে বেশ ভাল লাগছে। দেখে আনন্দ হচ্ছে গৌহাটি স্টেশন এখন আগের চেয়ে অনেক বড় এবং বেশ ব্যস্ত।

কেনই বা হবে না। এখন এখানে মিটার ও ব্রড গেজ দু-রকম গাড়ি আসা-যাওয়া করে। তাছাড়া এখান থেকে একই গাড়িতে যাওয়া যাচ্ছে দিল্লি জম্মু-তাওয়াই দাদর (বম্বে), মাদ্রাজ ত্রিবান্দ্রম কোচিন ও বাঙ্গালোর প্রভৃতি শহরে। আমি শেষবার যখন ট্রেনে আসামে এসেছি, তখন ব্রডগেজ লাইন সবে বঙ্গাইগাঁও পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে।

যাক্‌গে যেজন্য এই সকালবেলা স্টেশনে আসা, তার কারণটা বলে নিই। আমার ভাইঝি মৌসুমী ও জামাই অসীম পরশু কামরূপ এক্সপ্রেসে হাওড়া থেকে গৌহাটি রওনা হয়েছে। ওরা শিলং যাবে, অসীম সেখানে চাকরি করে। কামরূপ এক্সপ্রেস আগের দিন সাড়ে পাঁচটায় হাওড়া থেকে ছেড়ে পরদিন বিকেল পাঁচটায় গৌহাটি পৌছয়। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বন্যায় খানিকটা জায়গায় রেল লাইন ভেসে গিয়েছে। সেখানে রেল কর্তৃপক্ষ বাসের ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ যাত্রীদের মালপত্রসহ রেল থেকে নেমে বাসের সওয়ার হতে হচ্ছে। বাস তাঁদের নিয়ে আসছে অক্ষত লাইনের ধারে। সেখান থেকে আবার তাঁরা রেলে উঠছেন।

সুতরাং ওরা কখন গৌহাটি পৌঁছবে, তা ঠিক ছিল না। তাই বলেছিলাম, বেশি রাত হলে ওরা যেন স্টেশন থেকে আমাদের বাড়িতে চলে আসে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওরা আসেনি। তাই পরশুর কামরূপ এক্সপ্রেসের খবর নিতে আজ আমরা স্টেশনে এসেছি।

খবর পাওয়া গেল। পরশুর কামরূপ এক্সপ্রেসের যাত্রীরা গতকাল রাত তিনটায় এখানে পৌঁছেছেন। মৌসুমীরা তাই বোধকরি আমাদের ওখানে যেতে পারেনি। বাকি রাতটুকু স্টেশনে কাটিয়ে আজ সকালের বাস ধরে শিলং চলে গিয়েছে।

যাক্ গে, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমরা ওভারব্রিজ পার হয়ে স্টেশনের অপর পারে আসি। এ অঞ্চলটার নাম পল্টনবাজার। সরকারি ও বেসরকারি বাসের প্রধান টার্মিনাস। এখান থেকে বাস যাতায়াত করে আসামের বিভিন্ন প্রান্তে ও আসামের বাইরে, কোহিমা মণিপুর ইটানগর আইজল আগরতলা ও শিলং ইত্যাদি। মৌসুমীরা আজ সকালে এখানে এসেই শিলঙের বাস ধরেছে।

আমি ও অশোক এ. টি রোড ধরে পশ্চিমে এগিয়ে চলি। ডানদিকে সরকারি বাস ডিপো আর বাঁদিকে বিভিন্ন বেসরকারি বাস এজেন্সির অফিস। তারপরে বাজার। আরেকটু এগিয়েই পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থলে। তার মানে ব্যাঙ্ক অব্ বরোদার এ. টি. রোড শাখায়। চিফ ম্যানেজার মিস্টার এস. মিত্র ওরফে সুখময়বাবু আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

খুবই খুশি হলেন সুখময়বাবু। আমি প্রায় পুজো পর্যন্ত এখানে থাকব শুনে তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা। ভদ্রলোক মধ্যবয়সী অকৃতদার সাহিত্য সুরসিক এবং আড্ডাবাজ। অতএব আমার মতো একজন বেকার বেশিদিন এখানে থাকলে তাঁর সুবিধে।

সুখময়বাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, সামনে বসে থাকা তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে। নাম মানস বটব্যাল। একটা ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করেন। কিন্তু তাঁর আসল পরিচয়, তিনি একজন বাংলা ও অসমীয়া কবি। অনুবাদকও বটে। কবি নবকান্ত বড়ুয়ার সদ্য প্রকাশিত

একটি সঙ্কলনে বেশ কয়েকটি অসমীয়া কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

কাজের সময় কারও অফিসে বেশিক্ষণ বসা সমীচীন নয়। তাই ঠাণ্ডা পানীয় গলাধঃকরণ করে বিদায় নিই সুখময়বাবুর কাছে। মানসবাবুও আমাদের সঙ্গী হলেন। কথা হয় কয়েকদিনের মধ্যেই ওঁরা দুজনে আসবেন আমাদের বাড়িতে এবং আমরা একদিন নবকান্ত-বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাবো। মানসবাবু তাঁকে খবর দিয়ে রাখবেন।

ব্যাঙ্ক থেকে নেমে এসে কিছু কেনাকাটা করি। তারপরে একটা রিকশায় উঠে বসি। সরাইঘাট পুল পার হয়ে রেল লাইনটি উত্তর আসাম থেকে দক্ষিণ আসামে এসেছে। উত্তর আসাম মানে কোকরাঝাড়, বঙ্গাইগাঁও, বরপেটা, নলবাড়ি, দরং, সোনিতপুর, লখিমপুর প্রভৃতি জেলা। আর দক্ষিণ আসাম মানে গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নগাঁও, কারবি অ্যাংলং, জোড়হাট, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, উত্তর কাছাড় ও কাছাড় ইত্যাদি।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। সরাইঘাট পুল পার হয়ে, রেল লাইনটি উত্তর আসাম থেকে দক্ষিণ-মুখী হয়ে পাণ্ডু পৌঁছেছে। তারপরে মালিগাঁও ও কামাখ্যা ছাড়িয়ে গৌহাটি শহরের ভেতর দিয়ে লামডিং চলে গিয়েছে। রেল লাইনের বাঁয়ে ব্রহ্মপুত্র ও রেল স্টেশন আর ডাইনে শহরের বৃহত্তর অংশ। তাহলেও উত্তরাংশই নগর গৌহাটির সমৃদ্ধতর অঞ্চল। কারণ ফ্যান্সিবাজার, পানবাজার ও উজান-বাজার, হাইকোর্ট ও ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, সার্কিট হাউস, ডেপুটি কমিশনারের অফিস, ট্যুরিস্ট, লজ, জেনারেল পোস্ট অফিস, রবীন্দ্র-ভবন, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি প্রভৃতি সবই এই অংশে। দক্ষিণাংশের সবচেয়ে জমজমাট জায়গা এই পল্টনবাজার। আর এই অংশেই নির্মিত হয়েছে স্টেডিয়াম, গান্ধীমণ্ডপ, টি. ভি. স্টেশন, স্টেট জু, মেডিকেল কলেজ, ফিল্ম স্টুডিও এবং রাজধানী দিসপুর।

উত্তর থেকে দক্ষিণে রেল লাইন পারাপারের জন্ত গাড়ি চলাচলের

উপযোগী তিনটি ওভারব্রিজ রয়েছে। একটি এখানে এই পল্টনবাজার ও পানবাজারের উপকণ্ঠে, একটি আমবাড়ি ছাড়িয়ে আরেকটা চাঁদমারিতে।

আমরা ওভারব্রিজ পার হয়ে এলাম। একটু বাদেই বাঁদিকে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট। হঠাৎ অশোক বলে ওঠে একবার দেবাবালা দেবীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন নাকি?

কথাটা খেয়াল হয় আমার। সে এখন এই আদালতের মুন্সেফ। অমরাবতী আসামে আমি তার কথা লিখেছি। তখন সে অ্যাডভোকেট ছিল, এখন জজ হয়েছে। ওর স্বামীও একজন জজ। খুবই বড় ঘরের মেয়ে। আসামের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত গোপীনাথ বরদলৈ-এর দৌহিত্রী। গতবার আসাম এসেও দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। আমি যে আবার আসামে এসেছি এ খবরটা তাকে জানানো উচিত। তবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলি—বেলা ছুটো বাজে, চান-খাওয়া হয়নি। আর দেরি করলে যে খুকু খুবই বিগড়ে যাবে।

—আমরা তো বেশিক্ষণ বসব না। দেখা করেই চলে যাবো। আপনি আবার আসামে এসেছেন দেখে উনি খুশি হবেন। নারিকেল বস্তি থেকে এই বাড়িতে এসে আমরা একটা পার্টি দিয়েছিলাম। দেবাবালাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম। ওরা স্বামী-স্ত্রী ছুজনেই এসেছিলেন।

অতএব রিকশা থেকে নেমে পড়ি। দেবাবালা আদালতে ছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে একটু মৃত্নু হাসলেন। তারপরে পেস্কারকে কাছে ডেকে কিছু বললেন। তিনি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে আমাদের কাছে এলেন। বললেন—জজসাহেব আপনাদের চেম্বারে নিয়ে গিয়ে বসাতে বলে দিলেন।

আমরা তাঁর সঙ্গে চেম্বারে এসে বসি। পেস্কার চলে যান। একটু বাদেই দেবাবালা চলে আসেন। জিজ্ঞেস করি—কেমন আছেন?

—ভাল নয়। দেবাবালা উত্তর দেন। বলেন—আমরা বড়ই

অশান্তিতে আছি।

—কেন? আমি অবাক কণ্ঠে বলি। তারপরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি—মিস্টার শর্মা কেমন আছেন?

—ভাল।

—আপনার মেয়ে?

—সে তো শিলঙে পড়ছে। ভালই আছে।

তাহলে দেবাবালা ভাল নেই কেন?

কিন্তু আমি আর সেকথা জিজ্ঞেস করতে পারি না। তার আগেই অশোক বলে ওঠে—ওনার ছোটমামা মানে শ্রীবলিন বরদলৈ-এর জন্য ওঁরা বড় অশান্তিতে রয়েছেন।

কথাটা খেয়াল হয় আমার। দেবাবালার ছোটমামা অর্থাৎ গোপীনাথ বরদলৈ-এর ছোটছেলে বলিন টাটা টি কম্পানিতে বড় চাকরি করেন। মাস পাঁচেক আগে তাঁকে সন্ত্রাসবাদীরা ধরে নিয়ে গিয়েছে। ধরার পরে সন্ত্রাসবাদীরা ১৫ কোটি টাকা মার্কিন ডলারে মুক্তিপণ দাবি করছে। কিন্তু টাটা টি কর্তৃপক্ষ সেই দাবি পূরণ করতে অস্বীকার করেছেন। ফলে বলিনবাবুর নিয়তি অনিশ্চিত। আর তাই দেবাবালা ভাল নেই। খুবই স্বাভাবিক। কারণ আসামে এমন বেশ কয়েকজন নিরাপরাধিকে সন্ত্রাসের শিকার হতে হয়েছে।

তবু আমি ভরসা দিই। বলি—পাঁচ মাস হয়ে গেল ওরা তাঁকে আটকে রেখেছে। খুবই দুশ্চিন্তার কথা। তবু আমার বিশ্বাস তিনি একদিন সুস্থ শরীরে আপনাদের মধ্যে ফিরে আসবেন। কারণ গোপীনাথ বরদলৈ-এর ছেলেকে অকারণে হত্যা করবার মতো জঘন্য কাজ আসামের মাটিতে সংঘটিত হতে পারে না।

দেবাবালা মাথা নাড়েন। বলেন—আমরাও এই আশাতে বুক বেঁধে রয়েছি।

আদালতের সময়। সুতরাং চা খেয়ে বিদায় নিই দেবাবালার কাছ থেকে। ওঁদের একদিন আমাদের বাড়িতে আসতে বলি। দেবাবালা সম্মত হন। তিনি আমাদের রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেন।

বিদায় বেলায় আবার বলি—আপনার মামা নিশ্চয়ই সুস্থ দেহে ঘরে ফিরে আসবেন। ভগবানের কাছে আমরাও তাঁর মুক্তি প্রার্থনা করছি।*

---

* ভগবান আমাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। এগারো মাস পরে গত ২রা মার্চ (১৯৯৪) বলিনবাবু ঘরে ফিরে এসেছেন। পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি আমি উদ্ধৃত করে দিলাম।

'গুয়াহাটি, ২ মার্চ—দীর্ঘ এগারো মাস পর অসমের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈয়ের পুত্র এবং টাটা টি-র উচ্চপদস্থ অফিসার বলিন বরদলৈকে মুক্তি দিল বড়ো জঙ্গিরা। গতরাতে নিম্ন অসমের বাইহাটায় গাড়ি থেকে বলিনকে নামিয়ে দিয়ে যায় জঙ্গিরা। তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন দাদা রবিন ও দিদি লিলি মজিন্দর। মা সুরাবালা তখন রবিনের বাড়িতেই ছিলেন। আজ সকালে ক্লান্ত বলিন নিজের বাড়িতে ফিরে যান। দীর্ঘ বন্দিদশার পর বলিন জানিয়েছেন, অর্থের বিনিময়ে নয়, সম্পূর্ণ মানবিক কারণেই অপহরণকারী বড়ো সিকিউরিটি ফোর্সের জঙ্গিরা তাঁকে মুক্তি দিয়েছে। উল্লেখ্য, বলিনের মুক্তির বিনিময়ে ১৫ কোটি টাকা মার্কিন ডলারে দাবি করেছিল বড়ো জঙ্গিরা। টাটা টি-র চেয়ারম্যান দরবারি শেঠ জানিয়েছেন, সংস্থার ৫৭ হাজার কর্মী প্রতিদিন বলিনের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতেন। তাঁদের সেই প্রার্থনার ফল হয়েছে।

বলিন জানিয়েছেন, জঙ্গিরা আগাগোড়াই তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে। তাঁকে মুক্তি দেওয়ার সময় অসমের প্রথা অনুযায়ী সর্বোচ্চ সম্মান 'গামোছা-সরাই' পর্যন্ত উপহার দেয় তারা। বন্দি অবস্থায় তিনি জঙ্গিদের ইংরাজি শেখাতেন এবং নিজে শিখতেন বড়ো ভাষা। সময় কাটাতে রক্ষীদের সঙ্গে প্রায়ই দাবা খেলতেন। প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কোনও পাহাড়ি এলাকায়। তারপর কোনও গ্রামে। সে জায়গা কোথায় বলিন তা বলতে পারেননি। তবে এই ১১ মাসে মোট ৯৮টি বাড়িতে তাঁকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। সরকারি সূত্রের খবর, ভুটানের কোনও গ্রামে সম্ভবত তাঁকে রাখা হয়েছিল।

খাওয়া দাওয়া নিয়েও কোনও অসুবিধা হয়নি বলিনের। পছন্দসই নিরামিষ খাবার দিত জঙ্গিরা। এদিকে বাড়িতে বলিনের মা সুরাবালা প্রতিদিনই ছেলের ফেরার আশায় প্রিয় মিষ্টি বানিয়ে রাখতেন। গতকালও বানিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে সেই মিষ্টি মুখে দেন বলিন।'

॥ চার ॥

আজ সকালে শুধুই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছি আর কোথাও যাওয়া হয়নি। এবারে আসাম এসে আমার এই একটা উন্নতি হয়েছে, আমি প্রাতঃভ্রমণ করছি। কারণ অবশ্যই ব্রহ্মপুত্র। আমাদের বাড়ি ব্রহ্মপুত্রের খুবই কাছে, বোধকরি আধ কিলোমিটার হবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ল্যাম্ব্ রোড ধরে ডাইনে এগোলে প্রথমে জোড়পুখুরি অর্থাৎ পাশাপাশি একজোড়া পুকুর। তারপরে উগ্রতারা মন্দির, প্রথম পুকুরটির পারে। দেবী উগ্রতারা শুনেছি খুবই জাগ্রতা। মন্দিরটিও বেশ বড় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খুকু প্রায়ই আসে, মায়ের সামনে প্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। সেদিন বুলাও এসেছিল ওর সঙ্গে। সে-ও দর্শন করে খুশি হয়েছে।

ল্যাম্ব্ রোডের দু-পাশেই ছোট-বড় সুন্দর সুন্দর বাড়ি। প্রায় প্রতি বাড়ির সামনেই ফুলের বাগান। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুলের নাগাল পাওয়া যায় এবং ফুল তুললে কেউ মারতে আসেন না। আমি ফেরার পথে খুকুর জন্যে পুজোর ফুল নিয়ে আসি। খুকু প্রতিদিন ঠাকুর, মা ও স্বামীজী এবং মা-কামাখ্যার পুজো করে।

উগ্রতারা মন্দির থেকে কয়েকখানি বাড়ি ছাড়িয়েই ল্যাম্ব্ রোড ও মহাত্মা গান্ধী রোডের সঙ্গম। বাঁদিকে খানিকটা দূরে মহাত্মা গান্ধী রোডের ওপরে হাইকোর্ট আর ডানদিকে উজানবাজার।

সঙ্গম ছাড়িয়ে ল্যাম্ব্ রোড প্রসারিত হয়েছে সামনে, একেবারে ব্রহ্মপুত্রের তীরে। সঙ্গমের পরে পথের বাঁদিকে একটা বেশ বড় ময়দান তারপরে নির্মীয়মান প্ল্যানেটোরিয়াম। ডানদিকে রেড্ ক্রশের রাজ্যিক সদর দপ্তর। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকাদেবী বরকটকী এখন এই দপ্তরের প্রধান। একদিন দেখা করতে হবে তাঁর সঙ্গে। হোজাই সাহিত্য সম্মেলনে দাঁড়িয়ে তিনি আমার 'অমরাবতী

আসামে'র যে প্রশংসা করেছিলেন, তা আজও আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

পথটা যেখানে ব্রহ্মপুত্রের তীরে পৌঁছেছে সেখানে বাঁদিকে খেয়াঘাট আর হাটখোলা—ব্রহ্মপুত্রের বেলাভূমিতে। আর ডানদিকে, পথটা যেখানে ডাইনে বেঁকে ব্রহ্মপুত্রের সমান্তরাল হয়ে পুবে অর্থাৎ উজানবাজারের দিকে প্রসারিত হয়েছে, ঠিক সেখানেই নির্মীয়মান বিবেকানন্দ সেণ্টার। তিন তলা পর্যন্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে। শুরু হয়েছে প্রার্থনা, ভজন ও ধ্যান এবং যোগব্যায়ামের ক্লাস। রোজ সকালে বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী ও প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া যোগ দিতে আসেন।

কিছুকাল ধরেই সমাজসেবা ও ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ সেণ্টার ভারতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ রক্ টেম্প্‌ল তাঁদের প্রধান কীর্তি। এখন তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সমাজসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। আমার বাবুজি (সর্বজন শ্রদ্ধেয় সলিসিটার শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক শ্রীভগবতী প্রসাদ খৈতান।) এঁদের ট্রাস্টিবোর্ডের একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি তাঁর চাণ্ডিলের বাড়িখানি এই সেণ্টারকে দিয়ে দিয়েছেন। সেণ্টার সেখানে স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করছেন।

বিবেকানন্দ সেণ্টার ছাড়িয়ে পথের ডানদিকে সারি সারি বাড়ি। অধিকাংশই টিনের, আসাম-টাইপ বাংলো। তবে মাঝে মাঝে কংক্রিটের বাড়িও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পনেরো বছর আগে প্রথম যখন গৌহাটি এসেছিলাম, তখন এতো কংক্রিটের বাড়ি ছিল না। এখন কলকাতার মতো গৌহাটিতেও প্রমোটার-সাম্রাজ্য প্রসারিত হচ্ছে। ভূমিকম্পের এলাকা বলে আসাম ও উত্তরবঙ্গে যে হালকা বাড়ি তৈরি করবার নিয়ম প্রচলিত ছিল, কর্তৃপক্ষ বোধকরি তা বিস্মৃত হয়েছেন। এমনকি গতবছর মহারাষ্ট্রের লাটুরে এবং তার আগে উত্তরকাশীতে যে তাণ্ডব ঘটে গেল, সে কথাও মনে রাখলেন না।

যাক্ গে যেকথা বলছিলাম, পথের ডানদিকে সারি সারি বাড়ি।

কোনটি বাসাবাড়ি কোনটিতে বা অফিস। মৎস এবং রাজস্ব দপ্তরের অফিস দুটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাগানগুলি। প্রতি বাড়ির সামনেই ফুলের বাগান। ফুলের সঙ্গে অসমীয়াদের বন্ধন প্রাণের আর গানের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ওঁদের হৃদয়।

পথের বাঁদিকে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের বেলাভূমি জুড়ে গাছের সারি। শাল থেকে বট অশ্বত্থ আর কৃষ্ণচূড়া। নানা জাতের বড় বড় গাছ। পাখির গান শুনতে শুনতে ব্রহ্মপুত্রের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে পথ চলতে ভারি ভাল লাগে আমার।

ব্রহ্মপুত্রের তীরে বেশ কিছু লঞ্চ আর ছোট-বড় নৌকো নোঙর করে থাকে। তার বুক বেয়ে যাওয়া-আসা করে নৌকো আর স্টিমার। নৌকোগুলোই দেখার মতো। নানারকমের ছোট-বড় নৌকো। কোনটি পালে চলে, কোনাটি দাঁড় টেনে, কোনটি বা বৈঠা বেয়ে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভুলে যাই যে আমি আসামে, আমি ব্রহ্মপুত্রের তীরে। মনে হয় আমি বুঝি বরিশালে কীর্তনখোলার তীরে রয়েছি দাঁড়িয়ে। আর তারপরে নিজেকেই প্রশ্ন করি, আচ্ছা আসামের সঙ্গে আমার ছেড়ে আসা জন্মভূমির এত মিল কেন?

তাই কি আসামকে এত ভাল লাগে আমার? আমি বার বার তার কাছে এমন ছুটে ছুটে আসি!

যাকগে যেকথা বলছিলাম। ভাসমান তরণীর শোভাযাত্রায় ডিঙ্গিনৌকোর সংখ্যাই বেশি। তাদের অধিকাংশই মাছ নিয়ে ঘাটে আসে। মাছের ঘাটটা বেশ খানিকটা দূরে, উজানবাজারের কাছে। সেখানেও সকালে একটা রীতিমত বাজার বসে যায়। মাছের নীলাম হয়। দলে দলে মানুষ মাছ কিনতে আসে। আর তাদের জন্য বেশ কয়েকটি চা-পকোড়া, পুরি-হালুয়া আর মুড়ি-তেলেভাজার দোকান বসে। সাইকেল রিকশা আর ভ্যানে রাস্তাটা প্রায় ভরে ওঠে।

মাছের বাজার ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। প্রভাতীসূর্যের সোনালী আলোয় ব্রহ্মপুত্র আর তার তীরভূমিকে দেখতে দেখতে পথ চলি।

গঙ্গার মতো জোয়ার-ভাটা নেই ব্রহ্মপুত্রের বুকে। সে একই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে পূর্বলোক থেকে মানস সরোবরের স্বর্গবারি এনে অবিরত বয়ে চলেছে পশ্চিম-সাগরতীরে।

চলতে চলতে মনে পড়ে যায় প্রগতির কথা, এক শীতের সন্ধ্যায় এই ব্রহ্মপুত্রের তীরে বসে সে আমাকে বলেছিল ব্রহ্মপুত্রের কথা। ব্রহ্মপুত্র আজও বয়ে চলেছে, কিন্তু প্রগতি ?

থাক্‌গে তার কথা। ব্রহ্মপুত্রের কথাও আর নয়। প্রাতঃভ্রমণের প্রসঙ্গ ছেড়ে এখন অন্য কথায় আসা যাক, আজ বিকেলের কথায়।

আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি ও অশোক একটা অটো-রিকশা নিয়ে দিসপুরে এলাম। আগেই বলেছি গৌহাটিতেও অটো-রিকশা মিটারে চলে না। তবে এখানে পাঁচজন যাত্রী ভরে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ছুটোছুটি করার রেওয়াজ নেই। কেবল দরাদরি করে আগে ভাড়াটা ঠিক করে নিতে হয়। আমাদের অবশ্য তাও করতে হল না। জনতা ভবনের সামনে নেমে অশোক কুড়ি টাকা দিল। ড্রাইভার কোন আপত্তি করলেন না।

সচিবালয়ে কারও সঙ্গে দেখা করতে হলে পাস করতে হয়। কিন্তু দিলীপবাবু বলে রাখায় আমরা বিনা পাসেই ভেতরে আসতে পারলাম। প্রধান তোরণে মেটাল ডিটেক্টার-এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য অবশ্য আমাকে পেস্‌মেকার কোম্পানির কার্ডখানি দেখাতে হল। মেটাল ডিটেক্টার পেস্‌মেকার-এর পক্ষে ক্ষতিকারক। আজকাল তো বিমানবন্দর থেকে মহাকরণ পর্যন্ত সর্বত্রই মেটাল ডিটেক্টার। তাই আমাকে পেস্‌মেকার-এর পরিচয়পত্রটি সবসময়ে পকেটে রাখতে হয়।

দিলীপবাবু মানে দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এখন আসাম সরকারের অ্যাডিশনাল চিফ্‌ সেক্রেটারি এবং এগ্রিকালচার প্রোডাক্‌শন কমিশনার। তিনি কেবল সুপ্রশাসক নন একজন অতিশয় সাহিত্যসুরসিক। তাই 'অমরাবতী আসাম' পড়ে আবার আসামে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে প্রকাশকের ঠিকানায়

চিঠি দিয়েছিলেন। তখন তিনি শিবসাগরের জেলাশাসক। আমাকে লিখেছিলেন—

'আপনার "অমরাবতী আসাম" বইখানা পড়ে খুবই খুশি হলাম।...

গতবছর আপনারা যখন জোড়হাটে এসেছিলেন, আমি তখন নগাঁও-এর জেলাশাসক। পার্শ্ববর্তী শিবসাগর জেলার সদর জোড়হাটে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কথাও শুনেছিলাম, চাক্ষুষ দেখাশোনার সময় পাই নি।

আসামের পাঠকমহল আপনার নতুন গ্রন্থ সাগ্রহে নিয়েছেন জেনে বিশেষ আনন্দ পেলাম।

আমি নিজে যদিও কলকাতার ছেলে। চাকরী ব্যপদেশে আসামে একযুগ কেটে গেল।...

আমার জেলাসদর জোড়হাটের লোকজন, জায়গা-বাড়ি আপনাকে মুগ্ধ করেছে জেনে সত্যিই খুশি হয়েছি।

অমরাবতী আসাম আপার আসাম সম্পর্কে সঠিক চিত্র পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পৌঁছে দেবে নিঃসন্দেহে। আসামে বইটি সর্বত্র সমানভাবে আদৃত হবে এবং বাংলা ও অসমীয়া ভাষাভাষীদের মাঝে সেতুবন্ধনের মত কাজ করবে।...

আবার আসামে আসুন। দেখতে, বেড়াতে, পরিচিতদের সঙ্গে মিলতে। 'ম্যাড্রাস হোটেলে' যেন উঠবেন না—আপনার এতো শুভাকাঙ্ক্ষী থাকতে...'

সে আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারিনি এবং সেবার জোড়হাটে গিয়ে সত্যই আমার পক্ষে হোটেলে ওঠা সম্ভব হয়নি। কারণ প্রগতিও লিখেছিল—'এবারে জোড়হাটে এসে কিন্তু আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে। আগেই বলে রাখছি। আর কারও বাড়িতে আপনাকে আমি কিছুতেই থাকতে দেব না।...'

কিন্তু এখন প্রগতির কথা নয়, দিলীপবাবুর অফিসে এসেছি। তাঁর কথাই ভাবা যাক।

তারপর থেকে অর্থাৎ গত পনেরো বছর ধরে দিলীপবাবু আমার বন্ধু, আমার একজন অকৃত্রিম সুহৃদ। এবারেও গৌহাটি এসে তাঁকে ফোন করেছি। তিনি আজ বিকেলে আমাদের এখানে আসতে বলেছেন। ঠিক হয়েছে, আমরা একবার ইন্দিরাদি অর্থাৎ শ্রীযুক্তা ইন্দিরা মিরির সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

আসাম সেক্রেটারিয়েট রাইটার্স বিল্ডিংস-এর মতো একটা বহুতল ও বিশালবাড়ি নয়, অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেকগুলো একতলা অসমীয়া বাড়ি, টিন আর কাঠের তৈরি। তারই একটিতে আসা গেল। নাম বলতেই বেয়ারা ভেতরে নিয়ে এলো।

দিলীপবাবু আমাদের দেখে খুশি হলেন। বসতে বললেন। হাতের কাজ শেষ করে বললেন—চলুন, এবারে যাওয়া যাক।

আমরা বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠি। একটু অবাক হই। গতবছর গৌহাটি এসেও দিলীপবাবুর গাড়িতে শিলং গিয়েছি। কিন্তু সে গাড়ি ছিল অ্যামবাস্যাডর আর আজ দেখছি মারুতি।

গাড়ি চলতে শুরু করে। তিনি নিজেই বলেন—কয়েকদিন আগে কয়েকখানি মারুতি এসেছে। আমি তারই একখানি নিয়ে নিলাম। বাড়ির সবাই কলকাতায়, আমার বড় গাড়ির দরকার কী? বরং এতে সরকারের কিছু তেল বেঁচে যাচ্ছে।

সচিবালয়ের গণ্ডি পার হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে আসি। এখানে সশস্ত্র পুলিশ বোঝাই কয়েকখানি জিপ দাঁড়িয়ে আছে। তারই এক-খানির পাশে এসে আমাদের গাড়ি থামে। দিলীপবাবু তাঁর দেহরক্ষীকে বলেন—শইকীয়া, ওদের বলে দাও, আজ আর সঙ্গে যাবার দরকার নেই। কাল সকাল সাড়ে ন'টায় যেন কোয়ার্টার্স-এর সামনে আসে।

অর্থাৎ অ্যাডিশনাল চিফ, সেক্রেটারি এসকর্ট ছাড়াই পথে বের হলেন। গতবছর গৌহাটি এসেও এটা দেখিনি। কারণ তার কয়েকদিন আগেও দিসপুরের আই. এ. এস. কলোনি থেকে একজন সচিব অপহৃত

হয়েছিলেন। এখন নাকি অবস্থা অনেক ভাল। আর তাই বোধকরি দিলীপবাবু এসকর্ট ছেড়ে দিলেন। ভালই করলেন সশস্ত্র পুলিশের গাড়ি সঙ্গে নিয়ে কোথাও গেলে পথচারীরা বড়ই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। নিজেকে বড় ভীতু বলে মনে হয়।

দিসপুর এলাকা ছাড়িয়ে আমরা গণেশগুড়ি মোড়ে আসি। আর. জি. বরুয়া রোড এখানে এসে এ. টি. রোডের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ছু-ধারেই বড় বড় বাড়ি। পথের পাশে ঝলমলে দোকানের সারি। কিছু অফিসও আছে। তার মধ্যে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর বুকিং অফিস অন্যতম।

—আমরা তো শিলপুখুরি যাচ্ছি? অশোক জিগেস করে।

দিলীপবাবু উত্তর দেন—না। কথাটা বলা হয়নি আপনাদের। ইন্দিরাদি এখানে নেই। শিলঙে ছেলের কাছে গিয়েছেন। চার-পাঁচদিন পরে ফিরবেন। তখন তাঁর কাছে যাওয়া যাবে।

—আজ তাহলে কোথায় যাচ্ছি? আমি প্রশ্ন করি।

—বামুনিময়দানে, আমার এক প্রাক্তন সহকর্মীর বাড়িতে।

একটু অবাক হই। গতকাল ফোনে কথা হয়েছিল। তিনি আজ বিকেলে আমাদের ইন্দিরাদির বাড়িতে নিয়ে যাবেন। ইন্দিরাদি মানে শ্রীমতী ইন্দিরা মিরি আমার পূর্বপরিচিতা। অমরাবতী আসামে আমি তার কথা লিখেছি। তিনি একজন স্বনামখ্যাতা শিক্ষাবিদ। বাংলা ও অসমীয়া সাহিত্যে তাঁর প্রচুর পাণ্ডিত্য। তাঁর কাছে না গিয়ে আমরা একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিবের সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছি!

দিলীপবাবু আবার বলেন—ভদ্রলোকের নাম বীরেশ্বর বরুয়া। আপনার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট, ছু-বছর হল সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। ভদ্রলোক শ্রীমাধবদেবের ঘরনার লোক। পৈতৃক নিবাসও বরপেটার সুন্দরীদিয়ায়। বরপেটায় ম্যাট্রিক ও কটন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে আসাম সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে তাঁকে ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার (আই. এ. এস.)

অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবসর নেবার সময় তিনি আসাম সরকারের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিভাগের সচিব ছিলেন।

তাঁর স্ত্রী সুভদ্রাদেবী প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার খুড়তুতো বোন। তিনি এখানে একটা কলেজে অধ্যাপনা করেন। ওঁদের দুটি ছেলে-মেয়ে। ছেলেটি আমেরিকায় ডক্টরেট করছে আর মেয়েটি দিল্লিতে পড়ছে।

কিন্তু আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি অন্য একটি কারণে। সরকারি চাকরি বীরেশ্বরবাবুর একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি আসামের একজন প্রখ্যাত কবি ও প্রবন্ধকার। গল্প উপন্যাসও লিখেছেন। তার এ যাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তিরিশ। 'নির্বাচিত কবিতা' নামে তাঁর একটি কাব্য সংকলন ভারতীয় ভাষাপরিষদ দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে। 'বনরীয়া ফুল' নামে তাঁর একটি গল্প চলচ্চিত্রে রূপায়িত। তাঁর অনেক কবিতা বাংলা ওড়িয়া হিন্দি গুজরাতী ও ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে।...

দিলীপবাবুর শেষের দিকের কথাগুলি শুনে একটু লজ্জা পাই। ভদ্রলোক সরকারি চাকুরে শুনে আমার তো অমন মনোভাব হওয়া উচিত ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে শুরু করে অচিন্ত্য-কুমার জরাসন্ধ ও অন্নদাশঙ্কর পর্যন্ত সরকারি চাকুরেরা তো আমাদের সাহিত্যেও কত কীর্তি স্থাপন করেছেন। এই তো কিছুদিন আগে ভারত সরকারের সংস্কৃতি সচিব ডঃ সীতাকান্ত মহাপাত্র জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত হলেন। আর আমি নিজেও যে সারাজীবন সরকারি চাকরি করেছি। ·

—আমরা এসে গেছি।

দিলীপবাবুর কথায় আমার ভাবনা যায় হারিয়ে। তাকিয়ে দেখি সুন্দর একখানি অসমীয়া টাইপ বাড়ির গায়ে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। বাড়ির সামনে ছোট অথচ ভারি সুন্দর বাগানটি গৃহস্বামীর মার্জিত রুচি ও কবিমনের পরিচয় দিচ্ছে।

দিলীপবাবু আবার বলেন—এ মহল্লাটার নাম বামুনিময়দান, এটি

গুয়াহাটী শহরের উত্তর-মধ্যাঞ্চল।

গাড়ি থেকে নেমে আসি। শইকীয়া এগিয়ে গিয়ে গেট খুলে দেয়। আমরা বাগানে প্রবেশ করি। বাড়ির দরজা খুলে যায়। সস্ত্রীক বীরেশ্বরবাবু বেরিয়ে আসেন। দুজনেই হাতজোড় করে বলে ওঠেন—নমস্কার। আসুন, আসুন। আমরা আপনাদের পদশব্দের প্রতীক্ষায় ছিলাম।

শুধু বিশুদ্ধ বাংলা নয়, সেইসঙ্গে নির্ভুল উচ্চারণ। শিক্ষিত অসমীয়ারা প্রায় প্রত্যেকেই এমনি বাংলা বলেন।

তাঁদের পেছনে একটি তরুণ। আমরা বারান্দায় উঠে আসতেই সে আমাকে ও দিলীপবাবুকে প্রণাম করে অশোকের সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু অশোক প্রণাম করতে দেয় না, বুকে জড়িয়ে ধরে।

বীরেশ্বরবাবুর বলেন—আমার ছাত্র উৎপল দাস। বরপেটার ছেলে। গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি নিয়ে এম. এ. পড়ছে।

সপ্রতিভ ছেলেটির অমায়িক ব্যবহার ভাল লাগে।

আমরা বারান্দা পার হয়ে ড্রয়িংরুমে আসি। সোফা ও সেণ্টার টেব্‌ল, পর্দা কিছু ওয়াল ডেকরেশান ও ফুল দিয়ে সুসজ্জিত ঘরখানি গৃহকর্ত্রীর মার্জিত রুচির পরিচয় বহন করছে।

আমরা আসন গ্রহণ করতেই মিসেস বরুয়া ভেতরে চলে যাবার জন্য পা বাড়ান। বাধা দেন দিলীপবাবু। বলেন—চা একটু পরে হলেও চলবে। একটু বসুন, এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি বসে পড়েন। একটু হাসেন।

—ছেলে-মেয়ে বাইরে, বাড়িতে তো আপনারা দুজন?

মিসেস অশোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারার আগেই বীরেশ্বরবাবু বলে ওঠেন—দুজন নয়, একজন বলাই উচিত হবে। ওর তো কলেজ আছে, আমি বেকার। কাজের লোক নিয়ে সারাদিন আমাকেই একা বাড়িতে বসে থাকতে হয়।

—হ্যাঁ। বসেই থাকেন। বাড়ির অন্য কোন কাজ তো দূরের কথা, ঠেলে বাজারে পাঠাতে হয়।

মিসেসের মন্তব্য শুনে হেসে ওঠি। তিনি উঠে দাঁড়ান। দিলীপ-বাবুর দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে বলেন—আপনারা বসুন, গল্প করুন। আমি এবারে আপনাদের চায়ের যোগাড় করি।

অধ্যাপিকা হলেও মধ্যবিত্ত গৃহিণী। বাড়িতে কেউ এলে অতিথি সৎকারে ব্যস্ত না হয়ে পারেন না।

এবারে আর দিলীপবাবু বাধা দেন না। একটু হেসে বলেন—বেশ যান। কিন্তু বেশি কোন আয়োজন করবেন না যেন।

—না, না। বেশি আর কি করব। তিনি ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়ান। কিন্তু চলে যাবার আগে নিজের পরিত্যক্ত চেয়ারখানি দেখিয়ে উৎপলকে বলেন—তুমি ব'সো।

—হ্যাঁ, বসছি।

একটা জিনিস লক্ষ্য করে ভারি ভাল লাগছে। আমরা বাঙালি বলে এঁরা নিজেদের মধ্যেও বাংলায় কথা বলছেন। অসমীয়াদের এই শালীনতাবোধ আমাকে বড়ই মুগ্ধ করে।

উৎপল বসার পরে বীরেশ্বরবাবু বলেন—উৎপল শুধু আমার ছাত্র নয়, আমাদের দুজনের জন্ম একই জায়গায়।

—কোথায়?

—সুন্দরীদিয়ায়।

—আপনারা দুজনেই ভাগ্যবান। পূজনীয় শ্রীমাধবদেবের পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যধাম আপনাদের জন্মভূমি। আমি বলি।

—আপনার তো সুন্দরীদিয়ার ওপরে একখানি বই আছে। দিলীপবাবু বলেন।

উৎপল উত্তর দেয়—হ্যাঁ। একখানি অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ। নাম—'সুন্দরীত শ্রীশ্রীমাধবদেব মাধব মরল অতিরাম বরুয়া আরু অন্যান্য।' আপনারা বোধহয় জানেন যে স্যার অতিরাম বরুয়ার বংশধর।

দিলীপবাবু মাথা নেড়ে বলেন—জানি।

এবারে উৎপল আমাকে বলে—আমার একটা আবেদন আছে।

—আমার কাছে! সবিস্ময়ে বলি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। উৎপল উত্তর দেয়। বলে—আগামী ১৯শে অগাস্ট শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের তিরোভাব তিথি। সেদিন ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। ঘণ্টাখানেকের জন্য আপনাকে একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে। আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

এইরে সেরেছে! সভার ভূতকে আমি যেমন ভয় করি, তেমনি সে সর্বত্র আমাকে তাড়া করে ফেরে। সবিনয়ে বলি—আমাকে মাফ করতে হবে ভাই। সভার মানসিকতা নিয়ে আমি এবারে আসামে আসিনি। তাছাড়া শ্রীশঙ্করদেব সম্পর্কে আমার জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ যে তোমাদের আলোচনা সভায় যোগদান করা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না।

উৎপল আর অনুরোধ করার সুযোগ পায় না। কাজের লোকের সহায়তায় মিসেস বরুয়া চা ও জলখাবার নিয়ে এসেছেন। জলখাবার মানে লুচি, তরকারি ও দু-রকমের মিষ্টি। এর কমে অসমীয়াদের অতিথি সৎকার হয় না।

যথাসময় চা ও জলখাবারের সদ্ব্যবহার শেষ হয়। মিসেস বরুয়া এবারে নিশ্চিন্ত মনে আসরে বসেন।

আমি বলি—কবির বাড়িতে এসেছি। একটু কাব্যচর্চা না করে বিদায় নেওয়াটা অভদ্রতা হবে।

—বেশ, তাহলে একটা কবিতা শুনুন। বিনা প্রতিবাদে বীরেশ্বরবাবু বলেন।

—কোন্‌টা শোনাচ্ছেন? দিলীপবাবু জিজ্ঞেস করেন।

—'লিলির আবেলি'।

—তাই ভাল।

বীরেশ্বরবাবু বলেন—কবিতাটার অসমীয়া নাম 'লিলির আবেলি', বাংলা নাম 'লিলির বিকেল' আর ইংরেজি নাম 'Lily's Afternoon' ইংরেজি অনুবাদ আমি নিজেই করেছি। কিন্তু বাংলা অনুবাদ

করেছেন দেবীপ্রসাদ সিংহ। সুভাষদা মানে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, বেশ ভাল অনুবাদ হয়েছে। আমি বাংলা অনুবাদটিই আপনাদের শোনাচ্ছি—

'মুহূর্তের পরিচয়ের
অক্ষরগুলি
আঙুলের মাথায় গুনেছি।
আদরের কিছু কথা
অথবা
হাতে তুলে দেয়া এক কাপ কফি
সিস্‌মোগ্রাফের ডায়ালের বাইরে।
কর্মফল ? ভাগ্য ? এমনি হিসাবের
তুলাপাতে
আধার হাত বোলায়। কার সাধ্য
কাঠবিড়ালীর লেজ নাচানো ডালে পাতায়
স্বপ্নগুলো টুকে রাখতে।

নার্সারী রাইম
তারা শুনতে চায় না
তারই প্রমাণস্বরূপ তোমাকে
নিয়ে রেখেছে
উন্মাদাগারে। হায়, হায় উন্মাদিনী,
কি সাধ্য তোমার
প্রথম মধ্যাহ্নের আকাশের
মেঘগুলি
দুহাতে সরিয়ে দিতে।
তারা কৃত্রিম বিকেল সৃষ্টি করেছে
তোমার যৌবনের সমাধির,
সামিয়ানার জন্যে।'

॥ পাঁচ ॥

আজ পনেরোই অগাস্ট, স্বাধীনতা দিবস। হ্যাঁ, যে স্বাধীনতা ত্রিখণ্ডিত ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশ আজ ছেচল্লিশ বছর ধরে ভোগ করে আসছে, সেই স্বাধীনতার সূত্রপাত এমনি এক পনেরোই অগাস্টের উষালগ্নে। তাই আজকের দিনটি ভারতীয় য়ুনিয়নের স্বাধীনতা দিবস।

এবং বলা বাহুল্য সেই লটারি পাবার প্রাকমুহূর্তে সোজা সরল সাধারণ মানুষ একবারও কবিগুরুর কথা ভেবে দেখেনি যে—

'দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি,

ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে—'

তাহলে কি হবে?

আর আমি তাদেরই অন্যতম। তাই উনিশশ' সাতচল্লিশের স্বাধীনতা দিবসের উৎসব দেখতে আমি আগের দিন বরিশাল থেকে চলে এসেছিলাম কলকাতায়। অথচ তখন আমি নিতান্তই কিশোর, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

বরিশাল থেকে কলকাতা তখন জল ও রেল পথে ২১৩ মাইল, ভাড়া সাড়ে চার টাকা। তখনকার দিনে টাকাটা কিন্তু উপেক্ষা করবার মতো ছিল না। কারণ তখন একমণ সরু বালাম চাল তিন টাকা আর একজোড়া সেনগুপ্তের মিহি ধুতি সাড়ে তিন টাকা এবং একজন গ্রাজুয়েট সরকারি কর্মচারীর মাসিক বেতন তিরিশ টাকা।

তবু দাদুর কাছে কথাটা বলে ফেলেছিলাম। তিনি খুশি হয়ে বলেছিলেন - বেশ তো, ইচ্ছে যখন হয়েছে, যা না ঘুরে আয় একবার, দেখে আয় স্বাধীনতা উৎসব।

বরিশাল থেকে খুলনা আসার তখন দুখানি করে স্টিমার—খুলনা এক্সপ্রেস ও খুলনা মেল। বেশ বড় বড় স্টিমার। কয়লায় চলত। বাহারি নাম ছিল তাদের—গারো, নাগা, বেলুচি, ফ্লেমিঙ্গো ইত্যাদি।

দোতলা—নিচের তলায় অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ইঞ্জিন, সামনে পেছনে ও দু-পাশে সামান্য খানিকটা ফাঁকা জায়গা, কিন্তু খুব ভিড় না হলে যাত্রীরা সেখানে একটা ভিড় জমাতেন না, ওপরে অর্থাৎ দোতলায় উঠে যেতেন। দোতলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে খোলা 'ডেক'। সেখানে সতরঞ্চি বিছিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা সংসার পাততেন। আর বাকি জায়গাটুকুতে ছিল ফার্স্ট, সেকেণ্ড ও ইন্টার ক্লাশ কেবিন এবং 'বাটলার' অর্থাৎ রেস্তোরাঁ। গরম ভাত ও উপাদেয় মুরগীর মাংস পাওয়া যেত সেখানে। আমার হিমালয় পথের পথিকৃৎ ও ভোজনসুরসিক প্রবোধদা (সান্যাল) বলেছেন, অমন সুস্বাদু মুরগির মাংস তিনি বিলেতেও পাননি।

এক্সপ্রেস স্টিমারটি বরিশাল থেকে ছাড়ত সন্ধ্যায় আব 'মেল' শেষরাতে। এক্সপ্রেস খুলনা পৌছত পরদিন খুব সকালে, 'মেল' সন্ধ্যায়—তার কয়েকঘন্টা বেশি সময় লাগত।

আমিও এক্সপ্রেস স্টিমার ধরে পরদিন অর্থাৎ চোদ্দই অগাস্ট খুব সকালে খুলনা পৌছলাম। সেদিনটি ছিল পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু খুলনা জেলা হিন্দু অধ্যুষিত, সে জেলার পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হবার কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না। সুতরাং সেদিন খুলনা ছিল উৎসবহীন। আর আমাদের, বরিশালের মানুষদের কাছে, খুলনা তখন খুবই বড় ভরসা। পাকিস্তান হবার পরে যদি সত্যি সত্যি বরিশাল ছাড়তে হয়, তাহলে আমরা খুলনায় চলে আসব। নতুন করে ঘর বাঁধব।

সে ঘর আর বাঁধা হয়নি। কারণ মানুষ আশা করে, ভগবান বাদ সাধেন। না, ভগবান নয়, র‍্যাডক্লিফ।

আমাদের নেতারা সেদিন সেই স্বৈরাচারী বৃটিশ আমলাকে ভগবানের আসনে বসিয়েছিলেন। আর তারই ফলে লাল-বাল-পাল, মণিরাম দেওয়ান আর ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং মাষ্টারদা ও বাঘা-যতীনদের সকল ত্যাগ, দেশবন্ধু অরবিন্দ ও নেতাজীর সমস্ত সাধনা সেই পনেরোই অগাস্টের ব্রাহ্মমুহূর্তে ব্রহ্মপুত্র বরাক গঙ্গা পদ্মা ও

পঞ্চনদীর সলিলে সমাধিস্থ হয়েছে।

কিন্তু এসব সত্য সেদিন সেই স্বাধীনতার মোহমুগ্ধ কিশোরের জানা ছিল না। তাই কলকাতায় স্বাধীনতা উৎসবের শরিক হতে আমি সেই চোদ্দই অগাস্টের ব্রাহ্মমুহূর্তে খুলনা পৌঁছলাম। এবং সেদিন সকালের সেই খুলনা স্টেশনের স্মৃতি আজও আমার মনে অমলিন হয়ে রয়েছে।

স্টিমারে বেশ ভিড় হয়েছিল। তাই বলে আমার মতো স্বাধীনতা উৎসবের দর্শনার্থী বেশি ছিলেন না। অধিকাংশই শরণার্থী। অর্থাৎ তখুনি বাস্তুত্যাগ শুরু হয়ে গিয়েছে। সেইসব বাস্তুত্যাগীরা দু-শ্রেণীর। একদল যাঁদের কলকাতা কিম্বা কাছাকাছি কোথাও বাস্তু রয়েছে। তাঁরা নিরাপত্তার জন্য তাঁদের পরিবার, বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের রাখতে চলেছেন। আরেকদল যাঁদের পূর্ববঙ্গেও বাড়ি-ঘর নেই। তাঁদের কাছে দুই বাংলাই সমান। সুতরাং সরকারি সাহায্য পাবার আশায় আগে-ভাগেই ভারতের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। আর তখন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কাছে ভারত মানে কলকাতা। এঁদের সাহায্য করবার জন্য সেদিন সকালে খুলনা স্টেশনে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বহু ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী হাজির হয়েছিলেন। কেউ বাচ্চাদের দুধ দিচ্ছেন, কেউ বড়দের খাবার পরিবেশন করছেন, কয়েকজন ডাক্তার অসুস্থদের চিকিৎসা করছেন। দেখে একদিকে যেমন কষ্ট পাচ্ছিলাম, আরেকদিকে তেমনি আনন্দ হচ্ছিল। কষ্ট পাচ্ছিলাম এই দেখে যে এইসব আশা-আকাঙ্ক্ষাহীন হতভাগ্য মানুষ-গুলোর একমাত্র অপরাধ তাঁরা হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়েছেন। ধর্ম তাঁদের কিছুই দেয়নি, তবু ধর্মের নামে তাঁরা সেদিন সর্বহারা।

আর খুলনা শহরের সেই স্বেচ্ছাসেবী তরুণ-তরুণীদের দেখে কিন্তু বেদনাহত চিত্তেও আনন্দের শিহরণ বয়ে যাচ্ছিল। ভাবছিলাম, এঁরা এই নিঃস্বার্থ সেবার মধ্য দিয়ে ভাবীকালের স্বাধীনতাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। মনে মনে তাঁদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে আমি রেলের সওয়ার হয়েছি। অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছি। যদি সত্যি

সত্যি আমাদের কখনও বাস্তুত্যাগী হতে হয়, তাহলে তো খুলনা পৌঁছেই আশ্রয় পেয়ে যাবো।

খাল-বিল আর নদী-নালার জন্য বরিশাল জেলায় রেলগাড়ি ছিল না। কিন্তু খুলনায় আমি যে রেলগাড়ির সওয়ার হলাম, তার নাম বরিশাল এক্‌সপ্রেস। বরিশালের যাত্রী বহন করত বলে বৃটিশ রেলকম্পানি এই নাম রেখেছিলেন। খুলনা থেকে শেয়ালদার দূরত্ব ১০৪ মাইল। বরিশাল এক্‌সপ্রেস এই পথটুকু আসতে পাঁচ/ছ' ঘণ্টা সময় নিত। অর্থাৎ আগের সন্ধ্যায় বরিশালে স্টিমার ধরলে পরদিন দুপুরে আমরা শেয়ালদা পৌঁছে যেতাম। তখন এখনকার মতো এত লেট হবার রেওয়াজ ছিল না। অথচ সবই ছিল কয়লার ইঞ্জিন।

চোদ্দই অগাস্ট সকাল সাতটায় খুলনা থেকে আমার গাড়ি ছাড়ল। আগের দিন র‍্যাডক্লিফ্‌ বাটোয়ারা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরদিন সকালেও খুলনার মানুষ সে সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। কারণ তখনও খুলনায় খবরের কাগজ এসে পৌঁছয়নি।

বলা বাহুল্য আমার গাড়িতে কিছু খুলনার মানুষ ছিলেন। তাঁরা, আর কেবল তাঁদের কথাই বা বলি কেন, গাড়ির সব যাত্রীরই কেবল সেই একই প্রশ্ন—র‍্যাডক্লিফ শেষ পর্যন্ত কী করেছেন? বাংলার কোন্ অংশ পূর্ব-পাকিস্তান হচ্ছে, কোন্ অংশই বা ভারতীয় য়ুনিয়নের অংশীভূত থাকছে? সবাই উৎকণ্ঠিত, বিচলিতও বটে। কারণ সেই বৃটিশ আমলার কলমের খোঁচার ওপরে কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করছে।

নিরাশার চেয়ে আশার কথাই বেশি আলোচনা হয়। খুলনার মানুষরাই ভরসা দেন। বলেন—এমন হাল ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? কমিশনের সামনে মিস্টার পি. আর. ঠাকুর খুব জোরালো যুক্তির সঙ্গে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর দাবিকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারবেন না র‍্যাডক্লিফ। আপনাদের বরিশাল জেলারও একটা বড় অংশ আমাদের সঙ্গে ভারতীয় য়ুনিয়নে থেকে যাচ্ছে।

অবশেষে ঝিকরগাছা স্টেশনে পৌঁছে খবরের কাগজ পাওয়া গেল। কিন্তু সে পাওয়া যে সর্বস্ব হারানো। পি. আর. ঠাকুরের কোন যুক্তি মানা হয়নি। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর সংবাদ, হিন্দু অধ্যুষিত খুলনা জেলা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

সংবাদটি শোনা মাত্র খুলনাবাসী সহযাত্রীরা সোচ্চার স্বরে চিৎকার করে উঠলেন—খুইল্‌নে পাকিস্তানে যেতেই পারে না।

আমি কান পাতলে আজও তাঁদের সেই আর্তচিৎকার আর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। কিন্তু দেশের নেতারা শুনতে পাননি সে হাহাকার। পাবার কথাও নয়। তাঁরা যে তখন ক্ষমতা লাভের খোয়াবে বধির হয়ে গিয়েছেন। অতএব বিনা প্রতিবাদে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ বা দান মেনে নেওয়া হল পনেরোই অগাস্টের প্রভাত বেলায়। শুরু হয়ে গেল খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা উৎসব।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষদের কাছে তাই পনেরোই অগাস্ট শোকদিবস। কিন্তু সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন কিশোর নিজের ভবিষ্যতের কথা কিছুমাত্র না ভেবে খণ্ডিত দেশের স্বাধীনতা উৎসব দেখতে কলকাতায় ছুটে এলো।

চোদ্দই অগাস্ট দুপুরবেলা আমি শেয়ালদা পৌঁছলাম। শেয়ালদা থেকে তিন নম্বর দোতলা বাস ধরে হাজরা মোড়। সেখান থেকে ট্রামে করে টালিগঞ্জ, কাকার বাসায়। আগেই চিঠিতে জানিয়েছিলাম আসার কথা। আমাকে পেয়ে সবাই খুশি হলেন। তবে সবচেয়ে বেশি খুশি হল শিবু, আমার পিসতুতো ভাই। সে আমার চেয়ে বয়সে এক বছরের ছোট, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। কিছুক্ষণ বাদে প্রথম সুযোগেই সে আমাকে জানালো—আগামীকালের জন্য ট্রামের দুখানি অল-ডে টিকেটের ব্যবস্থা করে রেখেছি। কাল সকালে স্নান সেরে কিছু খেয়ে নিয়ে আমরা দুজনে সারা দিনের জন্য বেরিয়ে পড়ব। ট্রামের ড্রাইভারদের পাশে দাঁড়িয়ে গোটা কলকাতা ঘুরে বেড়াবো।

তাই বেরিয়েছিলাম। টালিগঞ্জ থেকে গ্যালিফ স্ট্রিট, রাজাবাজার থেকে শিবপুর এবং পার্ক সার্কাস থেকে খিদিরপুর ও বেহালা। শিবু

বলেছে, সে আগের বছর ১৬ই অগাস্ট অর্থাৎ মুসলিম লিগের সেই 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে'-র পরে রাজাবাজার খিদিরপুর ও পার্ক সার্কাসে এই প্রথম এলো। সেদিন কিন্তু ঐসব অঞ্চলে গিয়ে আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছি। সেখানে সেদিন শুধুই 'জয়হিন্দ' আর 'হিন্দু-মুসলমান—ভাই ভাই', ধ্বনি এবং আলিঙ্গন আর আলিঙ্গন। হিন্দু-মুসলমান শিখ-খ্রিস্টান বৌদ্ধ-জৈন, বাঙালি-অবাঙালি, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-অজ্ঞ—সবার সঙ্গে সবার আলিঙ্গন। কলকাতায় আসা সার্থক হল আমার। স্বাধীনতার প্রথম দিনটিতে আমি প্রথম একজাতি একপ্রাণ একতার উচ্ছল প্রকাশ দেখে পুলকিত হয়ে উঠলাম।

সারাদিন ট্রামে করে কলকাতা প্রদক্ষিণের পরে বিকেলের দিকে এসপ্লানেডে নেমে পড়লাম দুজনে। দেখলাম প্রায় শোভাযাত্রার মতো অগণিত দর্শনার্থী গভর্নর হাউসের দিকে ধেয়ে চলেছে। হাজার হাজার মানুষ, যেন বাঁধভাঙ্গা বন্যার জল। আমরাও তাদের শামিল হলাম। প্রবেশ করলাম গভর্নর হাউসে।

আগের দিন পর্যন্ত কলকাতাবাসী যে ছায়া-সুনিবিড় সুবিশাল অট্টালিকাটির দিকে তাকাতে ভয় পেত, এবং যে ভয় আজও দূর হয়নি, সেদিন সেই সাতচল্লিশে পনেরোই অগাস্ট আমরা কিন্তু নির্ভয়ে ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলাম। ঘুরে বেড়িয়েছিলাম তার এককক্ষ থেকে আরেক কক্ষে, একতলা থেকে আরেক তলায়।

বলা বাহুল্য সদ্য স্বাধীনতা লাভের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত দর্শনার্থীদের অনেকেই সংযম হারিয়ে ফেললেন। কেউ বাতি জ্বালালেন, কেউ ফ্যান ছেড়ে দিলেন। কেউ সুকোমল সোফায় বসলেন, কেউ কার্পেটের ওপরে গড়াগড়ি খেতে থাকলেন আবার কেউবা টেলিফোন তুলে কথা বলার চেষ্টা করলেন। কেউ বাগানে গিয়ে ফুল ছিঁড়লেন, কেউ বা ফল পাড়লেন। মালি থেকে পুলিশ, সবাই সেদিন আম-জনতার সেবক, অহিংসার মূর্ত প্রতীক। আর বুদ্ধিমানরা মনে মনে ভাবছেন দুশো বছরের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন হবার উচ্ছ্বাসে এমন ছোটখাটো ক্ষয়ক্ষতি তো হতেই পারে।

সন্ধ্যার কিছু পরে আমরা ক্লান্তদেহে ঘরে ফিরে চললাম। পথে-পথে আর বাড়িতে বাড়িতে তখন আলোকসজ্জা শুরু হয়ে গিয়েছে। অতীত সম্পর্কে অজ্ঞ ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে উদাসীন দুটি কিশোর সেদিন সেই আলোয় তাদের ছোট্ট মনদুটিকে আলোকিত করে দিগ্বিজয়ীর মতো ঘরে ফিরে এসেছিল।

সেই কিশোর আজ বার্ধক্যে উপনীত। স্বাধীনতার সুফলের চাইতে বেশি কুফল তাকে সইতে হয়েছে বিগত সাতচল্লিশ বছর ধরে। আজ সে বুঝতে পেরেছে বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুর কোনমতেই ভাল নয়, কারণ সে কুকুর কেবলি কামড়ে দেয়। তাই আজ পনেরোই অগাস্ট তার মনে আর কোন উচ্ছ্বাস জাগায় না, কোন আনন্দ বয়ে আনে না। বছরের অন্য তিনশ' চৌষট্টি দিনের মতই সে একটা সাধারণ দিনমাত্র। তবে তার স্মৃতির খাতায় সেই সাতচল্লিশের পনেরোই অগাস্টের রঙীন জলছবি আজও মুছে যায় নি। তাই প্রতি পনেরোই অগাস্ট সে সেই স্মৃতিচারণ করে আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, স্বপ্নভঙ্গ হবার দীর্ঘনিঃশ্বাস।

তাহলেও আজ, পনোরোই অগাস্ট, আমাদের এই গৌহাটির বাড়িতে কিন্তু সত্যি সত্যি একটা উৎসবের মেজাজ। না কোন জাতীয় পতাকা নয়, কোন আলোকসজ্জা নয়, কেবলি কিছু খাওয়া-দাওয়া, ডিনার।

এই বত্রিশ নম্বর ল্যাম্ব রোডের বাড়িতে আমরা চারটি পরিবার। নিচের তলায় একদিকে বাড়ির মালিক ধীরেন বরুয়া আরেকদিকে ভাড়াটে সামন্ত ফুকন। ধীরেনবাবুরা পাঁচজন। স্বামী-স্ত্রী দুটি ছেলে-মেয়ে ও মা। ধীরেনবাবু অবসর নিয়ে সমাজসেবায় জড়িয়ে পড়েছেন। তিনি গুয়াহাটী মিউনিসিপ্যাল ডেভলপমেণ্ট অথরিটি-র একজন সক্রিয় সদস্য। মিসেস নন্দা বরুয়া বাঙালি পরিবারের মেয়ে, অত্যন্ত কর্মঠা। শাশুড়ীর সেবা থেকে শুরু করে রান্না-বান্না পর্যন্ত সংসারের যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করে এল. আই. সি. এবং ইউনিট ট্রাস্টের এজেন্সি করেন। এবং ববি বলেছে, তিনি ওদের বেশ ভাল

ব্যবসা দিয়ে চলেছেন।

ধীরেনবাবুর ছেলে যুবক প্রাঞ্জল ব্যবসা করে এবং মেয়ে মিতালী একটা স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করছে। আগামী বছর তার বিয়ে। এবং ধীরেনবাবু বলে রেখেছেন, যেখানেই থাকি আমাদের নাকি বিয়েতে আসতেই হবে।

সামন্তবাবুরা চারজন, স্বামী-স্ত্রী ও দুটি ছেলে মেয়ে। ওরা দুজনেই ইঞ্জিনিয়ার। সামন্তবাবু ব্যবসা করেন। স্ত্রী বন্দিতা চাকরি আর সাহিত্যসেবা। ছেলেটি বম্বেতে জে. জে. স্কুল অব্ আর্কিটেকচারে পড়ছে আর মেয়ে মউ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে।

ওপরতলায় আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন মিস্টার ও মিসেস হরগোপাল। তাঁদের মেয়েরা বড়। দুজনের বিয়ে হয়ে গেছে, ছোটটি আমেরিকায় পড়াশুনা করছে। মিস্টার হরগোপাল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার এবং মিসেস হরগোপাল একটি নাচের স্কুল পরিচালনা করেন।

এই পনেরোজন বাসিন্দা আর তাদের কয়েকজন কাজের লোক নিয়ে আমাদের বত্রিশ নম্বর পরিবার। আজ পনেরোই অগাস্ট পনেরো জনের পক্ষে একটি বিশেষ দিন। তাই সকাল থেকে ববি ও অশোকের সঙ্গে সমানে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে আমাকে। একবার কেক-এর কারখানায়, একবার মিষ্টির দোকানে আর বার তিনেক বাজারে—উজান বাজার, ফ্যান্সি বাজার আর শিলপুখুরি বাজার। কারণ বিকেলে এ বাড়ির সবাই আমাদের ফ্ল্যাটে ডিনার করবে। আসবেন দিলীপবাবু, সুখময়বাবু এবং ববির দুজন সহকর্মী।

খেতে বলা হয়েছে কিন্তু কাউকে কারণটা বলা হয়নি। খুকু নিজেই নিষেধ করেছে। বললে যে সবাই উপহার নিয়ে আসবে। এই বয়সে ব্যাপারটা সত্যি লজ্জা পাবার মতো। আজ খুকুর জন্মদিন। হ্যাঁ, আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগে এমনি এক পনেরোই অগাস্ট আমার বড় ভাগনিটি ধরাধামে অবতীর্ণা হয়েছে।

পাশ্চাত্যের অনুকরণ হলেও জন্মদিন পালন ব্যাপারটা খারাপ

কিছু নয়। বরং আপনজনের কাছে খুবই আনন্দের। কিন্তু শৈশব অতিক্রান্ত হবার পরে জন্মদিনে কারও উপহার গ্রহণ সত্যিই লজ্জা পাবার মতো। তবু খুকু কিন্তু আমাদের উপহার নিতে কোন আপত্তি করেনি। অশোকের শাড়িখানি তো সন্ধ্যার সময় পরবে বলে ঠিক করেছে। ববি বুলা ও আমার উপহারও ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ওর দাবি ছিল, ব্যাপারটা আর কাউকে জানাতে পারব না। আমরা সে দাবি মেনে নিয়েছি।

তবে বাড়িতে এসে সবাই ব্যাপারটা বুঝে গেলেন। এবং প্রত্যেকেই না জানাবার জন্য অভিযোগ জানাতে থাকলেন। আমরা মৃদু হেসে তাঁদের সব অভিযোগ খণ্ডন করে ফেললাম।

কেক কাটা, মোম নেবানো, ছবি তোলা এবং সুর করে 'হ্যাপি বার্থ ডে টু য়ু' বলা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হল আর ভুরিভোজ দিয়ে শেষ হল। সকলেই রান্নার সুখ্যাতি করলেন। কারণ এ কাজটায় খুকু খুবই সিদ্ধহস্তা। তার ওপরে আজ সে বুলা ও অপর্ণার মতো দুজন সুযোগ্যা সহকারী পেয়েছে।

গান-গল্প হাসি-ঠাট্টা ও খাওয়া-দাওয়ার পরে আসর যখন ভাঙল, তখন রাত সাড়ে দশটা। দিলীপবাবু ও সুখময়বাবুর গাড়ি আছে। তাঁরাই ববির সহকর্মীদের বাড়ি পৌঁছে দেবেন। কারণ রাত দশটার পরে গৌহাটিতে বাস পাওয়া যায় না, অটো রিকশা অথবা সাইকেল রিকশা পাওয়াও মুশকিল। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, পথচারীও প্রায় থাকেন না বললেই চলে। চুরি-ছিনতাই অবশ্য খুবই কম, এদিকটায় তো একেবারেই নেই। তবু জনহীন পথে পথ চলতে গা শির শির করে।

দূরের অতিথিরা আগে বিদায় নিলেন। তারপরে একে একে বাড়ির অতিথিরাও নিজেদের ফ্ল্যাটে চলে গেলেন। এখন আবার আমরা ছ'জন। আবার আসামে এসে আমার আরেকটি আনন্দময় দিনের অবসান হল। স্বাধীনতার উৎসব ছাড়াই স্বাধীনতা দিবসটি উৎসব-মুখর হয়ে রইল।

পরদিন। সকালেই সুনন্দা এসে হাজির। অমরাবতী আসামের ছোট সুনন্দা। তখন সে জোড়হাটে অধ্যাপনা করত এবং আমি জানতাম না যে ও আমার বাল্যবন্ধু সৌরাংশু ঘোষের ভাইঝি।

এখন সে আর ঘোষ নেই। গণেশ দাস নামে জনৈক অসমীয়া অধ্যাপককে বিয়ে করে গৌহাটিতেই স্থায়ী হয়েছে। গতবছর গৌহাটি এসে অশোককে সঙ্গে নিয়ে আমি ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখা হয় নি। ওঁরা তখন কলকাতায় গিয়েছিলেন। ওর বাবা হিমাংশুদা এখন বৌদিকে নিয়ে কলকাতায় ছোট-ছেলের কাছে থাকেন।

গতবছর দেখা হয়নি বলেই বোধকরি খবর পেয়েই সুনন্দা ছুটে এসেছে। সে এখন এখানেই একটা কলেজে অধ্যাপনা করে। বলল —আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসব বলে আজ কলেজ ছুটি নিয়েছি।

হেসে বললাম—কোন দরকার ছিল না। পরে সুবিধেমত যে কোনদিন যে কোন সময়ে আসতে পারতে কারণ আমার নাতি অর্থাৎ এই বাড়ির তরুণ গৃহকর্তা নাকি এবারে আমাকে আড়াই মাস আসামে আটকে রাখবে।

—বেশ ভাল করবে। কলকাতায় তো জীবন কাটালেন। থাকুন না আসামে কিছুদিন, আমাদের মাঝে।

ওর কথা শুনে খুকুরা সবাই খুশি হয়ে ওঠে আর আমি নীরব থাকি। কলকাতার কি যে আকর্ষণ, তা যেমন আমি ওদের বলে বোঝাতে পারব না, তেমনি আসামের আকর্ষণও যে আমার কাছে কিছুমাত্র কম নয়, তাও এখন বলা সম্ভব নয়। কারণ বললেই ওরা সুবিধে পেয়ে যাবে। অতএব নীরব থাকাই নিরাপদ।

কিছুক্ষণ পরে সুনন্দার সঙ্গে নেমে এলাম পথে; ছাতা মেলতে হল। চড়া রোদ উঠেছে। অগাস্টের তৃতীয় সপ্তাহ। কলকাতার চেয়ে বৃষ্টি বেশি কিন্তু গরম কিম্বা ঘাম কিছুমাত্র কম নয়। রোদ ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির আমেজ মুছে যায়।

বড় রাস্তা অর্থাৎ জি. এন. বি. রোডে এসে একটা অটো রিকশা

নেওয়া গেল। খানিকটা পুবে এগিয়ে ডানদিকের বি. বরুয়া রোড ধরি। ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে রেল লাইন পার হয়ে আসি। বি. বরুয়া রোড ছোট রাস্তা, জি. এস. রোডে এসে শেষ হয়ে গেছে। সেখান থেকে শুরু হয়েছে বি. কে. কাকতি রোড। প্রকৃতপক্ষে একই রাস্তা, কিন্তু দুটি নাম। জি. এস. রোড মানে গৌহাটি-শিলং রোড দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত হয়ে দিসপুরের দিকে চলে গেল। আমরা এগিয়ে চললাম প্রায় সোজা দক্ষিণে বি. কে. কাকতি রোড ধরে উলুবাড়ির দিকে। এটি গৌহাটি শহরের দক্ষিণাঞ্চল। এদিকেই মেডিক্যাল কলেজ ও ফিল্ম স্টুডিও।

আমরা অবশ্য অতদূর এগোলাম না। তার আগেই বিজয়দার বাড়ির সামনে নেমে পড়লাম। গুরাহাটী হাইকোর্টের স্বনামধন্য অ্যাডভোকেট বিজয় দাস। প্রথমবার গৌহাটি এসে আমি এই বাড়িতে উঠেছিলাম।

বৌদি বাড়ি নেই, বিজয়দারও শরীর ভাল নয়, কিছুদিন আগেই কঠিন রোগে ভুগে উঠেছেন। তবু ড্রয়িং রুমে এসে গল্প জুড়ে দিলেন।

এবারে আমি অনেকদিন আসামে থাকব শুনে ভারি খুশি হলেন। কথায় কথায় বললেন—আপনি আসামের ওপর আরেকখানি বই লিখুন। ঠিক ভ্রমণকাহিনী নয়, উপন্যাস তো নয়ই। লিখুন আসামের মানুষদের কথা, আপনার পাঠক-পাঠিকা ও বন্ধু-বান্ধবদের কথা। আর সেই সঙ্গে আসামের সমাজ-জীবনে শ্রীশঙ্করদেব ও মাধবদেবের অবদানের কিছু কথা।

কেন লিখব? সহাস্যে তার কারণও বললেন—আপনি প্রথমবার আসামে এসে আসামের মানুষের ভালোবাসায় মোহিত হয়ে 'অমরাবতী আসাম' লিখেছেন। কিন্তু সেই বইখানি লেখার পরে আসমের মানুষ যে আপনাকে আরও বেশি ভালোবেসে ফেলল, আর তাই আপনাকে এমন বার বার আসামে ছুটে আসতে হচ্ছে, সেকথা নথিভুক্ত না করে গেলে যে আপনি নিজের প্রতি অন্যায় করবেন।

একবার থামেন বিজয়দা। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারার

আগেই তিনি আবার বলতে শুরু করেন—শ্রীশঙ্করদেব সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের ধারণা তিনি শুধুই একজন ধর্মপ্রচারক। তাও নতুন কোন ধর্ম নয়, বৈষ্ণবধর্ম, যে ধর্ম তাঁর অনেক আগের থেকেই ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাঁদের মতে শঙ্করদেবের একমাত্র কৃতিত্ব তিনি শাক্ত আসামে বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু এ ভাবে শঙ্করদেবের মূল্যায়ন করা উচিত নয়। ভারতের বহু ধর্মপ্রচারকের চেয়ে তাঁর অবদান অনেক বেশি মৌলিক।

—কী রকম? সুনন্দা প্রশ্ন করে।

বিজয়দা বলেন—শঙ্করদেবের ধর্মমতের প্রধান অবলম্বন প্রেম, বিশ্বাস ও সৎসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তি। এবং সেই ভক্তির মাধ্যমে একশরণ অর্থাৎ এক ঈশ্বরের শরণ নেওয়া। নামকীর্তন এই শরণের প্রধান উপায় এবং গীতা ও ভাগবৎ হচ্ছে প্রধান উপাস্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তিনি জনশিক্ষার মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রচারের প্রচলন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে কবি, লেখক, নাট্যকার, গীতিকার ও নির্দেশক। ছিলেন সুপণ্ডিত ও পর্যটক। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন আসামে তিনি সংস্কৃতভাষা ও সনাতন সংস্কৃতির ভগীরথ। অসমীয়া সমাজে আজও তাঁর প্রভাব অমলিন। আপনি শুনলে অবাক হবেন, আসামে পণপ্রথা নেই আর তার মূলেও শঙ্করদেবের সমাজ-সংস্কার। তিনি আসামের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক। অসমীয়া সাহিত্যেও শঙ্করদেবের স্থান অনেকটা হিন্দি সাহিত্যে তুলসীদাস গোস্বামীজির মতো। এককথায় আসামের ইতিহাসে শ্রীশঙ্করদেব অক্ষয় ও অব্যয়।

অথচ দুর্ভাগ্যের কথা আসামের বাইরে শঙ্করদেব আজও প্রায় অপরিচিত। এ সম্পর্কে আপনাকে একটা ঘটনা বলি। শ্রীশঙ্করদেবের স্মৃতিরক্ষার জন্য কয়েক বছর ধরে একটি বাৎসরিক স্মারক পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য একলক্ষ টাকা। একবার একজন প্রথিতযশা বাঙালি লেখক ও চিত্রকরকে সেই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হল। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি কলকাতা থেকে

গৌহাটি আসতে পারলেন না। উদ্যোক্তারা তখন নিজেরাই কলকাতায় গিয়ে তাঁকে সেই পুরস্কার প্রদান করলেন। পুরস্কারটি হাতে নিয়ে সেই শ্রদ্ধেয় প্রাপক জানতে চাইলেন, যাঁর নামে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, সেই শঙ্করদেব মানুষটি কে?

তাই আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি আসামের ওপরে আরেকখানি বই লিখে এই অপরিচয়ের ব্যবধান অন্তত খানিকটা কমিয়ে দিন।

বেলা হয়ে যাচ্ছে। তার ওপরে একবার সুনন্দাদের বাড়িতেও যেতে হবে। তাই আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজয়দার কাছ থেকে ছুটি নিলাম।

একটা রিকসা নিয়ে সুনন্দাদের বাড়িতে এলাম। পরিচয় হল অধ্যাপক গণেশের সঙ্গে। ধীর-স্থির ও ভদ্র অসমীয়া যুবক। ওদের ছেলে দুটিকে দেখেও ভাল লাগে। দুজনেই ছোট। একজনের বছর ছয়, আরেকজনের চার। ওদের বাপ অসমীয়া. মা বাঙালি: তবে ওরা বাংলা সামান্যই বুঝতে পারে। বাংলায় কিছু জিগেস করলে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওদের মা কিম্বা বাবা প্রশ্নটির অসমীয়া অনুবাদ করে দেয়। তখন ওরা অসমীয়াতে উত্তর দেয়। দেখে ভাল লাগল যে ধীরেনবাবুর সংসারের মতো সুনন্দার সংসারও সুখ ও শান্তির আলয়। আসাম আর বাংলার মিলনভূমি।

কিছুক্ষণ বাদে বিদায় নিলাম সুনন্দা ও তার ছেলেদের কাছ থেকে। গণেশ তার মারুতি গাড়িতে করে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে। গাড়ি ছুটে চলেছে গৌহাটির পথ ধরে।

না, আমি সুনন্দা কিম্বা তার ছেলেদের কথা ভাবছি না। ভাবছি বিজয়দার কথা। এখনও তাঁর কথাগুলো আমার মনের মাঝে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। আমি কি সত্যিই পারব এইসব সুমধুর স্মৃতিচারণ করতে? আমি কি পারব আসামের মানুষের সীমাহীন ভালোবাসার কথা বলতে? আমি কি পারব শ্রীশঙ্করদেবের সঙ্গে বাঙালির অপরিচয়ের ব্যবধান কিছুমাত্র কমিয়ে ফেলতে?

॥ ছয় ॥

অরূপ অফিসে চলে গিয়েছে। প্রতিদিনের মতো আমরা ওর সঙ্গেই ব্রেকফাস্ট সেরেছি। আজ বাজারের ফরমাস নেই। সুতরাং সামনের ঘরে টি. ভি. খুলে আমাদের আড্ডা চলেছে।

ডোর-বেল বেজে ওঠে। বুলা তাড়াতাড়ি টি. ভি. বন্ধ করে দেয়। অপর্ণা গিয়ে দরজা খোলে। ওকে কেউ আমার কথা জিজ্ঞেস করছেন, নারীকণ্ঠ।

উঠে আসি দরজার সামনে। সহাস্যে বলি—আরে আসুন, আসুন!

—কে শম্ভুমামু! খুকু বলে ওঠে।

—না, অপরিচিতা কেউ নয়। আমি কিছু বলতে পারার আগে তিনি নিজেই বলে ওঠেন।

ডাঃ (মিসেস্) ভট্টাচার্য ঘরে ঢোকেন। খুকু প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে—আরে দিদি এসেছেন! কবে এলেন কলকাতা থেকে?

—কাল রাতে, কামরূপ এক্সপ্রেসে। গাড়ি ছ' ঘণ্টা লেট ছিল। বাড়ি পৌঁছেই শুনলাম মহারাজ এখানে এসেছেন, দু-দিন ফোন করেছেন। তাই আজই মিশন থেকে ফেরার পথেই এখানে চলে এলাম।

মিসেস ভট্টাচার্যের একহাতে একটা বেশ বড় প্লাস্টিকের ক্যারি-ব্যাগ। সেটাকে সেন্টার টেবিলের ওপরে রেখে তাঁর দুই সঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। একজন তাঁর বান্ধবী, আরেকজন ডাক্তার পি. সি. বরদলৈ। তিনিও অবসর নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে চিকিৎসা করছেন।

অশোক আর বুলার সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিই।

ডাঃ বাণী ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার পরিচয় বহু বছরের। তিনিও

'অমরাবতী আসাম' পড়ে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তারপর থেকে আর সে যোগাযোগ হারিয়ে যায়নি। সেবারে সিরাজ সাহেবের সঙ্গে হোজাই যাবার পথে তাঁর কোয়ার্টার্সে মধ্যাহ্ন ভোজন সারতে হয়েছিল। তিনি ও তাঁর স্বামী দুজনেই রেলের ডাক্তার ছিলেন। চিফ মেডিক্যাল অফিসার পদে উন্নীত হবার পরে মিসেস ভট্টাচার্য বছর দেড়েক আগে অবসর গ্রহণ করেছেন।

ওঁদের একটি ছেলে। সে-ও ডাক্তার। এখন ইংলণ্ডে রয়েছে, এফ. আর. সি. এস. করছে। ওঁরা দমদমে বেশ ভাল বাড়ি করেছেন। কিন্তু জোড়হাটের মেয়ে বাণী ভট্টাচার্য এখনও আসামের মায়া ছাড়তে পারেননি। আর তাই তাঁর সঙ্গে ডাঃ ভট্টাচার্যকেও ঘরের ভাত খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হচ্ছে। এখনও মালিগাঁও তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা। ওঁদের এক ভাগ্নে রেলে চাকরি করেন। তাঁরই ছোট কোয়ার্টার্সে কোনরকমে মাথা গুজে রামকৃষ্ণ মিশন-সহ এখানকার কয়েকটি সেবাসংস্থায় নিয়মিত চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পরিচয়ের পালা শেষ হবার পরে খুকু হঠাৎ বলে ওঠে—এই রে! ভুল করে ফেললাম।

আমরা ওর মুখের দিকে তাকাই। মিসেস জিজ্ঞেস করেন—কী ভুল করলে?

খুকু গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়—আমি ভুলে আপনার সঙ্গে কথা বলে ফেলেছি।

—তা কথাবন্ধ করার কারণটা জানতে পারি কি?

—মামু আসাম থেকে চলে গেলেই আপনি আমাকে ভুলে যান।

—না, না। ভুলে যাবো কেন? তবে সত্যি আজ অনেকদিন বাদে তোমার বাড়িতে আসা হল।

—অনেকদিন! প্রায় এক বছর বলুন। গতবছর মামু চলে যাবার পরে, এই এলেন।

—অন্যায় হয়ে গিয়েছে। এবারে মহারাজ চলে যাবার পরেও, নিশ্চয়ই আসব। তুমি দেখে নিও।

খুকু খুশি হয়। বলে—আপনারা কথা বলুন। আমি আসছি।

—না। মিসেস বাধা দেন। ধমক দেবার স্বরে বলেন—ঠিক এই জন্যই তোমার কাছে আসতে চাই না। এলেই তুমি আমাদের বসিয়ে রেখে খাবারের আয়োজনে লেগে যাও।

—আয়োজন আবার কী? খুকু বলে—হাসপাতাল থেকে এসেছেন। বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া ওঁরা তো আমার বাড়িতে আজ প্রথম এলেন।

এবারে ডাক্তার বরদলৈ আপত্তি করেন—আমরা তো বাড়ি গিয়েই লাঞ্চ্ করব।

—তা হয় না দাদা। আপনারা কিছু মুখে না দিলে, আমার ছেলেটার বিয়ে হবে না।

ওর কথা শুনে সবাই হেসে ওঠে।

বুলা কম কথা বলে। এতক্ষণ সে প্রায় চুপ করেই বসেছিল। এবারে উঠে দাঁড়ায়। খুকুকে বলে—তুই বরং কথা বল। আমি অপর্ণাকে সাহায্য করছি।

সে ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কিন্তু চলতে পারে না। মিসেস ভট্টাচার্যের বোধকরি হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যায়। তিনি বলে ওঠেন—যাবার আগে এই জিনিসত্বটো দেখে যাও। অনেক দেখে-শুনে নিয়ে এলাম। দেখ তো কেমন হল?

তিনি হাতে করে বয়ে আনা প্যাকেট ত্বটো খুলে ফেলেন। একটাতে একখানি লাইসিঙপু আরেকটাতে একখানি মেয়েদের নাগাশাল।

—ভারি সুন্দর তো। বুলার সঙ্গে আমরাও গলা মেলাই।

ওরা তু-বোন জিনিসত্বটো হাতে নিয়ে দেখতে থাকে।

মিসেস জিজ্ঞেস করেন—পছন্দ হয়েছে?

—নিশ্চয়ই। ওরা তুজনেই বলে ওঠে।

মিসেস মৃত্থ হাসেন একটু। তারপরে বলেন—তোমাদের মামা ও মামীর জন্য নিয়ে এলাম।

—তাই নাকি। এবারে অশোক গলা মেলায় খুকু ও বুলার সঙ্গে। মামা ও মামীর প্রাপ্তিতে ভাগ্নে ও ভাগ্নিরা পুলকিত। কিন্তু মামার পক্ষে নীরব থাকা ছাড়া আর উপায় কী?

খুকু আমাকে নীরব থাকতে দিতে চায় না। সে বলে ওঠে—এ জন্যই তো বলি, আসামে এসেছো, কেবল যাই-যাই করো না। কাল রাতে দিদি গৌহাটি এসেছেন, আর আজ সকালেই তোমার ও মামীর জন্য লাইসিঙপু আর নাগাশাল নিয়ে হাজির হয়েছেন। এই ভালোবাসা আসাম ছাড়া আর কোথাও পেয়েছো?

—না। সহাস্যে বলি—আর তাইতো এমন বার বার আসামে ছুটে আসি। কিন্তু···। একবার থেমে আমি ডাঃ ভট্টাচার্যের দিকে তাকাই। তারপরে বলি—কিন্তু এ ছুটো জিনিসই যে একাধিকবার আসামের মানুষ আমাকে উপহার দিয়েছেন।

—তাতে তো আমার দেওয়া হয়নি। তাছাড়া অনেকদিন ধরেই এ ছুটো জিনিস আপনাকে আমার দেবার ইচ্ছে। এখন বলুন, পছন্দ হয়েছে কি না?

—হয়েছে বৈকি! ভারি সুন্দর জিনিসছুটো।

—তাহলে গ্রহণ করুন।

আমি ছু-হাত পাতি। মিসেস ভট্টাচার্য জিনিসছুটো আমার হাতে তুলে দেন। সবাই হাততালি দিয়ে ওঠে।

হাততালির শব্দ শুনে অপর্ণা এ ঘরে এসে দাঁড়ায়। আমি জিনিসছুটো তার হাতে দিয়ে বলি—আমার ঘরে নিয়ে রেখে দে।

—তোমাকে দিলেন বুঝি? হাতে নিয়ে অপর্ণা জিজ্ঞেস করে।

আমি মাথা নাড়ি। অপর্ণা জিনিসছুটো নিয়ে ভেতরে চলে যায়। যাবার সময় বলে—দাছু, তুমি না খুব 'লাকি' আছো।

ওর মন্তব্য শুনে সবাই হেসে ওঠে। অপর্ণা মাঝে মাঝেই এমনি ইংরেজি বলে।

খুকু শেষ পর্যন্ত ওঁদের চা ও ভরপেট জলখাবার খাইয়ে ছাড়ল। মিসেস ভট্টাচার্য রোগা মানুষ, স্বল্পাহারী। কিন্তু খুকুর কাছে

রেহাই নেই।

ওঁদের খাওয়া হলে সবাই আবার সামনের ঘরে এসে বসি। কথায় কথায় মিসেস ভট্টাচার্য বুলাকে বলেন—তোমরা যখন এতবছর দুর্গাপুরে ছিলে, আশাকরি আমার ছোটভাইকে চেনো।

—কে, বলুন তো?

—ডাক্তার এ. কে. ঘোষাল।

—তাই নাকি! উনি তো এখন দুর্গাপুর স্টিলের চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার। আমাদের খুবই পরিচিত।

—এবারে আমি তো ওর কাছেই বেশিদিন ছিলাম।

—দিদি, আপনি আবার কবে আমাদের এখানে আসছেন?

—আগামী সপ্তাহে একদিন আসব'খন।

—তা আসুন। কিন্তু তারপরে আবার আগামী মাসের সাত-আট তারিখে আপনাকে একদিন একটু সময় হাতে নিয়ে আসতে হবে আমার কাছে। সেদিন দুপুরে এখানেই খাবেন আপনি।

—কেন বলো দেখি?'

—আপনাকে নিয়ে আমি একবার বাজারে যাবো।

—কী কিনবে?

—আপনি মামুর জন্য যেমন লাইসিঙপু আর শাল এনেছেন। সেই সঙ্গে মেখলা পেতলের বটা বা সরাই, বাঁশ ও বেতের কিছু জিনিস। মানে এবার পুজোয় আমি আত্মীয়-স্বজনদের আসামের নিজস্ব জিনিস উপহার দিতে চাই।

—খুব ভাল প্রস্তাব। কিন্তু তোমাদের তো কলকাতা যেতে দেরি আছে।

—হ্যাঁ। আমরা অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে যাচ্ছি।

—তাহলে আগামী মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের সাত-আট তারিখে কেনা-কাটা করতে চাইছ কেন, মাসের শেষদিকে করো।

—বেশ। আপনার বোধহয় সাত-আট তারিখে কোন অসুবিধে আছে?

—হ্যাঁ। আমি সাত তারিখে কলকাতায় যাচ্ছি, একুশ তারিখে ফিরব।

—গতকাল তো সবে কলকাতা থেকে ফিরলেন।

—হ্যাঁ। তাহলেও যেতে হবে। এবারে যাচ্ছি স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ উৎসবে যোগ দিতে। আমাদের এখানেও সারদা মিশনের একটা শাখা আছে। তারই তরফ থেকে আমরা কয়েকজন 'পার্লামেণ্ট অব্ রিলিজিয়নস'-এ যোগ দিতে যাচ্ছি।

—ডাক্তার ভট্টাচার্য যাচ্ছেন কি?

—না, না। ও যাবে কেমন করে! আমরা তো সারদা মিশনের ডেলিগেট হয়ে যাচ্ছি। ওর সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য হচ্ছে আর কি। মিসেস মৃদু হাসেন।

—দমদমের বাড়িতেই তো উঠবেন?

—না, না। এবারে বাড়ি যাবার সময়ই হবে না। আমরা নিউ মার্কেটের কাছে ডেলিগেট ক্যাম্পে থাকব।

—কদিন ধরে এই উৎসব চলবে?

—ন' দিন, ১১ থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর, তার মধ্যে চারদিন বসবে 'পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নস' নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে—১১, ১২, ১৮ ও ১৯ তারিখে। পনেরো হাজার শ্রোতার বসবার ব্যবস্থা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধর্মের শতাধিক সুপণ্ডিত বক্তা এই অধিবেশনে যোগদান করবেন।

—১৮৯৩ সালে শিকাগোতেও তো ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখেই পার্লামেণ্ট্ অব্ রিলিজিয়নস্ শুরু হয়েছিল? অশোক জিজ্ঞেস করে।

মিসেস ভট্টাচার্য মাথা নেড়ে বলেন—হ্যাঁ। ঠিক এক শ' বছর আগে যে দিনে শিকাগো মহানগরীর কলম্বিয়া হলে অধিবেশন শুরু হয়েছিল, এক শ' বছর পরে সেই একই দিনে কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে এই অধিবেশন শুরু হবে হাজার পনেরো ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতিতে।

—নামকরা কে কে আসছেন আশা করেছেন?

মিসেস ভট্টাচার্য তাঁর হাতব্যাগ খুলে একখানি ফোলিও বের করে দেখে দেখে বলে যেতে থাকেন—আসছেন আমাদের রাষ্ট্রপতি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী। উপস্থিত থাকবেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক সহ বহু পূজনীয় সন্ন্যাসী, জরথুস্ট্র, মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন শিখ ও ইহুদি প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। আসবেন ও বক্তব্য রাখবেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এবং ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ।

—কোন্ কোন্ দেশ থেকে বক্তারা আসছেন?

—অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, চিন, জাপান, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, রুমানিয়া, রাশিয়া, ইজরাইল ও জেরুজালেম, ফিনল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র-সহ আরও কয়েকটি দেশ থেকে।

—যাচ্ছেন যান। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আপনাদের নিরাপদ ভ্রমণ ও আনন্দময় শ্রবণ প্রার্থনা করছি। তবে ফিরে এসে কিন্তু সব বলতে হবে। খুকু শর্ত আরোপ করে।

—বেশ। সাধ্যমত বলার চেষ্টা করব। কিন্তু ভাই, এবারে উঠব। তোমাদের স্নান-খাওয়া হয়নি, অনেক দেরি করে দিলাম। আমাকেও আজ গ্রামে চিকিৎসা করতে বেরুতে হবে।

মিসেস ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীরাও উঠে দাঁড়ান। ওঁরা দরজার দিকে এগিয়ে চলেন। হঠাৎ থেমে যান মিসেস। হাতব্যাগ খুলে একখানি পুস্তিকা বের করে খুকুর হাতে দিয়ে বলেন—এই দেখো, গৌহাটি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতার অসমীয়া অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। অনুবাদ করেছেন ড. সরযূ দাস।

খুকু খুশি হয়। ওঁরা নিচে নেমে যান। আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। ওঁরা গাড়িতে ওঠেন। গাড়ি এগিয়ে চলে।

খুকুর হাত থেকে পুস্তিকাখানি নিয়ে ঘরে এসে বসি। ভাবতে থাকি ডাক্তার বাণী ভট্টাচার্যের কথা: বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের

বউ, বড় চাকরি করতেন। গাড়ি বাড়ি সবই আছে। সুখী মানুষ। অথচ স্বামীজির সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ষাট বছর বয়সে কি পরিশ্রমই না করে চলেছেন। গতকাল রাতে কলকাতা থেকে ফিরেছেন। আবার আগামী মাসে কলকাতা যাচ্ছেন। রেলের পাশ পান। এ. সি. ক্লাসেই যাতায়াত করেন। তবু যাতায়াত খুব একটা সহজ নয়।

গিয়ে অবশ্য ভালই করবেন। নিজে যেমন স্বামীজিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার সুযোগ পাবেন, তেমনি বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী ও সুপণ্ডিতদের শ্রদ্ধাঞ্জলির শরিক হতে পারবেন। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে?

আমার সেই মহতী মহাসম্মেলনে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হল না। কিন্তু স্বামীজির সেই শাশ্বত বক্তৃতাটি পাঠ করায় কোন বাধা নেই।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশ' বছর পূর্তি উপলক্ষে শিকাগো মহানগরীর কলাম্বিয়া হলে ১৮৯৩ সালে আয়োজিত হয়েছিল সেই ধর্ম মহাসম্মেলন—Parliament Of Religions.

১১ই সেপ্টেম্বর অধিবেশনের প্রথম দিনে সভাপতি কার্ডিন্যাল গিবসন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে স্বামীজির পরিচয় করিয়ে দেন। শ্রোতারা হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। অভিনন্দনের উত্তরে সুদর্শন তরুণ সন্ন্যাসী সুললিত স্বরে বলতে শুরু করলেন—

'আমেরিকার ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ। আজ আপনারা আমাদের যে সাদর ও আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন, তার উত্তর দিতে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী-সমাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বধর্মের প্রসূতি স্বরূপ সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে এবং সারা বিশ্বের হিন্দু নর-নারীর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অতি-দূর দেশের জাতিসমূহের মধ্যে যাঁরা এখানে সমবেত

হয়েছেন, তাঁরাও বিভিন্ন দেশে পরধর্মসহিষ্ণুতার ভাব প্রচারের গৌরব দাবী করতে পারেন। তাঁদের এবং এই সভামঞ্চে উপস্থিত যেসব বক্তা প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের প্রশংসা করলেন, তাঁদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সব মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্য করি না, সব ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। ইংরেজি 'এক্সক্লুশন' শব্দটির প্রয়োগ করে, যে ধর্মকে কখনই হেয় করা যায় না, আমি সেই ধর্মাশ্রিত। যে জাতি পৃথিবীর সব ধর্মের ও সব জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে এসেছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গৌরব বোধ করি। যে বছর রোমানদের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে ইহুদিদের পবিত্র মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত হয়, সে বছরেই তাঁদের অবশিষ্ট অংশ দক্ষিণ ভারতে আশ্রয়লাভের জন্য ছুটে এসেছিলেন। আমরা আজও তাঁদের বংশধরগণকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছি। এবং একথা বলতে আমি গৌরব বোধ করছি, যে ধর্ম জরথুস্ত্রের অনুগামী মহান পারসিক জাতির অবশিষ্টাংশকে আশ্রয় দান করেছিল এবং যাঁদের বংশধরগণকে আজও সসম্মানে প্রতিপালন করে চলেছে, আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।

যে পবিত্র স্তোত্রটি প্রতিদিন ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় এবং আমি অতি বাল্যকাল হতে যেটি আবৃত্তি করে আসছি, তার দুটি পঙক্তি হল—

'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥'

উৎস ভিন্ন হলেও যেমন একই সাগর সব নদীর সঙ্গমস্থল, তেমনি হে ভগবান! আপন আপন রুচির বৈচিত্র্যবশত যারা সরল ও কুটিল নানা পথে পথ চলেছে, তুমিই তাদের সবার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

পৃথিবীতে এযাবৎ অনুষ্ঠিত সম্মেলনসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মহাসম্মেলন, এই ধর্ম-মহাসভা গীতায় প্রচারিত সেই অপূর্ব মতেরই সত্যতা প্রতিপন্ন করছে, সেই বাণীই ঘোষণা করছে—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥'

যিনি যে মত আশ্রয় করেই আসুন না কেন, আমি তাঁকে সেভাবেই গ্রহণ করি। হে অর্জুন, সব মানুষ সর্বতোভাবে আমার নির্দিষ্ট পথেই পথ চলেন।

বহুকাল ধরে সুন্দর এই পৃথিবীকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এগুলি পৃথিবীকে বার বার হিংসায় পূর্ণ করে নরশোণিতে সিক্ত করেছে। সভ্যতাকে বিধ্বস্ত করে সমস্ত মানবজাতিকে হতাশায় মগ্ন করেছে। এইসব ভীষণ পিশাচগুলি যদি না জন্মাতো, তাহলে মানবসমাজ আজ অনেক বেশি উন্নত হয়ে উঠতে পারত।

তবে আমি বলছি, সেই নরপিশাচদের অন্তিম সময় সমাগত। এবং আমি আশা করি, এই ধর্ম-মহাসমিতির সম্মানে আজ এখানে যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হয়েছে, তা সর্বপ্রকার ধর্মোন্মত্ততা, তরোয়াল ও কলমের সকল নির্যাতন নিরসনের বার্তা বহন করছে। এবং এই ঘণ্টাধ্বনি ধর্মীয় মহামিলনের লক্ষ্যে অগ্রসরমান মানুষদের মাঝে অনৈক্যের অবসান বার্তাও ঘোষণা করছে।'

স্বামী বিবেকানন্দ কালজয়ী সিদ্ধপুরুষ। একশ' বছর আগে বলে যাওয়া তাঁর কথামালা আজও বেদবাক্যের মতই অভ্রান্ত। কিন্তু আমরা অনুপযুক্ত। তাই তাঁর সেদিনের সে আশা পূর্ণ করতে পারিনি। বিগত শতকেও বিশ্বের দেশে দেশে অসংখ্য নরপিশাচ জন্ম নিয়েছে। সুতরাং ১৮৯৩ সালের সেই ঘণ্টাধ্বনি ধর্মোন্মত্ততার অবসান ঘোষণা করতে পারেনি। সবচেয়ে দুঃখের কথা বিবেকানন্দের ধ্যানের ভারতবর্ষ আজ ধর্মের নামে ত্রিখণ্ডিত। আর এ পরিণতি কেবল আমাদের দেশের নয়, আরও বহু দেশের পক্ষেই সমান সত্য। বিগত একশ'

বছরে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবার পরেও পৃথিবীতে সেই নরপিশাচদের তাণ্ডব বেড়েই চলেছে।

তাই স্বামীজির সেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের অবিস্মরণীয় আবাহনকে স্মরণ করে ঠিক একশ' বছর পরে আবার আয়োজিত হচ্ছে আরেক 'পার্লামেণ্ট্‌ অব্‌ রিলিজিয়নস'। উদ্যোক্তারা তাঁদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

'The lapse of a century (1893-1993) since Swamiji's appearance at Chicago is enough time to take stock of Swamiji's relevance at the present hour : how far had his fervent hope that the bell that had tolled on the morning of 11 September 1893 in the Columbia Hall in honour of the convention materialized as the death-knell of all fanaticism and persecution with the sword or with the pen ?'

আশা করা যাক এ সমীক্ষা সার্থক হবে। একশ' বছর পরে অন্তত আমরা স্বামীজির সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীকে বিবেকানন্দের সৌভ্রাতৃত্বময় বিশ্বে উন্নীত করে তুলতে পারব।

॥ সাত ॥

আজ ১৯শে অগাস্ট। শ্রীশঙ্করদেবের তিরোভাব তিথি। উৎপলা আজই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

আজ আসামে সাধারণ ছুটির দিন। আমি বেকার, অশোক বেড়াতে এসেছে, খুকু ও বুলা অফিস করে না। সুতরাং আমাদের কাছে ছুটির দিনের কোন বিশেষ সমাদর নেই। তবু আজ আমাদের বাড়িতে ছুটির আমেজ। কারণ অরূপের অফিস নেই।

সরকারি হিসেবে ওদের দপ্তরের পাঁচ দিনে সপ্তাহ অর্থাৎ শনি ও রবিবার ছুটি। কিন্তু অরূপ ছুটি খুব কমই ভোগ করতে পারে। হয় জমে থাকা কাজ শেষ করতে ছুটির দিনেও অফিসে হাজিরা দেয়, নয়তো অফিসের কাজে শুক্রবার রাতের বাস ধরে চলে যায় তিনসুকিয়া অথবা ডিব্রুগড়, জোড়হাট কিম্বা শিবসাগর, লামডিং অথবা উত্তর কাছাড়, নগাঁও কিম্বা তেজপুর ইত্যাদি কোন জায়গায়।

ওর চাকরিটা ভাল। কিন্তু বড় খাটতে হয় ছেলেটাকে। ওর জন্য সত্যই বড্ড মায়া হয়। ভাবতে খারাপ লাগে এই বয়সে এত পরিশ্রম করে সংসার চালাচ্ছে আর আমরা ঘরে বসে অন্ন ধ্বংস করে চলেছি। কিন্তু আমি কীই বা করতে পারি? ও যে নিজেই আমাকে কলকাতায় ফিরতে দেয় না।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। শ্রীশঙ্করদেবের তিরোভাব তিথি বলে আজ আসামে সাধারণ ছুটি। এবং অরূপ আজ অফিসে যাবে না। অতএব আজ আমাদের ফ্ল্যাটেও ছুটির আমেজ।

তাই সকাল থেকে 'স্টিরিও' বাজছে। এখন জগজিৎ সিং-এর গান চলেছে, 'ম্যাঁয় নশো মে হুঁ....' অরূপ গান বড় ভালোবাসে। আর এ গানখানি আমাদের সবারই ভাল লাগে।

ডোর-বেল বেজে ওঠে।

অপর্ণা দরজা খুলে দেয়। মিতালী ঘরে ঢোকে। খুকু জিগেস করে—কিরে, খবর কী?

—খবর একটা আছে, ভাল খবর।

—কী?

—টি. ভি. খোল। শ্রীশঙ্করদেবের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে একটু বাদে একটা নাটক হবে। বাবা ও দাদা সেই নাটকে অভিনয় করেছে।

—তাই নাকি। আমরা একসঙ্গে বলে উঠি।

—মিতালী মাথা নাড়ে। তারপরে বলে—একটা কাজ করো না…

আমরা ওর দিকে তাকাই।

—তোমরাও আমাদের ড্রয়িংরুমে চলে আসো না। সবাই একসঙ্গে বসে নাটকটা দেখা যাবে।

—প্রস্তাবটা মন্দ নয়। খুকু বলে—তোদের বড় রঙীন টি. ভি. তাছাড়া দু-দুজন অভিনেতার পাশে বসে তাদের নাটক দেখা খুবই আনন্দের হবে। কিন্তু…

—কী? মিতালী। জিজ্ঞেস করে।

খুকু উত্তর দেয়—আমরা তোদের ঘরে গেলে যে তোর মা নাটক না দেখে আমাদের জন্য চায়ের হাঙ্গামায় লেগে যাবে।

মিতালী একটু চুপ করে থাকে। তারপরে বলে—বেশ। মাকে গিয়ে বলছি, নাটকের মাঝে চায়ের হাঙ্গামা করবে না। তবে তোমরা কিন্তু চা না-খেয়ে আসতে পারবে না, তা আগেই বলে রাখলাম।

—বলার কোন দরকারও ছিল না। অশোক বলে ওঠে—এক-সঙ্গে বাপ-বেটা টেলিভিশান নাটক করেছে। সেই নাটক দেখে অভিনেতাদের ঘর থেকে চা না-খেয়ে চলে আসব। তাও কি কখনো হয়? তুমি ঘরে যাও, আমরা আসছি।

—থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কল।

মিতালী চলে যায়। কয়েকমিনিট বাদে আমরাও নিচে নেমে

আসি। ধীরেনবাবু দরজা খুলেই রেখেছিলেন। আমরা আসতেই বলে উঠলেন—আসুন, আসুন!

মিতালী প্রাঞ্জল মিসেস বরুয়া এবং ধীরেনবাবুর মা, সবাই রয়েছেন। আমরাও তাঁদের পাশে বসে পড়ি। কিছুক্ষণ বাদে নাটক শুরু হয়ে যায়।

নাটকটি বেশ বড়। প্রায় ঘণ্টাদেড়েক লাগল। অসমীয়া গ্রামীণ সমাজে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও যুবক-যুবতীদের ওপরে শ্রীশঙ্করদেবের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রভাব নিয়ে নাটক। আমার পক্ষে পাত্র-পাত্রীদের সবার সব কথা অনুসরণ করা সম্ভব হল না। তবে বিষয়বস্তু বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না।

নাটক দেখতে দেখতে অবাক হয়ে ভাবছিলাম মহাপুরুষ শঙ্করদেবের কথা। আজ থেকে পাঁচ শ' বছর আগে তিনি জনশিক্ষার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে শাক্ত আসামে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। আরও বিস্ময়ের কথা তাঁর প্রচারের প্রধান মাধ্যমে যেমন ছিল স্বরচিত 'কীর্তন-ঘোষা' তেমনি তাঁর জনশিক্ষার প্রধান বাহন ছিল 'অঙ্কীয়া-নাট' বা একাঙ্ক নাটক। আজ থেকে মাত্র শ'খানেক বছর আগেও কলকাতার শিক্ষিত সমাজ যে নাটককে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, সেই নাটককে পাঁচ শ' বছর আগে আসামের গ্রামীণ সমাজে তিনি জনশিক্ষার প্রধান বাহন রূপে ব্যবহার করেছিলেন।

নাটকটি ভালই লাগে। ধীরেনবাবু ও প্রাঞ্জলের অভিনয় বেশ ভাল হয়েছে। অতএব নাটকের পরে চায়ের আসরও জমে উঠল। এবং চা শেষ হবার পরেও আসর ভাঙল না। কেবল থুকু বুলা অপর্ণা ও মিসেস বরুয়া চলে গেলেন। আমরা বসে বসে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের মহাজীবনের কথা নিয়ে আলোচনা করতে থাকি।

মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন নগাঁও জেলার বটদ্রবা তথা বরদোয়া গ্রামে। তাঁর জন্ম ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ অহোমযুগে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বরভুঁইয়া। অর্থাৎ এক শাক্ত কায়স্থ

জমিদার পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন শ্রীশঙ্করদেব।

বারো বছর বয়সে মহেন্দ্র কন্দলি নামে জনৈক প্রখ্যাত পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। মেধাবী বালক অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ, শাস্ত্র, কাব্য ও দর্শন অধ্যয়ন করতে থাকলেন। এবং কয়েক বছরের মধ্যেই সর্ববিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করলেন।

শিক্ষা শেষে গুরুগৃহ থেকে বাড়ি ফিরে এলেন। জমিদারের ছেলে। সুতরাং তিনি জমিদারির কাজ দেখাশোনা শুরু করলেন। তাঁর বিয়ে দেওয়া হল। সুখে সংসারধর্ম পালন করতে থাকলেন।

কিন্তু মানুষকে সুখী করার জন্য ভগবান যাঁকে সংসারে পাঠান, জীবনদেবতা তো তাঁর আত্মসুখ সইতে পারেন না। সুতরাং গৌতম-বুদ্ধ থেকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত যা সত্য হয়েছে, তা শঙ্করের জীবনেও সত্য হয়ে দেখা দিল। একটি কন্যাসন্তানকে জন্মদানের পরে তাঁর যুবতী স্ত্রী অকালে অমরলোকে মহাপ্রস্থান করলেন। শঙ্করের বয়স তখন মাত্র বছর তিরিশ।

স্বাভাবিকভাবেই পত্নীবিয়োগে ব্যাকুল শঙ্কর সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে উঠলেন। আট বছরের কন্যার বিয়ে দিয়ে জামাতা হরির কাছে রেখে পথে বেরিয়ে পড়লেন। তখন তাঁর বয়স বত্রিশ বছর।

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে। শঙ্কর পথ চলেন। অস্নাত দেহে ও অভুক্ত শরীরে, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে ক্লান্ত চরণে ভারত-পথিক এগিয়ে চলেন। অবশেষে একদিন দূর থেকে দেখতে পেলেন সাগর-মেখলা পুরীধাম। দেখতে পেলেন জগন্নাথ মন্দিরের চূড়া। শারীরিক অবস্থা বিস্মৃত হয়ে ভক্ত-শঙ্কর ছুটতে থাকলেন, প্রেমিক-শঙ্কর পুরীধামে পৌঁছলেন, তপস্বী-শঙ্কর জগৎপতি-জগন্নাথের শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়লেন।

তারপরে ধ্যানে বসলেন। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে জগদীশ্বর জগন্নাথের কাছে জগতের মঙ্গল-কামনা। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। চেতন ও অবচেতন মনে শুধু একই প্রার্থনা—প্রভু। তুমি আমাকে আলো দেখাও, আমি যেন সেই আলোতে মানুষের

মনের অন্ধকার দূর করে দিতে পারি।

ভক্তবৎসল জগন্নাথ শঙ্করের হৃদয়কে আলোময় করে তুললেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন।

কৃতজ্ঞ শঙ্কর বিনম্র চিত্তে তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে প্রণাম করে প্রতিজ্ঞা করলেন—প্রভু! আমি জীবনে আর কোন দেবতার সামনে মাথা নত করব না। আজ থেকে আমার শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে কেবল তুমি, তুমিই আমার জীবনের একমাত্র ইষ্টদেবতা।

শাক্ত-শঙ্কর বৈষ্ণব হলেন। কিন্তু পুরীধামে তাঁর তীর্থপথ ফুরিয়ে গেল না। তিনি যে ভারতপথিক, গৌতম-বুদ্ধ, পার্শ্বনাথ আর আচার্য শঙ্করের উত্তরসূরী।

কেরালার কিশোর যেমন জ্যোতির্মঠে সিদ্ধিলাভ করার পরে পথে বেরিয়েছিলেন, তেমনি কামরূপের যুবকও পুরীধাম থেকে পুনরায় পদযাত্রা শুরু করলেন। পরেশনাথ, গয়া, বুদ্ধগয়া, নালন্দা, পাওয়া-পুরী, কাশী, সারনাথ, প্রয়াগ প্রভৃতি পথের যাবতীয় পুণ্যতীর্থ পরিক্রমার পরে পৌঁছলেন যমুনা-পুলিনে—মধু-বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন শৈশব-লীলাক্ষেত্র দর্শন করে কৃষ্ণপ্রেমের রস আস্বাদন করলেন।

কিন্তু শঙ্করদেব মানব-প্রেমিক। সুতরাং শুধুই কৃষ্ণপ্রেমে মশগুল হয়ে রইলেন না। ব্রজ-পরিক্রমার সময় ব্রজবাসীদের কাছে ব্রজবুলি ভাষা শিখে নিলেন। তারপরে ব্রজবুলিতে বেশ কিছু গীতিকবিতা রচনা করে সুর সংযোজন করে ফেললেন।

অনেকে বলেন এই যাত্রায় শঙ্করদেব বদ্রীনাথ পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং তিনি সবশেষে পুরীধামে গিয়েছেন। তবে একথা সবাই স্বীকার করেন যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বহু তীর্থ দর্শন করে বারো বছর বাদে শঙ্করদেব ঘরে ফিরে এলেন। তখন তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ বছর অর্থাৎ সেটি ১৪৯৩ সাল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা ভাল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হন ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ তখন নিমাই মাত্র সাত বছরের বালক। শ্রীগৌরাঙ্গ পুরীধামে গিয়েছেন চব্বিশ বৎসর বয়সে। অতএব এই পরিক্রমাকালে

শঙ্করদেবের সঙ্গে চৈতন্যদেবের দেখা হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

যাক্‌ গে, যে কথা বলছিলাম, শঙ্করদেব ঘরে ফিরে এলেন। সবাই খুশি হলেন। মেয়ে তো প্রায় স্বর্গ হাতে পেলেন। বারো বছর আগে বাপ যখন পথে বেরিয়েছিলেন, তখন তিনি নিতান্তই শিশু। সেকথা তাঁর মনেও পড়ে না। কিন্তু এখন তিনি বড় হয়েছেন। সব কিছু বুঝতে শিখেছেন। তাই কিছুদিনের মধ্যে সবার সঙ্গে তিনিও বুঝতে পারলেন, বারো বছর আগে যে মানুষটি বরদোয়া থেকে চলে গিয়েছিলেন, সে মানুষটি আর ঘরে ফিরে আসেননি। এ অন্য মানুষ—বর-ভূঁইয়া শঙ্কর নয় শ্রীমন্ত শঙ্করদেব।

পরিবর্তন বুঝতে পারলেও, পরিবর্তনের প্রকৃত কারণটি কেউ অনুধাবন করতে পারলেন না। সবাই ভাবলেন প্রিয়তমা পত্নীকে অকালে হারিয়েই মানুষটা এমন হয়ে গিয়েছেন। তাই আত্মীয়রা শঙ্করের সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে আবার তাঁর বিয়ে দিলেন।

বিবাহ কিন্তু তাঁর সাধনা ও প্রচারের বাধা হয়ে দেখা দিল না। কারণ তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী তাঁকে ঠিক বুঝতে পারলেন। তিনি স্বামীর সাধনার সঙ্গী হলেন। সাধনা চলতে থাকল।

শঙ্করদেব প্রথমেই ভাগবত পুরাণ অনুবাদের কাজে হাত দিলেন—অসমীয়া অনুবাদ। অর্থাৎ সংস্কৃত না জেনেও যাতে আসামের সাধারণ মানুষ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভাগবতীয় তত্ত্বরস আস্বাদন করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি লেখনী ধারণ করলেন। শুধু তাই নয়, ভক্তি-বাদের সঙ্গে আসামবাসীদের প্রত্যক্ষ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তিনি নিয়মিত অসমীয়াতে কীর্তন গান রচনা করতে থাকলেন। ভক্ত ও শিষ্যদের কীর্তনে উৎসাহিত করে তুললেন। নাটক রচনা করে তা অভিনয়ের ব্যবস্থা করে জনশিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করলেন। এবং অবশেষে বরদোয়াতে নামঘর বা কীর্তনঘর প্রতিষ্ঠা করলেন। অর্থাৎ শাক্ত আসামে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রথমকেন্দ্র বা সত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

এবং এ সত্র শুধু ধর্মপ্রচার কেন্দ্র নয়। শঙ্করদেব বিশ্বাস করতেন, নামঘরে নামগান বিতরণের মাধ্যমে তিনি সমাজের ব্যভিচার দূর

করে সমাজে এক রক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হবেন। আর তার ফলে দেশে প্রেমধর্মের প্লাবন আসবে এবং বর্ণবৈষম্যহীন সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। বলা বাহুল্য তাঁর সে স্বপ্ন মিথ্যে হয়নি।

বরদোয়ায় সাফল্য অর্জনের পরে শঙ্করদেব তাঁর সামাজিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে চাইলেন। তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি ও ভূঁইয়া পদ পরিত্যাগ করে সপরিবারে মাজুলি দ্বীপে চলে গেলেন। কথিত আছে, বরদোয়া থেকে বিদায় নেবার আগে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে নেমে কালো পাথরের একটি উজ্জ্বল চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্তি এবং একখানি ছোট ভাগবদ্‌গীতা (পুঁথি) প্রাপ্ত হলেন। পরবর্তী জীবনে এ-দু'টি তাঁর প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে রয়েছে।

কিন্তু মাজুলিতে প্রচারকার্য ক্রমেই কঠিন হয়ে দেখা দিল। কারণ মাধব নামে জনৈক বিদ্বান ও বিচক্ষণ শাক্ত কায়স্থ তাঁর বিরোধিতা করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। তিনি স্থানীয় মানুষদের সামনে শাক্তধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈষ্ণবধর্মের অসারত্ব তুলে ধরতে থাকলেন।

অবশেষে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে দুজনের মধ্যে এক বিতর্ক সভা আয়োজিত হল। সবার সামনে সেদিন শঙ্কর বিদ্রোহী মাধবকে তাঁর নতুন ধর্মমতের মহত্ত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সক্ষম হলেন। সবার সামনেই মাধব সেদিন শঙ্করের সামনে নতজানু হলেন শঙ্কর তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। তাঁকে দীক্ষা দান করলেন।

আর তারপরেই মাজুলি সহ সমগ্র উজনি অসমে শঙ্করদেবের জয়যাত্রা শুরু হয়ে গেল। এবং এই বিজয়ে মাধবদেব তাঁর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করলেন।

কিন্তু কেবল প্রচার ও সংগঠন নয়, সেই সঙ্গে সুপণ্ডিত মাধব তাঁর গুরুর শিক্ষা প্রসার ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান সহযোগী হয়ে উঠলেন। এবং শঙ্করদেবের অবর্তমানে তিনিই নতুন ধর্মমতের প্রধান মহাপুরুষ রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

কিন্তু মাধবদেবের কথা আজ নয়। আসুন, আজ আমরা শুধুই

শঙ্করদেবের স্মৃতিচারণ করি। শঙ্করদেব ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে একই আসনে আহার করার অধিকার দান করলেন। তাঁর নবপ্রচারিত ধর্মের একেশ্বরবাদ, বিগ্রহের পরিবর্তে ভাগবত পুরাণের পূজা, প্রেম-সংকীর্তন এবং সর্বজনীন গণতান্ত্রিক আহ্বানে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে মানুষ ছুটে আসতে থাকলেন। তাঁর ধর্মীয় উদারতায় সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হয়ে উঠলেন। এবং তিনি আসামের সবচেয়ে জনপ্রিয় মহাপুরুষ রূপে পরিচিত হলেন।

মাজুলিতে সত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের সাফল্য দেখে ধর্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ সমাজ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অহোমরাজ স্বর্গদেব প্রসেন্‌ফা ১৪৩৯-১৪৮৮ খ্রি:) নিজে শাক্ত হলেও শঙ্করদেবের ধর্ম-প্রচারে বাধা দেননি। তাই তাঁর আমলে ধর্মব্যবসায়ীরা কোন সুবিধে করে উঠতে পারেননি। এমনকি প্রসেন্‌ফার মৃত্যুর পরে বছর দশেক পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কোন সুযোগ পেলেন না।

ধর্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণসমাজ শেষ পর্যন্ত সে সুযোগ পেলেন অহোম-রাজ স্বর্গদেব সুহুংমুঙ-এর রাজত্বকালে। ১৪৯৭ সালে তিনি অহোম রাজ্যের রাজা হলেন। স্বার্থপর ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় তিনি নানাভাবে বৈষ্ণবদের ওপর অকারণ নির্যাতন শুরু করে দিলেন।

ভক্তবৎসল শঙ্করদেব ছুটে গেলেন রাজসভায়। তিনি রাজার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করলেন। বাধ্য হয়ে রাজাকে তাঁর বক্তব্য শুনতে হল। জোরালো যুক্তি সহকারে শঙ্কর তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করলেন। তারপরে আপন ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করলেন।

রাজার পক্ষে বৈষ্ণবদের নিরাপরাধ ঘোষণা করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। সন্তুষ্ট চিত্তে শঙ্কর মাজুলি ফিরে এলেন।

এই পরাজয়ে ধর্মব্যবসায়ীরা আরও বেশি মরিয়া হয়ে উঠলেন। একদল স্বার্থপর রাজকর্মচারীদের সহায়তায় তাঁরা রাজার আদেশ কার্যকরী করতে দিলেন না। রাজার অজান্তেই বৈষ্ণবদের ওপর

অত্যাচার চলতে থাকল।

অবস্থা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে দেখে বিচক্ষণ মাধব শঙ্কর-দেবকে অজ্ঞাতবাসে চলে যাবার অনুরোধ করলেন। আদর্শবাদী গুরুদেব কিন্তু পুত্রপ্রতিম প্রিয় শিষ্যের পরামর্শ মেনে নিলেন। তিনি আত্মগোপন করলেন।

মাধবদেবের আশঙ্কা কিন্তু মিথ্যে হল না। শঙ্করদেব আত্মগোপন করার কয়েকদিন পরেই রাজার সৈন্য মাজুলি সত্রের ওপরে চড়াই হল। শঙ্করদেবকে না পেয়ে তারা শঙ্করদেবের জামাই হরি ভুঁইয়া এবং মাধবদেবকে বন্দী করে রাজধানী গড়গাঁও নিয়ে গেল।

কয়েকদিন বাদে তাঁদের রাজসভায় হাজির করা হল। রাজার পৌরোহিত্যে সেখানে বিচারের এক প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়। সে বিচারে হরি ভুঁইয়াব প্রাণদণ্ড ও মাধবদেবের কারাদণ্ড হল।

এই অত্যাচারের প্রত্যক্ষ কারণ নাকি ভুইঞারা রাজার আদেশ অনুযায়ী হাতি খেদার গড় পাহারা দেননি। কিন্তু কারণ যাই হোক, এই ঘটনার পরে শঙ্করদেব বুঝতে পারলেন, অহোমরাজ্য আর তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। কয়েকজন প্রিয় পার্ষদ ও সদ্য স্বামীহারা কন্যাসহ সপরিবারে পালিয়ে এলেন কোচ রাজ্যে। বরপেটার কাছে পাট-বাউসি গ্রামে এসে আশ্রয় নিলেন। কোচরাজ বিশ্ব সিংহ (১৫১৫-১৫৪০ খ্রি:) তাঁকে সত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভূমি দান করলেন।

অহোমরাজ হরি ভুঁইয়াকে হত্যা করলেন কিন্তু মাধবদেবকে বেশিদিন বিনাবিচারে বন্দী করে রাখতে সাহসী হলেন না। ন' মাস পরে রাজা তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। মাধবদেব পাটবাউসিতে এসে গুরুদেবের সঙ্গে মিলিত হলেন।

কোচরাজ বিশ্ব সিংহ-এর মৃত্যুর পরে তাঁর সুযোগ্য পুত্র নরনারায়ণ সিংহ (১৫৪০-১৫৮৪ খি:) কোচরাজ্যের সিংহাসনে বসলেন। কিছুকালের মধ্যেই তিনি শঙ্করদেবের ধর্মমতের ওপরে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন। এবং কেবল রাজা নন, সেইসঙ্গে রাজ্যের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। যেমন নারায়ণ ঠাকুর (ভবানন্দ) নামে

জনৈক ধনী ব্যবসায়ী, চাঁদ খান (চাঁদসাঁই) নামে জনৈক মুসলমান দর্জি ও দামোদরদেব সহ বহু ব্রাহ্মণ এবং বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। ফলে কোচরাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। আর পাটবাউসি সত্র সেই ধর্মপ্রচারের প্রধানকেন্দ্রে পরিণত হল।

প্রায় বিশ বছর ধরে পাটবাউসি সত্র পরিচালনার পরে শঙ্করদেব অবসর গ্রহণ করলেন। কারণ তখন তাঁর বয়স নব্বই অতিক্রম করেছে।

পুত্রপ্রতিম শিষ্য মাধবদেবের হাতে পাটবাউসি সত্র পরিচালনা ও ধর্মপ্রচারের দায়িত্বভার অর্পণ করে শঙ্করদেব দ্বিতীয়বার জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করলেন। আবার অনেকে বলেন মাধবদেব সহ শ'খানেক শিষ্যকে নিয়েই তিনি দ্বিতীয়বার পুরী গিয়েছিলেন। কিন্তু সে যা-ই হোক সেবারে তিনি প্রায় ছ'মাস পুরীধামে ছিলেন। তাই এবারে তাঁর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন। কারণ শ্রীচৈতন্যদেব ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে অপ্রকট হয়েছেন। দ্বিতীয়বারে শ্রীশঙ্করদেব পুরী গিয়েছেন ১৫৪০ সালের পরে কোন সময়ে। তখন শ্রীচৈতন্য সম্ভবত পুরীতেই ছিলেন। আর তাহলে নিশ্চয়ই দুই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

শ্রীশঙ্করদেব কিন্তু সেবারেও শুধু তীর্থদর্শন নিয়েই ব্যস্ত থাকেন নি। সেই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে সাহিত্যকর্ম সম্পাদন করতেন। কোন নাটক, প্রার্থনা সঙ্গীত কিম্বা ধর্মগ্রন্থ রচনা করতেন। এবং সেইসব রচনা আজও অসমীয়া সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

তীর্থদর্শন শেষে মহাপুরুষ শঙ্করদেব আবার পাটবাউসি ফিরে এলেন। ততদিনে অহোমরাজ্যের ধর্মব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় কোচ-রাজ্যের একদল ব্রাহ্মণ তাঁর ধর্মমতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। তাঁরা রাজা নরনারায়ণের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ দায়ের করে ফেলেছেন।

অভিযোগগুলি অসত্য জেনেও রাজা সেগুলি সরাসরি খারিজ করে দিতে পারলেন না। তাই বিচক্ষণ রাজা রাজদরবারে এক বিতর্কসভার আয়োজন করে শঙ্করদেবকে আমন্ত্রণ জানালেন।

শঙ্করদেব কোচবিহারে গিয়ে সে সভায় যোগদান করলেন। এদিকে ধর্মব্যবসায়ীরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কাশী থেকে কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিতকে কোচবিহার নিয়ে এসেছেন। তাঁদের এবং স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সকল অভিযোগ খণ্ডন করে শঙ্কর আপন মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। রাজার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

মুগ্ধ রাজা সিংহাসন থেকে নেমে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের সামনে দাঁড়ালেন। গলা থেকে একছড়া মুক্তোর মালা খুলে নিয়ে তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন। শ্রীমন্ত শঙ্কর রাজাকে বুকে টেনে নিলেন।

আলিঙ্গন মুক্ত হবার পরে রাজা মৃদু হেসে বললেন—কিন্তু আপনার তো আর পাটবাউসি ফেরা হবে না?

—কেন? সবিস্ময়ে শঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন—আপনি যে আমার বন্দী।

—বন্দী!

—হ্যাঁ। গুরুদেব বন্দী। রাজা নত হয়ে প্রণাম করলেন শঙ্কর-দেবকে।

সভাসদগণ সবাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

শঙ্কর কিন্তু তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। তিনি অবাক বিস্ময়ে রাজার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রাজা আবার গিয়ে সিংহাসনে বসেন। তারপরে হাসিমুখে শঙ্করদেবকে বলেন—আজ থেকে আমি আপনাকে আমার রাজসভায় রাজকবিরূপে নিলাম বরণ করে। সুতরাং আপনি আর পাটবাউসি ফিরতে পারছেন না।

—সাধু! সাধু! সমবেত সভাসদগণ সমস্বরে বার বার বলতে থাকেন। প্রেমাবতার শঙ্করদেবের দু-চোখের কোল বেয়ে নেমে আসে আনন্দাশ্রু।

আসামের শঙ্করদেব বাকি জীবন বাংলায় অতিবাহিত করলেন। অবশেষে আনুমানিক একশ বিশ বছর বয়সে যুগাবতার শঙ্করদেব কোচবিহারের মধুপুরে দেহরক্ষা করলেন। তোরসা নদীর তীরে তাঁর সমাধিমন্দির দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু সেই পুণ্যক্ষেত্রের কথা আরেকদিন আলোচনা করা যাবে।

আজ শুধু তাঁর প্রেমের বাণী স্মরণ করা হোক, কারণ সেই শাশ্বত-বাণী আজও আমাদের জাতীয়তাবোধ ও সাম্যবাদের মূলমন্ত্র হতে পারে। তাঁর নাটক নামগান ও উপদেশামৃত আজও আমাদের আলোর দিশারী হতে পারে। আর আসুন, সবশেষে আমরা শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের মৃত্যুহীন মহাপ্রাণকে প্রণাম করে আজকের আলোচনায় যতি টেনে দিই।

॥ আট ॥

আজ আর দিসপুর যেতে হল না। দিলীপবাবু অফিসের পরে আমাদের বাড়িতে চলে এলেন। তবে ওপরে উঠলেন না। আমরাই নিচে নেমে এলাম। খুকু বলল—চলুন, এক কাপ চা খেয়ে নেবেন।

—না। দিলীপবাবু আপত্তি করেন। বলেন—বলেছি, ছ'টায় পৌঁছব। উনি আমাদের পথ চেয়ে বসে থাকবেন। তাছাড়া ওঁর বাড়িতে পেটভরা চা-জলখাবার খেতেই হবে।

অতএব আমি আর অশোক গাড়িতে উঠি। খুকু বুলা ও অপর্ণা হাত নাড়ে, আমরাও হাত নাড়ি। গাড়ি এগিয়ে চলে।

আমবাড়ি মোড় থেকে জি. এন. বি. রোড ধরে বাঁয়ে অর্থাৎ পুবে এগোলে প্রথম বাসস্টপ গুয়াহাটী ক্লাবের সামনে। তার পরের স্টপটাই শিলপুখুরি। সুতরাং পাঁচ সাত মিনিটেই আমরা পৌঁছে গেলাম শিলপুখুরির দক্ষিণপারে, ইন্দিরাদির বাড়ির সামনে।

বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে এসে বাড়ি, বাগান ঘেরা অসমীয়া বাংলো। সামনে একফালি বারান্দা। দিদি সেখানে বসেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। দিলীপবাবু আমাদের বাড়িতে চা না-খেয়ে ভালই করেছেন।

এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করি। আমার একখানা হাত ধরে স্নেহভরা স্বরে জিজ্ঞেস করেন—কেমন আছো ভাই ?

—ভাল।

—ভারি খুশি হলাম। সেবারে মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তোমার পেস্‌মেকার বসাবার খবর পেয়ে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন ভাল আছো শুনে ভাল লাগছে। আমাদের তো ভাই, ভাল থাকতেই হবে। এখনো যে অনেক কাজ বাকি রয়েছে। শরীরের বার্ধক্য ঠেকাতে পারব না জানি, কিন্তু মনটাকে কিছুতেই

ঘুড়িয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

একবার থামলেন তিনি। তারপরে আবার বললেন—জানো আজকাল আমার তারাশঙ্করবাবুর কবি বইয়ের সেই গানখানি প্রায়ই মনে পড়ে—

' ভালবেসে মিটল না আশ, কুলাল না এ জীবনে।
হায়! জীবন এত ছোট কেনে, · '

বেশ কয়েক বছর বাদে দেখা। এমনিতেই ছোট-খাটো মানুষ। তার ওপরে বয়সের ভারে শরীরটা সত্যই ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু মনটা এখনো দেখছি তেমনি তরতাজা রয়েছে।

অশোক দিদিকে প্রণাম করে। আমি ওর পরিচয় দিই। দিদি পাশের সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে আমাকে বলেন—ভাগনে-ভাগনী, ভাইপো-ভাইঝি, ছেলে-মেয়ের চেয়ে খুব একটা কম কিছু নয়। তুমি তো জানো, আমার দু-ছেলেই দূরে থাকে। আমার এই ভাইপো এখানে আমাকে দেখা-শোনা করে।

আমরা ভদ্রলোকের দিকে তাকাই। দিলীপবাবু বলেন—দিদির ভাইপো শ্রীলাবু সেনাপতি। শিল্পী উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী এবং প্রকৃতিবিদ।

ভদ্রলোক আমাদের নমস্কার করে বলেন—পাশেই আমাদের বাড়ি। কি আর দেখাশোনা? সকাল-বিকেল দু-বেলা একবার করে আসি, এই পর্যন্ত। পিসির কথা ছেড়ে দিন। চলুন, ভেতরে গিয়ে বসা যাক।

—ভাল কথা মনে করেছিস। দিদি বলে ওঠেন—আমি যে তোমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেই গল্প জুড়ে দিয়েছি। চলো, চলো, ভেতরে গিয়ে বসা যাক।

কথা বলতে বলতে আমরা ভেতরে আসি, ড্রয়িং-রুমে এসে বসি। সেই সঙ্গে গৃহস্বামিনীর মার্জিত রুচির পরিচয় পেয়ে যাই। মেঝের কার্পেট, সোফা সেন্টার টেবল ও বইয়ের আলমারি, জানলা-দরজার পর্দা। আসামের বিভিন্ন উপজাতীয়দের কয়েকটি প্রতীকের

ওয়াল-ডেকরেশান, বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীর মূর্তি এবং ফুলদানিতে একগুচ্ছ গোলাপ সবই তাঁর উন্নত রুচিবোধের পরিচয়।

দিদি অসমীয়া। কিন্তু তাঁর বিয়ে হয়েছিল আদিবাসী সমাজে, উত্তর লখিমপুরের এক সুশিক্ষিত মিরি পরিবারে। তাঁর জন্ম ১৯১০ সালে, তাঁর বাবা শিলঙে আসাম সেক্রেটারিয়েটে সিভিল রেজিস্ট্রার ছিলেন।

কথায় কথায় দিদি বলেন—আমার বাবা প্রয়াত সুনাধর দাস সেনাপতি ছিলেন অসাধারণ আধুনিক। তিনি তাঁর যুগের চেয়ে বোধকরি শ'খানেক বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন শিলঙে বাংলা-মাধ্যমে পড়াশুনা করতে হত। কারণ বাংলা ছিল সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের Link Languge.

শিলঙে আমার পড়াশুনা ঠিকঠাকই চলছিল। তবু হঠাৎ বাবা একদিন বলে বসলেন—দেখো, বাংলা মাধ্যমেই যদি পড়াশুনা করতে হয়, তবে শিলঙে পড়ার কোন মানে হয় না, কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করাই উচিত। কারণ তা নাহলে সত্যিকারের লেখাপড়া শিখতে পারবে না।

মা-সহ বাড়ির প্রায় প্রত্যেকেই আপত্তি করলেন। কিন্তু নিজের মতের ওপরে বাবার ছিল অগাধ বিশ্বাস। সুতরাং সবার আপত্তি উপেক্ষা করে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। লোয়ার সার্কুলার রোডের ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। সেটা ১৯২২ সাল। তখনকার দিনে বারো বছরের একটি অসমীয়া কিশোরীকে একা কলকাতার হস্টেলে রেখে বাবা শিলঙে ফিরে এলেন। সে যুগে এমন দুঃসাহসিক কাজের নজির তোমরা খুব বেশি খুঁজে পাবে না।

আমরা মাথা নাড়ি। দিদি বলতে থাকেন—যথাসময়ে ম্যাট্রিক পাশ করলাম। ভেবেছিলাম বেথুন কলেজে ভর্তি হব। কিন্তু বাবা বলে বসলেন, মেয়েদের কলেজ! না, না, কখনই নয়। ওসব কলেজে ঠিকমত পড়াশুনা হয় না। কারণ সত্যিকারের কোন Competition

থাকে না। তোমাকে ছেলেদের সঙ্গে একই কলেজে পড়তে হবে। তাহলে তোমার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠবে, তোমার ভাল পড়াশুনা হবে।

বাবা আমাকে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি করে দিলেন। ১৯৩২ সালে আমি বি. এ. পাশ করলাম। আর সে বছরেই আমার বিয়ে হল গুয়াহাটীতে। আদি সমাজে বিয়ে করায় প্রবল সামাজিক বাধার সামনে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু বাবা তাঁর সাহস ও বুদ্ধিবলে অনায়াসে সে বাধা অতিক্রম করলেন।

আমার স্বামী প্রয়াত মহিচন্দ্র মিরি বন বিভাগের অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার ছিলেন। সৎ ও প্রাণময় শিক্ষিত যুবক ছিলেন তিনি। আমাদের মিলিত জীবন সুখ ও শান্তিতে কাটতে থাকল। আমাদের দুটি ছেলে হল।

কিন্তু ভগবান বেশিদিন আমার সুখ সইতে পারলেন না। বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। বিয়ের মাত্র সাত বছর বাদে যমরাজ আমার সিথির সিঁদুর মুছে দিলেন। দুটি অবোধ শিশুকে আমার কোলে ফেলে রেখে তিনি অমরলোকে মহাপ্রস্থান করলেন। তখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ আর আমার উনত্রিশ। সেটা ১৯৩৯ সাল।

বাপের বাড়িতে কিম্বা শ্বশুরবাড়িতে খাওয়া-পরা এবং আপনজনের অভাব ছিল না। কিন্তু কেবল সন্তান পালন ও বৈধব্যের আদর্শকে সম্বল করে প্রাণধারণ করতে মন চাইল না। মন বলল— সংসার তোমাকে যত দুঃখই দিয়ে থাক, সংসারের দুঃখী মানুষগুলোর মুখে তোমাকে হাসি ফোটাতে হবে। তাদের হাসি তোমার এই বঞ্চিত জীবনের বেদনা দূর করে দেবে। তুমি শান্তি পাবে।

শিলঙে সেণ্ট্ মেরি'স কলেজে বি. টি. ক্লাসে ভর্তি হলাম। এবারে জীবন দেবতা সহায় হলেন আমার। মণ্টেসরি ট্রেনিং নেবার সুযোগ পেয়ে আহমেদাবাদ চলে গেলাম। তোমরা শুনলে খুশি হবে স্বয়ং মাদাম মণ্টেসরির কাছে টেনিং নেবার সুযোগ আমার হয়েছে।

—তাই নাকি! সবিস্ময়ে বলে উঠি।

মাথা নেড়ে আর মৃদু হেসে দিদি উত্তর দেন—হ্যাঁ। মাদাম তখন আহমেদাবাদে ছিলেন। প্রায়ই ক্লাস নিতেন আমাদের। তিনি ইতালিয়তে বলতেন, দোভাষী ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতেন।

ট্রেনিং নিয়ে শিলঙে চলে এলাম। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে বি. টি. পাশ করলাম।

আর তার পরের বছরই বিলেতে গিয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়ে গেলাম। ১৯৪৭ সালে বি. এড. পাশ করে দেশে ফিরে এলাম।...

দরজার পর্দা ঠেলে কাজের মেয়েটি ঘরে ঢোকে। সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী আদিবাসী তরুণী। পনেরো-ষোলো বছর বয়স হবে বোধকরি। মেয়েটি সম্ভবত খিশমি ভাষায় দিদিকে কিছু বলে। দিদি সেই ভাষাতেই তাকে কিছু নির্দেশ দেন। মেয়েটি মাথা নেড়ে চলে যায়।

দিদি উঠে দাঁড়ান। আমাদের বলেন—চলো, খাবার ঘরে যাওয়া যাক।

—খাবার ঘরে!

একটু হেসে দিদি বলেন—হ্যাঁ। এতদিন বাদে দিদির কাছে এসেছো, একবার খাবার ঘরে যাবে না?

—দিদির বাড়ি যখন এসেছি, তখন চা অবশ্যই খাবো। তাই বলে ড্রয়িং-রুম ছেড়ে একেবারে ডাইনিং হলে!

—মাফ করো ভাই! গৌহাটি শহর হলেও আমরা এখনো শহুরে হয়ে উঠতে পারিনি। শুধু চা খাইয়ে বিদায় নিতে পারবে না, তার সঙ্গে সামান্য কিছু টা-ও খেতে হবে। চলো, দেরি করলে ওদিকে সব জুড়িয়ে যাবে।

অতএব দিদির সঙ্গে খাবার ঘরের দিকে এগোতে শুরু করি। চলতে চলতে সহাস্যে দিলীপবাবু বলেন—এ বাড়িতে এসে ভরপেট না খেয়ে কারও ঘরে ফেরার উপায় নেই।

—না, না। দিদি প্রতিবাদ করেন। হেসে বলেন—ওঁর কথা

বিশ্বেস ক'রো না। ওঁরা সরকারের লোক, তিলকে তাল করা ওঁদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

সবাই হেসে উঠি। হাসতে হাসতে আমরা খাবার ঘরে এসে পৌঁছুই। ঘরের মাঝখানে মাঝারি আকারের সুদৃশ্য ডাইনিং-টেব্‌ল। তার চারিদিকে ছ'খানি কাঠের চেয়ার। একপাশে একটা কাচের আলমারিতে বাসনপত্র, আরেকপাশে ফ্রিজ ও ওয়াটার-ফিলটার।

এটা খাবার ঘর হলেও চারদিকে দেওয়াল ঘেরা নয়। একদিক খোলা প্রশস্ত বারান্দার মতো। সেদিকে ফুলের বাগান। ভারি সুন্দর নানা রকমের ফুল ফুটে আছে।

বাগানের ফুল ডাইনিং টেবিলেও হাজির হয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, ডাইনিং-টেব্‌লটিও ভারি সুন্দর করে সাজানো। বুঝতে পারছি, আমরা যখন ওঘরে বসে গল্প করছিলাম, তখন কাজের মেয়েটি এই শিল্পকর্ম সুসম্পাদন করেছে। এবং বলা বাহুল্য সে দিদির কাছেই শিক্ষা পেয়েছে।

দিলীপবাবু ঠিকই বলেছেন, সত্যিই ভরপেট খাবারের আয়োজন। লুচি ডাল তরকারি চাটনি এবং দু-রকমের পিঠে ও পায়েস।

আপত্তি করে লাভ নেই। অতএব হাত লাগাই।

মিস্টার সেনাপতি কিন্তু আমাদের সঙ্গে বসলেন না। আমি তাঁর দিকে তাকাই। তিনি বলেন—আপনারা শুরু করুন। আমি একটু বাদে বসছি। তার আগে পিসির সঙ্গে আপনাদের কয়েকখানা ছবি তুলে রাখি।

ভেতর থেকে ক্যামেরা এনে তিনি ছবি তুলতে লেগে যান।

দিলীপবাবু দিদিকে বলেন—শঙ্কুবাবু ও কর্নেলকে আপনার নেফার চাকরির কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলুন না। কর্নেল মানে অশোক। সে এয়ারফোর্সে স্কোয়ার্ডন লিডার ছিল (উইং কম্যাণ্ডার নয়)। কিন্তু দিলীপবাবু তাকে কর্নেল বলেন।

আপত্তি না করে দিদি বলতে শুরু করেন—বিলেত থেকে ফিরে এলাম। তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের

চাকরি পেয়ে গেলাম, Education Officer, NEFA.

অর্থাৎ কেন্দ্রশাসিত নেফার শিক্ষাবিভাগের প্রধান। আমার হেড-কোয়ার্টার্স সদিয়া। জীপযোগে কর্মস্থলে পৌঁছলাম। ভরত সরকার তখন নেফা অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেছেন।

তোমরা বোধহয় জানো যে সমগ্র নেফা অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমানের অরুণাচল প্রদেশটি পাঁচটি ডিভিশান বা জেলায় বিভক্ত। আবর উপজাতি অধ্যুষিত সিয়াঙ ডিভিশান, মিশমি অধ্যুষিত লোহিত ডিভিশন, শঙ্করদেব প্রভাবিত নাগা ও খামতিদের তিরাপ, আপাতানি ও ডাফলাসদের সুবনসিড়ি এবং বৌদ্ধ প্রধান কামেঙ ডিভিশান। নাগাল্যাণ্ড-এর তুয়েনসাঙ অঞ্চলটিও তখন নেফার অন্তর্গত ছিল।

শুনলে অবাক হবে। দিদি বলে চলেন—নেফার আয়তন ৩০,০০০ বর্গ মাইল। এই সুবিশাল অঞ্চলে তখন একটিমাত্র প্রাইমারি স্কুল ছিল, পাসিঘাট নামে একটা জায়গায়। সেখানে অসমীয়া ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। তবে নেফার শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন অধিবাসীরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে সদিয়া কিম্বা তেজপুরে পাঠিয়ে দিতেন। সেখানে মিশনারি স্কুল ছিল, ইংরেজি-র মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। তাই বলে নেফায় কিন্তু তখনও খ্রিস্টধর্ম প্রবেশ করেনি।

চাকরিতে যোগ দেবার পরে আমি বেশ কিছুদিন এই প্রত্যন্ত প্রদেশের দুর্গম পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম। যানবাহন দূরের কথা, অধিকাংশ জায়গাতেই পথ বলে কিছু নেই। ভাষা বিভ্রাট তো ছিলই। তার ওপরে ছিল অবিশ্বাস। যুগ যুগ ধরে শোষিত হবার ফলে ওরা সমতলবাসীদের বিশ্বাস করত না। সাধ্যমত ওদের ভাষাগুলো একটু-আধটু শিখে নিয়ে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে আমি ওদের কিছু বিশ্বাস অর্জন করতে সমর্থ হলাম। শিক্ষার সুফল সম্পর্কে ওদের খানিকটা সচেতন করে তুলতে পারলাম। কিন্তু সেইসঙ্গে অনুধাবন করলাম, শিশুশিক্ষার আগে বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করা দরকার।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটা মজার ঘটনা বলি। তখন একটা গ্রামে আমি একটি স্কুল করেছি। নিজেই ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাই। একদিন যখন আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমার এক ছাত্রের বাবা এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, নানে। (মানে ঠাকুরমা) আমার ছেলেটাকে আজ ছেড়ে দিন। তার এখুনি মাঠে যাওয়া দরকার।

আমি আপত্তি করলাম। বললাম, এখন ও কেমন করে যাবে। এখন যে পড়াশুনা করছে।

বেশ তো। লোকটি বলে, ওর জায়গায় আমি বসছি। তাতে নিশ্চয়ই আপনার কাজ চলে যাবে।

আমরা হো হো করে হেসে উঠি। দিদিও একটু হাসেন। তারপরে আবার বলতে থাকেন—নেফায় প্রায় ষাটটির মতো উপজাতি সমাজ। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বসবাস করেন। কিছু কিছু গ্রাম খুবই ছোট। পাঁচ-সাতখানা ঘর আর পনেরো বিশজন নারী-পুরুষ ও শিশু নিয়েও একটা গ্রাম আর একটি পৃথক উপজাতি হয়। ভিন্ন তাঁদের সমাজ এবং ভিন্ন তাঁদের স্থানিক ভাষা বা বাচন (Dialect) এত ভাষা কিন্তু তাঁদের বর্ণমালা বা অক্ষর (Script) ছিল না।

ব্যাপারটা নিয়ে বিভিন্ন উপজাতিদের মোড়ল এবং রাজাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তারপরে অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে আমার মনে হল, এই অঞ্চলে সর্বত্রই অল্প-বেশি অসমীয়া ভাষার প্রভাব রয়েছে। অতএব অসমীয়া বর্ণমালার মাধ্যমে এঁদের আপন-আপন স্থানিক ভাষায় লেখার প্রচলন করলে, এঁদের লেখাপড়া শেখা সবচেয়ে সহজ হবে। তাছাড়া অসমীয়া বর্ণমালা তাঁদের পক্ষে নিজেদের মধ্যে এবং আসামবাসীদের সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে।

এই প্রস্তাব কার্যকরী করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমি নিজেই একখানি সচিত্র বর্ণপরিচয় রচনা করে ওঁদের মধ্যে বিতরণ করলাম। বইখানি ওঁরা সাগ্রহে গ্রহণ করলেন।

কিন্তু সরকার গ্রহণ করলেন না। কারণ যাঁর সুপারিশে সরকার এসব প্রস্তাব গ্রহণ করেন, সেই হিন্দিভাষী পলিটিক্যাল অফিসার

বলে বসলেন, অসমীয়া নয়। রোমান অক্ষর দিয়েই তৈরি হবে নেফার বর্ণমালা। এবং নেফায় শিক্ষার বাহন হবে রাষ্ট্রভাষা হিন্দি।

খাওয়া হয়ে গিয়েছে। কাজের মেয়েটি প্লেট ও গ্লাস ইত্যাদি নিয়ে যায়। তারপরে দিদি নিজেই চা বানাতে লেগে যান।

চা নয়, আমি ভাবছি দিদির কথা, তাঁর কর্মস্থল নেফার কথা। শুনেছি সেখানকার সাধারণ মানুষ আজও হিন্দি শিখে উঠতে পারেন নি, যেমন পারেননি মণিপুর আর নাগাল্যাণ্ডের মানুষ। ফলে সারা অঞ্চল জুড়ে আজও এমন অনৈক্য আর অবিশ্বাস, এতো হানাহানি। অথচ দিদির প্রস্তাব কার্যকরী করলে অসমীয়া বর্ণমালা উপজাতি ঐক্যের অগ্রদূত হতে পারত।

শুধু তাই নয়, শুনেছি নেফা অঞ্চলে আজও শিক্ষার মাধ্যম সুস্থির হয়নি। এর কারণ বোধকরি পরিচিত অসমীয়ার পরিবর্তে অপরিচিত হিন্দির প্রচলন।

আমাদের সামনে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে দিদি বলেন—আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দশ বছর সময় আমি নেফায় অতিবাহিত করেছি। খুবই পরিশ্রম করেছি। কারণ কী জানো?

আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি বলেন—আমি যে ঐ সোজা সরল পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু অথচ ভাগ্যাহত মানুষগুলিকে সত্যই ভালোবেসে ফেলেছিলাম। ভেরিয়ার এলউইন (Verrier Elwin) তার 'Philosophy For NEFA' বইতে লিখেছেন—'It is another World, another people and other Customs···Its roads are frightful like the path leading to the nook of death···'

অথচ এই মৃত্যুপুরীর মানুষগুলো আশ্চর্য প্রাণময়। সত্যই ওদের ভাল না বেসে পারা যায় না। আর তাই আমি ওঁদের জন্যই আমার জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পেরে উঠলাম না। নিজের বিশ্বাস বিসর্জন দিয়ে, আদর্শচ্যুত হয়ে চাকরিতে টিকে থাকা সম্ভব হল না আমার পক্ষে। আসামের মেয়ে আসামে ফিরে

এলাম। শিক্ষকতা করেই জীবন কাটালাম, অথচ নেফার শিক্ষা প্রসারে কোন কাজে আসতে পারলাম না।

দিদি থামলেন। কিন্তু অশোক তাঁকে নীরব থাকতে দেয় না। তাঁকে বলে—আপনি তো নেফার গহন-গিরি-কন্দরে প্রচুর ভ্রমণ করেছেন ?

—তা করেছি বৈকি! আমি এমন সব গ্রামে গিয়েছি, যেখানে এলউইন সাহেবও যেতে পারেননি।

—সেই ভ্রমণের কিছু কথা বলুন না।

একটু ভেবে নিয়ে দিদি শুরু করেন—বেশ তাহলে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা শোনো। সেবারে আমি একটি অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়েছি। সেখানে তখনও ছেলেরা কোমরে একটুকরো দড়ি বেঁধে তার সঙ্গে সামনের দিকে কয়েকটা পাতা ঝুলিয়ে রেখে লজ্জা নিবারণ করত। আর মেয়েরা কোমরে একফালি সরু কাপড় বেঁধে রাখত। ছেলেদের মতো মেয়েরাও খালি গায়ে থাকত।

মালবাহকরা ঐ পোশাকেই আমার মালপত্র বইছিল। চলতে চলতে আমরা একটা নদির তীরে পৌঁছলাম। সেখানে একটা গাছের সাঁকো ছিল। তারই ওপর দিয়ে নদি পার হয়ে আসা গেল।

নদি পার হয়েই কিন্তু মালবাহকরা মাল নামিয়ে রাখল। আমরা কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই তারা নদিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতার কেটে স্নান শুরু করে দিল। খরস্রোতা নদি, শীতল জল। তবু তাদের পারে ওঠার নাম নেই। বাধ্য হয়ে তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আমাদের।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাপিয়ে স্নান করার পরে ওরা উঠে আসে জল থেকে। মালপত্র পিঠে নিয়ে ভিজে গায়েই শুরু করল পথচলা। স্নানের সময় যে পাতার লজ্জাবরণটি জলে ভেসে গিয়েছে, তা দেখতে পেয়েও পুনরায় আবরণ স্থাপনের কোন প্রয়োজন বোধ করল না।

তারপরেও মাইল পনেরো বনময় চড়াই-উৎরাই পথ পার হয়ে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। সেখানে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে

জামা-কাপড় ও কম্বল বিতরণ করলাম। কিছু খাদ্যদ্রব্যও পরিবেশন করা হল। শিক্ষা সম্পর্কেও কিছু কথা বলা গেল।

কথা ছিল, সেদিনই আমরা প্রত্যাবর্তন শুরু করব পথে একটা জায়গায় রাত কাটিয়ে পরদিন দুপুর নাগাদ সদিয়া ফিরে আসব। কম তো নয়, প্রায় পঞ্চাশ মাইল দুর্গম পাহাড়ি পথ ভাঙতে হয়েছিল সে যাত্রায়।

যাক্ গে যেকথা বলছিলাম, শেষ পর্যন্ত সেদিন কিন্তু ফিরতে পারলাম না। একে তো অনেক দেরি হয়ে গেল, তার ওপরে আমার সঙ্গী অ্যাসিস্টেণ্ট পলিটিক্যাল অফিসার ও সাব ডিভিশ্যনাল পুলিশ অফিসার বলে বসলেন, দিদি! আজ এখানেই থেকে যান। কাল সকালে নাচের আয়োজন করব। একেবারে নাচ দেখে রওনা দেওয়া যাবে। মালবাহকরাও আজ বিশ্রাম চাইছে।

অতএব থাকতে হল। গ্রামবাসীরা খুবই আদর-যত্ন করলেন। আমরা যে তাঁদের অতিথি।

—তা রাতে থাকলেন কোথায়, আর খেলেনই বা কি? আবার অশোক প্রশ্ন করে।

দিদি উত্তর দেন—রেশন তো আমাদের সঙ্গেই ছিল। আমাদের নির্দেশমত ওঁরা তা রান্না করে দিলেন। আর আমরা থাকলাম ওঁদের কমিউনিটি হলে। প্রত্যেক উপজাতি গ্রামে একটি করে কমিউনিটি হল থাকে। গাঁয়ের মধ্যে সেখানি সবচেয়ে বড় ও ভাল ঘর।

পরদিন সকালে সেই ঘরের সামনে ছোট মাঠটুকুতেই নাচের আসর বসল। বিদেশী অতিথিদের নাচ দেখানো হবে বলে স্বয়ং রাজা তাঁর কয়েকজন পার্ষদ সহ আসরে উপস্থিত হলেন।

—রাজা! অশোক বিস্মিত।

দিদি বলেন—হ্যাঁ, রাজা। নেফা অঞ্চলে তখন অনেক রাজা। তিনি ঐ অঞ্চলের রাজা ছিলেন।

—তা রাজামশায় দেখতে কেমন?

—গায়ের রঙ কালো হলেও চেহারাটি সত্যই রাজকীয়, স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘদেহী। তাঁর মাথায় পালকের মুকুট। গায়ে একখানি রঙিন শাল, তাতে সুন্দর সুচের কাজ। রাজদণ্ড নয়, রাজার হাতে একটা প্রকাণ্ড বল্লম। পার্ষদদের হাতেও তীর-ধনুক কিম্বা বল্লম। তাঁরাও সবাই বেশ স্বাস্থ্যবান।

হাতের বল্লমখানি সজোরে মাটিতে পুঁতে দিয়ে নির্দিষ্ট আসনে আসীন হলেন রাজা। তাঁর একপাশে বসলেন আমার দুই সঙ্গী অফিসার, আরেকপাশে বসতে হল আমাকে।

আমরা আসন গ্রহণ করার পরে রাজা আমাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন। তারপরে একটা বিকট চিৎকার করে নাচ শুরু করবার আদেশ দান করলেন।

ব্যাস, ঢাক-ঢোল ও শিঙ্গা বেজে উঠল। সেই বাজনার তালে তালে শুরু হয়ে গেল নাচ। অস্ত্র-শস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধের নাচ। বলা বাহুল্য কেবল ছেলেরাই নাচল। তাদের মাথায় পাখির পালক, পরনে লেঙ্গুটি—খালি গা।

যুদ্ধ জয়ের নাচ, জয়লাভের আনন্দ-নৃত্য। তবু রাজা যেন ঠিক উপভোগ করতে পারছেন না। হঠাৎ বিরক্ত কণ্ঠে তিনি আমাকে বলে ওঠেন, কি নাচিবি মেমসাব। মুড়টু না কাটিলে, মনটু না নাচে।

দিদি থামলেন। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। একটু হেসে তিনি জিজ্ঞেস করেন—বুঝলে না অর্থটা?

—না।

—রাজা বললেন, কি নাচ দেখছিস মেমসাহেব? সত্যি সত্যি মুণ্ড না কাটলে যে আমাদের মন নেচে ওঠে না।

—ওরে বাবা! অশোক বলে ওঠে—এ যে ভয়ানক কথা।

—তাহলেও যে কথাটা ওদের কাছে সত্য। শত্রুর মুণ্ড হল বিজয়ের স্মারক। অতএব মুণ্ড না কাটতে পারলে জয়ের নৃত্য জমবে কেমন করে? আর এটা কেবল নেফার আদিবাসীদের কাছেই নয়,

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় সব উপজাতিদের বেলাতেই সমান সত্য।

কথায় কথায় রাত বেড়ে গিয়েছে। এবারে ওঠা দরকার। বহুক্ষণ আমরা দিদিকে আটকে রেখেছি। এখন তাঁকে ছুটি দেওয়া উচিত হবে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। বলি—আজ আসি তাহলে।

—হ্যাঁ। অনেকক্ষণ এসেছো। আর আটকাবো না। আবার কবে আসছ?

—আসব একদিন। আসার আগে ফোন করে নেব।

—তা নিও। কিন্তু আমি জিগেস করছি, এবার আসাম থেকে কলকাতায় ফিরে গিয়ে আবার কবে আসামে আসছ?

—বোধকরি সামনের ফেব্রুয়ারিতে, কারণ আমার নাতি তখন বদলি হয়ে কলকাতায় ফিরে যাবে।

—তার মানে তোমার ভাগনি তখন গৌহাটির পাট চুকিয়ে কলকাতায় চলে যাচ্ছে এবং তারপরে তোমার আসামে আসাটা অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

একটু হেসে বলি—তা খানিকটা তো বটেই।

দিদি যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। গম্ভীর স্বরেই বলেন—এ অন্যায়। ভীষণ অন্যায়।

—কী বলুন তো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

গম্ভীর স্বরেই দিদি আবার বলেন—তার আগে তুমি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও।

—কী?

—সংসারে দিদি আগে, কি ভাগনি আগে?

—অবশ্যই দিদি।

—তাহলে ঐ অন্যায় কথাটা কেমন করে বলতে পারলে? তোমার ভাগনি আসাম ছেড়ে চলে যাবে বলে, তোমার আবার আসামে আসা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অথচ এখানে যে তোমার একটা দিদি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবে, তা ভুলে গেলে কেমন করে?

এতক্ষণে কথাটা বুঝতে পারি। কিন্তু বুঝেও বুঝে উঠতে পারছি না কি বলা উচিত হবে? তাই চুপ করে থাকি।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য পরিহার করে এবারে দিদি তাঁর স্বাভাবিক স্নেহভরা স্বরে বলে ওঠেন—ভাই, মনে রেখো, এখানে তোমার একটা দিদি রয়েছে। যখন ইচ্ছে চলে এসো, ভাই-বোন মিলে কয়েকটা দিন আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। কথা বললে, পাছে ধরা পড়ে যাই। তাই দিদিকে প্রণাম করে নীরবে এগিয়ে চলি দরজার দিকে। আর মনে মনে বলি—এরই নাম ভালোবাসা, যে ভালোবাসার টানে আমি বারবার ফিরে ফিরে আসি এই আমার অলকাপুরী আসামে।

॥ নয় ॥

একেই বলে সময়নিষ্ঠা। ঠিক ন'টার সময় ঘরে বসে আমরা গাড়ির হর্ন শুনতে পেলাম। অপর্ণা বলে ওঠে—দাদু তোমাদের গাড়ি এসে গিয়েছে।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, আমাদের বত্রিশ নম্বরের সামনে দিলীপবাবুর নীল মারুতি।

আমি ও অশোক সিঁড়ি বেয়ে নিচে চলি। খুকু বুলা ও ববি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আজ রবিবার। ববি একটু বেলা করে অফিসে যাবে।

দিলীপবাবুও বেরিয়ে আসেন গাড়ি থেকে। ওদের আশ্বাস দেন—সন্ধে নাগাদ ফিরে আসছি। তখন চা খেয়ে যাবো। এখন দেরি করব না। আরেকজন ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে যাবেন। তিনি রাস্তায় অপেক্ষা করছেন।

মনে মনে প্রমাদ গণি। আজও দেখছি দিলীপবাবু মারুতি নিয়ে এসেছেন। সামনে ড্রাইভার ও দেহরক্ষী। পেছনে আমরা তিনজন। অথচ তাঁকে বলেছি যে উৎপল আমাদের সঙ্গে যাবে। তার ওপরে আবার তিনি বলছেন, আরেকজন যাবেন। একটা মারুতি গাড়িতে সাতজন যাবো কেমন করে?

তবু কোন প্রশ্ন করি না। গাড়িতে উঠি। খুকু বুলা ববি ও অপর্ণা হাত নাড়ে। গাড়ি এগিয়ে চলে।

—এদিকে যাচ্ছি কেন? অশোক বলে ওঠে—মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে যাওয়াই তো ভাল ছিল।

—তাই যাবো। দিলীপবাবু বলেন—এখন একবার স্টেট মিউজিয়ামের সামনে যেতে হবে। মিউজিয়ামের ডিরেক্টার ডক্টর চৌধুরি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। তিনি অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য।

কিন্তু এই ছোট গাড়িতে এতোগুলো মানুষ যাবো কেমন করে? কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও চুপ করে থাকি। এবং ভাগ্য ভাল বলতে হবে। জিগেস করলে লজ্জা পেতে হত। কারণ একটু বাদে দিলীপবাবু নিজেই বলেন—ডক্টর চৌধুরি তাঁর গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। উৎপল ওর গাড়িতে যেতে পারবে। উনিও একজন কথা বলার লোক পাবেন।

নিশ্চিন্ত হই। অবশ্য এসব দুশ্চিন্তা বোধকরি আমার বার্ধক্যের পরিণাম। নইলে একটা রাজ্যের একজন অ্যাডিশ্যনাল চিফ্ সেক্রেটারি এমন একটা হিসেবের ভুল করবেন!

গাড়ি মিউজিয়ামের সামনে আসে। রবীন্দ্র ভবন ও ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির মাঝখানে দীঘলপুকুরির উল্টোদিকে সুবিরাট এলাকা নিয়ে স্টেট মিউজিয়াম।

রাস্তার পাশে একখানি অ্যামব্যাসাডার দাঁড়িয়েছিল। আমাদের গাড়ি এসে পেছনে থামে। সামনের গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ডঃ চৌধুরি। সৌম্যদর্শন ছোট-খাটো মানুষটি। বয়স বোধকরি পঞ্চাশের ঘরে। দিলীপবাবু পরিচয় করিয়ে দেন। তারপরে আমাকে জিগেস করে—উৎপল কি বলেছে, কোথায় দাঁড়িয়ে থাকবে? ঝালুকবাড়ি মোড়ে?

আমি মাথা নাড়ি। দিলীপবাবু ডক্টর চৌধুরিকে বলেন—ঝালুকবাড়ি মোড়ে গাড়ি দাঁড় করাবেন, ওখানে আপনার পার্টনার অপেক্ষা করছে।

—আমার পার্টনার! ডঃ চৌধুরি বুঝতে পারেন না।

—হ্যাঁ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র, আমাদের শঙ্কুবাবুর ভক্ত। সে-ও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।

একটু হেসে ডঃ চৌধুরি বলেন—ওঁর ভক্ত তো আমিও। আর তাই তো আমিও যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে।

লজ্জা পেয়ে ওঁর একখানি হাত ধরে বলি—এসব বলছেন কেন? আপনি সঙ্গে থাকায় আমাদের খুবই সুবিধে হল।

—আমাকে তো মাঝে মাঝেই হাজো যেতে হয়। ওখানে কিছু মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেগুলো অনিবার্য কারণে গুয়াহাটী আনা যাচ্ছে না। আমরা ওখানেই সেগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। আপনি যাচ্ছেন শুনে গঙ্গোপাধ্যায় সাহেবকে বলে ফেললাম, আমিও আপনাদের সঙ্গী হব।

—খুবই ভাল হল। আপনার মতো সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

—ঠিকই বলেছেন। দিলীপবাবু সমর্থন করেন আমাকে। বলেন —হি ইজ রিয়েলি আ ভেরি ইউসফুল অ্যাণ্ড গুড কম্পানি।

ডঃ চৌধুরি হাসতে হাসতে বলেন—এই একই কথা কিন্তু আমিও বাড়িতে আপনার সম্পর্কে বলে এসেছি।

—তার মানে আমরা ভাগ্যবান। আমরা দুজন ইউসফুল অ্যাণ্ড গুড কম্পানি লাভ করলাম।

অশোকের মন্তব্য শুনে সবাই হেসে উঠি।

দিলীপবাবু বলেন—কিন্তু এখানে আর সময় নষ্ট নয়। চলুন, এবারে রওনা হওয়া যাক।

সবাই গাড়িতে উঠে বসি। গাড়ি গর্জে ওঠে। দীঘলপুকুরির পশ্চিমপার ধরে মহাত্মা গান্ধী রোডে আসি। ব্রহ্মপুত্রকে ডাইনে রেখে পশ্চিমে এগিয়ে চলি। এই পথ দিয়েই আমরা সেদিন বিমানবন্দর থেকে আমবাড়ি এসেছি। সেই পানবাজার ফ্যান্সি-বাজার এলাকা আর সেই ডেপুটি কমিশনারের অফিস ও শুক্রেশ্বর মন্দির। সেদিন এই পথ দিয়ে যাবার সময় বার বার প্রগতির কথা মনে পড়েছে। আজও পড়ছে। বিশেষ করে এই শুক্রেশ্বর মন্দিরের সামনে এসে। এক শীতের গোধূলিতে যে প্রগতি আমাকে নিয়ে এসেছিল এই মন্দিরে।

কিন্তু থাকগে প্রগতির কথা, শুক্রেশ্বরের কথাও আর নয়। তার চেয়ে পথের দিকে নজর দেওয়া যাক। অবশেষে ভরালু নদির পুলের

ধারে এসে আসাম ট্রাঙ্ক্ রোডকে ধরা গেল। পুল পেরিয়ে এ. টি. রোড এগিয়ে চলল পশ্চিমে। আমাদের বাঁয়ে রেল লাইন ডাইনে ব্রহ্মপুত্র। কোথাও সে কিছু দূরে, বাড়ি-ঘরের পেছনে আবার কোথাও বা একেবারে পথের পাশে।

কামাখ্যা পাহাড়ের পাদদেশে পৌছন গেল, পথের ডানদিকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে। আগে লেখা হত গৌহাটি শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে কামাখ্যা পাহাড়। এখন আর সেটি লেখার উপায় নেই। কারণ গৌহাটি ক্রমেই বড় হচ্ছে। এখন শুধু বলা যেতে পারে গৌহাটি শহরের শহরতলিতে কামাখ্যা পাহাড। অর্থাৎ প্রায় এ পর্যন্ত জনবসতি গড়ে উঠেছে।

মা-কামাখ্যার উদ্দেশে প্রণাম জানাই। অন্তর্যামী মায়ের কাছে নিরাপদ ও আনন্দময় ভ্রমণ প্রার্থনা করি। তাঁর করুণা না হলে আসামে ভ্রমণ আনন্দময় হতে পারে না।

কামাখ্যা পাহাড় ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে বাঁদিকে মালিগাঁও—রেল সদর। মিসেস ভট্টাচার্য অন্তত একদিন আমাকে নিয়ে আসবেন এখানে। দেখা হবে ডাক্তার ভট্টাচার্য ও তাঁর ভাগ্নেব পরিবারের সঙ্গে। দেখা হবে দেবযানী ও তার বন্ধুদের সঙ্গে।

কিন্তু ওদের কথা এখন থাক। এখন আবার পথের দিকে তাকানো যাক। বাঁদিকে মালিগাঁও আর ডানদিকে পাণ্ডু।

শৈশবে বাবার কাছে আমি পাণ্ডুর নাম শুনেছি। আমার বাবা বহুদিন আসামে ছিলেন। তখন সরাইঘাট পুল তৈরি হয়নি। ওপারে আমিনগাঁও পর্যন্ত রেল আসত। সেখানে নেমে যাত্রীরা ফেরি স্টিমারে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে পাণ্ডু পৌছতেন। পাণ্ডুতে এসে আবার রেলের সওয়ার হতেন। সেই রেলগাড়ি যাত্রীদের নিয়ে যেত গৌহাটি হয়ে ডিব্রুগড়। সরাইঘাটে পুল তৈরি হবার পরে তাই পাণ্ডুর প্রয়োজন গেছে ফুরিয়ে। পাণ্ডু এখন একটি অবহেলিত অঞ্চল।

মালিগাঁও ছাড়িয়ে রেল লাইন ডাইনে বাঁক নিয়ে সরাইঘাট পুলের দিকে অগ্রসর হল। আর আমরা খানিকটা এগিয়ে ঝালুকবাড়ি

মোড়ে এলাম। এ টি. রোড এখানে এসে এন. এইচ. থার্টিওয়ান এবং থার্টিসেভেন-এর সঙ্গে মিশে গেল। থার্টিওয়ান সরাইঘাট পুলের ওপর দিয়ে বরপেটা বঙ্গাইগাঁও কোকরাঝাড় হয়ে উত্তরবঙ্গের দিকে চলে গিয়েছে। আমরাও আপাতত ঐ পথের যাত্রী।

গৌহাটি শহরকে বাঁয়ে রেখে এন. এইচ. থার্টিসেভেন দিসপুর ও জোড়াবাট হয়ে চলে গিয়েছে নগাঁও, সেখান থেকে জোড়হাট শিবসাগর ডিব্রুগড়, অর্থাৎ আপার আসামে।

জোড়াবাট নগাঁও এবং শিলং পথের সঙ্গম। সেখান থেকে এন. এইচ. ফর্টি প্রসারিত হয়েছে মায়াময় মেঘালয়ে।

ঝালুকবাড়ি মোড়ে গাড়ি থামিয়েই দেখতে পাই উৎপলকে— উৎপল দাস, বরপেটার ছেলে। বীরেশ্বরবাবুর বাড়িতে সেদিন পরিচয় হয়েছিল তার সঙ্গে। সে গুরাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হস্টেলে থাকে। এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়। ওর বড় ইচ্ছে আমার সঙ্গে হাজো যায়। তাই ওকে এই মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছি।

উৎপলের সঙ্গে ডক্টর চৌধুরির পরিচয় করিয়ে দিই। তারপরে জিজ্ঞেস করি—ক্যামেরা এনেছো?

—হ্যাঁ। কিন্তু একটা মুশকিলে পড়ে গেছি। উৎপল উত্তর দেয়।

—কেন? কী হয়েছে?

—এখানে এখনো দোকান খোলেনি। ফিল্ম কিনতে পারিনি।

—পথে পেয়ে যাবে। দিলীপবাবু আশ্বাস দেন—আর হাজোতে তো নিশ্চয়ই পাবে।

অতএব উৎপল নিশ্চিন্ত মনে ডঃ চৌধুরির গাড়িতে ওঠে। আমরা এন. এইচ. থার্টিওয়ান ধরে এগিয়ে চলি।

এখন আমরা সরাইঘাট পুলে উঠছি। ষাটের দশকে তৈরি হয়েছে। নিচে রেল আর ওপরে মোটর যাতায়াতের যৌথ পুল। পুলের ওপর থেকে ব্রহ্মপুত্র কামাখ্যা ও গৌহাটি শহরের দৃশ্য ভারি সুন্দর।

হঠাৎ অশোক জিগেস করে—এ পুলটা তো আমিনগাঁও আর পাণ্ডুর মাঝে, তাহলে এর নাম সরাইঘাট পুল রাখা হল কেন?

দিলীপবাবু বলেন—প্রথম কারণ এ ঘাটের নাম সরাইঘাট। দ্বিতীয় কারণ সরাইঘাটের যুদ্ধ আসামের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। স্বাধীনচেতা আসামের মানুষ সেই যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী মোগলশক্তিকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে আসামে স্বাধীনতার দীপশিখা অনির্বাণ রেখেছিলেন।

—একটু বলুন না সে কথা। অশোক অনুরোধ করে।

—কিন্তু সে যে অনেক কথা কর্নেল। আগেই বলেছি দিলীপবাবু অশোককে 'স্কোয়ার্ডন লিডার' না ডেকে কর্নেল ডাকেন। অর্থাৎ তিনি বৈমানিককে পদাতিকে প্রমোশন দিয়েছেন।

—তা হোক্ গে। আপনি বলুন। অশোক দিলীপবাবুকে তাগিদ দেয়।

—কিন্তু সরাইঘাট যুদ্ধের কথা বলতে হলে যে আসামে মোগলদের প্রথম আক্রমণ থেকেই বলতে হয়। সে তো একখানি ছোট মহাভারত হয়ে যাবে।

—না, না, অত দরকার নেই। আপনি শুধু সরাইঘাট যুদ্ধের কথা বলুন।

—কিন্তু সেটা কি ভাল হবে?

—যা হবার হোক্। আপনি বলুন।

—বেশ। দিলীপবাবু শুরু করেন—

—একবার দু-বার নয়, মোগল বাহিনী চোদ্দবার আসাম আক্রমণ করেছে। এর মধ্যে প্রথম বড় আক্রমণ পরিচালনা করেন ঢাকার নবাব, মীর জুমলা, ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে। আওরঙ্গজেব তখন দিল্লির সম্রাট। অহোমরাজ স্বর্গদেব জয়ধ্বজ সিংহ সেবারে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সন্ধির সর্ত অনুযায়ী গৌহাটি-সহ সমগ্র নামনি অসম বা লোয়ার আসাম মোগলদের দিয়ে দিতে হয়। ভগ্নহৃদয় জয়ধ্বজ ১৬৬৩ সালে প্রাণত্যাগ করেন। পুত্র স্বর্গদেব চক্রধ্বজ সিংহ

অহোম সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

চক্রধ্বজ ছিলেন দেশপ্রেমিক ও বীর। সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকেই তিনি শক্তি সঞ্চয় শুরু করে দিলেন। সে যুগের সবচেয়ে সাহসী ও কুশলী বীর লাছিত বরফুকণকে তিনি প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করলেন। তাছাড়া তাঁর মহামন্ত্রী আতন বুঢ়াগোঁহাই ছিলেন সৎ সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ দেশপ্রেমিক।

সুযোগ বুঝে লাছিত একদিন তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে গৌহাটি ও ও ইটাখালির মোগল দুর্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা মোগলবাহিনী আত্মসমর্পণ করল। মোগল ফৌজদার ফিরোজ খাঁ এবং সিপাহসলার সৈয়দ ছানাকে বন্দী করে সেনাপতি লাছিত অহোমরাজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এই শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদে অহঙ্কারী আওরঙ্গজেব খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি সেনাপতি রাজা রাম সিংহের নেতৃত্বে একলক্ষ সৈন্য, দশ হাজার শিকারী কুকুর, কয়েক হাজার ঘোড়া, প্রচুর হাতি ও যুদ্ধ জাহাজ এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আসাম জয় করতে পাঠালেন। প্রাক্তন ফৌজদার রসিদ খাঁকেও রাম সিংহের সঙ্গে দিলেন। সেই সঙ্গে আদেশ করলেন তিন মাসের মধ্যে অহোমরাজ চক্রধ্বজ ও সেনাপতি লাছিতকে জীবিত অথবা মৃত হাজির করতে হবে তাঁর সামনে।

বরফুকণ ও বুঢ়াগোঁহাই যথাসময়ে সব সংবাদ পেলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন রাম সিংহ প্রথমে আসামের প্রধান মোগলঘাঁটি হাজো আসবেন। তারপরে তাঁর সেনাবাহিনীকে দু-ভাগে ভাগ করে অহোম-ভূখণ্ডে সাঁড়াশি অভিযান চালাবেন।

লাছিত স্থির করলেন, তার আগেই শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। কিন্তু প্রথমেই কোন বড় যুদ্ধ নয়। আসামের অসম ভূ-প্রকৃতি, তার নদি-নালা পাহাড় ও জঙ্গলের সুবিধে নিয়ে শত্রুকে গরিলা যুদ্ধে ব্যতিবস্ত করে রাখতে হবে আগামী বর্ষাকাল পর্যন্ত। আর তাই তিনি এক রাতের মধ্যে আমিনগাঁওতে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করে ফেললেন। এই দুর্গই ইতিহাসখ্যাত 'মোমাই কটা গড়'।

প্রতিদিনের গরিলা হানায় মোগলদের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হতে থাকল। কিছুদিনের মধ্যে অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠল যে রাম সিং বাধ্য হয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন লাছিতের কাছে। সেই সঙ্গে তিনি দূতের কাছে লাছিতের জন্য একছড়া দামী মুক্তোর হার দিয়ে দিলেন।

উপহার প্রত্যাখ্যান করলেন অহোম সেনাপতি। তিনি রাম সিংহের দূতকে বললেন—পররাজ্যলোলুপ সম্রাটের দেওয়া এই হার মোগলের বেতনভোগী দেশদ্রোহীদের গলাতেই শুধু শোভা পায়। এ হার কোন স্বাধীন দেশের মুক্তিকামী সেনাপতির গ্রহণযোগ্য নয়। আশাকরি প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে যখন আমার সঙ্গে আপনাদের সেনাপতির দেখা হবে, তখন তাঁর গলায় এই হার শোভা পাবে।

জাতির এই সঙ্কটময় মুহূর্তে অকস্মাৎ অহোমরাজ স্বর্গদেব চক্রধ্বজ সিংহ অকালে দেহরক্ষা করলেন। বরফুকণ বড়ই ভেঙে পড়লেন। তাঁর শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু বুঢ়াগোঁহাই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—প্রয়াত স্বর্গদেবের আত্মার শান্তির জন্য তাঁর স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে হবে। আপনি ভেঙে পড়লে যে প্রয়াত স্বর্গদেবের স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে যাবে।···

মহামন্ত্রীর কথায় মহাসেনাপতি আবার কর্তব্য-সচেতন হয়ে উঠলেন। শারীরিক অসুস্থতাকে অবহেলা করে দেশমাতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন তিনি।

এদিকে রাম সিংহ আমিনগাঁও দুর্গ তৈরির সংবাদ পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এই দুর্গটি অধিকার করতে পারলে উত্তর-ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় অহোমশক্তি নির্মূল হয়ে যাবে। তিনি প্রবল শক্তি নিয়ে মোমাই কটা গড় আক্রমণ করলেন।

কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল না। মহাসেনাপতির পরিকল্পনা আর দেশপ্রেমিক অহোমদের বীরত্বের কাছে রাম সিংহকে হার মানতে হল। বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তাঁর সেনাবাহিনীকে ফিরে আসতে হল।

বাধ্য হয়ে রাম সিংহকে সর্বাত্মক স্থলযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল। সে যুদ্ধের প্রথমদিকে অহোমরা কিছু কোণঠাসা হয়ে পড়লেও বরফুকণের পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে উঠল। দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ বীরবৃন্দের কাছে বিদেশী ভাড়াটিয়া সৈনিকরা প্রতি রণক্ষেত্রেই পর্যুদস্ত হতে থাকলেন।

রাম সিং বুঝতে পারলেন লাছিত বরফুকণের সুযোগ্য পরিচালনায় তাঁর সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হবার মুখে। আশাহত মোগল সেনাপতি তখন নৌ-যুদ্ধের সাহায্যে অহোমদের শেষ আঘাত করতে চাইলেন।

এবারেও মোগলরা কিছু প্রাথমিক সাফল্য লাভ করলেন। অশ্বক্লান্ত ঘাঁটির অহোম নৌ-সেনাপতি বিপদ বুঝে বরফুকণের কাছে আরও কিছু সৈন্য ও রসদ চেয়ে পাঠালেন।

শয্যাশায়ী ও অসুস্থ মহাসেনাপতি বলে পাঠালেন—প্রাণের বিনিময়ে দেশ। এর বেশি আর কিছু দেবার সাধ্য নেই আমার।

কিন্তু প্রাণের বিনিময়েও অহোম বীরগণ নৌঘাঁটি রক্ষা করতে পারছিলেন না। বরফুকণ সংবাদ পেলেন, অশ্বক্লান্ত প্রায় পতনের মুখে।

দুঃসংবাদ পেয়ে অসুস্থ সেনানায়ক আর শুয়ে থাকতে পারলেন না। বললেন—আমাকে জাহাজে তুলে দাও। আমি যাবো সেখানে।

জ্যোতিষী অচ্যুতানন্দ বাধা দিলেন। বললেন—আপনি মহাসেনাপতি। আপনি যে মুহূর্তে যুদ্ধে যোগদান করবেন, সেই মুহূর্ত থেকেই প্রকৃত মহাসমর শুরু হয়ে যাবে। এখনো সেই শুভ-সময় আসেনি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

কথাটা পছন্দ না হলেও সেনাপতিকে আবার শয্যাগ্রহণ করতে হল। অচ্যুতানন্দ আপনমনে গণনা করতে থাকলেন। এবং কিছুক্ষণ পরেই চিৎকার করে উঠলেন—আপনার যুদ্ধে যোগ দেবার শুভসময় সমাগত। এই শুভক্ষণেই শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে চরম আঘাত হেনে-ছিলেন।

শারীরিক অসুস্থতার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে লাছিত যুদ্ধজাহাজে

আরোহণ করলেন। জাহাজের একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে চোঙা মুখে দিয়ে তিনি ক্রমাগত ঘোষণা করতে থাকলেন—প্রিয় অহোম-বীরগণ, তোমরা দেহের সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুকে আঘাত করো। দেখিয়ে দাও যে আমরা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাতৃভক্ত জাতি। আমি বলছি, তোমরা শৌর্য ও বীর্যে অপরাজেয়। মনে রেখো, প্রাণ থাকতে পশ্চাদপসরণ নয়। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।...

শুরু হল সরাইঘাটের ঐতিহাসিক যুদ্ধ। কামাখ্যা অশ্বক্লান্ত ও ইটাখুলির মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের প্রতি স্থানে প্রবল যুদ্ধ। অসুস্থ সেনা-নায়কের স্বয়ং উপস্থিতি অহোম সেনানীদের মনে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কাজ করল। তাঁদের আক্রমণে মোগলদের নাভিশ্বাস উঠল। নিহত হলেন মোগল সেনাপতি শরিফ খাঁ। বন্দী হলেন তার সহযোগী মীর নবাব।

সেনাপতি রাম সিংহ বুঝতে পারলেন, সম্রাটের আদেশ পালন করা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। সেই সঙ্গে তিনি জানতেন আওরঙ্গ-জেবের অভিধানে 'ক্ষমা' শব্দটির কোন স্থান নেই। তবু অবশিষ্ট সৈন্যদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে তাঁকে পিছু হটতে হল। সরাইঘাট ছেড়ে রওনা হলেন হাজো। বিদায়বেলায় সহনায়ক রসিদ খাঁকে বললেন—সারাজীবন যুদ্ধ করে কাটালাম কিন্তু এমন দেশভক্ত সেনাবাহিনী আর এমন বিচক্ষণ ও কুশলী সেনাপতি আমি কখনও দেখিনি।

জয় স্বর্গদেব উদয়াদিত্যের জয়, মহানায়ক লাছিত বরফুকণের জয়, মহামন্ত্রী আতন বুঢ়াগোঁহাইয়ের জয়। জয়, জয় আর জয়। অহোম-জাতির জয়। শুধু সরাইঘাট নয়, সারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সেই জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠল।

কিন্তু সে জয়গান বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। কারণ জয়ের নায়ক ক্লান্ত ও দুর্বল লাছিতের ভগ্নশরীর এই উত্তেজনা সইতে পারল না। তিনি একবার তাঁর পরমারাধ্যা দেশমাতৃকার উদ্দেশে 'মা' বলে সম্বোধন করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সরাইঘাটের সঙ্গে সেনাপতি লাছিত বরফুকণও আসামের গৌরবময় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে রইলেন।

॥ দশ ॥

সংসারে সবাই আমরা একসঙ্গে সবটুকু পেতে চাই। পাওয়া সম্ভব নয় জেনেও না-পাওয়ার জন্য আফসোস করি। কিছু না ছাড়লে যে কিছু পাওয়া যায় না, এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হই। আর তারই ফলে সংসারে এত অশান্তি।

আধুনিক সরাইঘাট পুলের ওপর দিয়ে ঐতিহাসিক সরাইঘাট পার হয়ে এসেছি। সেকালের কথা শুনতে শুনতে একালের পুলের দিকে নজর দিতে পারিনি। দেখা হয়নি উমানন্দ অশ্বক্রান্ত কামাখ্যা আর গুয়াহাটীর অপরূপ রূপ।

হাজো দর্শনে চলেছি। যেতে যেতে দিলীপবাবুর কাছ থেকে সরাইঘাটের কিছু ইতিহাস শোনা গেল। এটি বাড়তি পাওনা। অতএব আফসোস না করে এবারে পথের দিকে তাকানো যাক।

ড্রাইভার জালাল পথ পরিবর্তন করে। জাতীয় সড়ক ছেড়ে বাঁদিকের পথ। এতক্ষণ উত্তরে চলেছিলাম, এবারে উত্তর-পশ্চিমে।

দিলীপবাবু বলেন—আমরা চৌত্রিশ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে দিয়ে স্টেট হাইওয়ে ধরলাম। চৌত্রিশ নম্বর সোজা বরপেটা হয়ে বঙ্গাইগাঁও কোকরাঝাড় চলে গেল। আমাদের এ পথটাও হাজো হয়ে বরপেটা গিয়েছে।

এখন সকাল সাড়ে ন'টা। তার মানে আমবাড়ি থেকে এখানে আসতে আধঘণ্টার মতো সময় লেগেছে।

আমাদের বাঁয়ে ব্রহ্মপুত্র। বর্ষার ঢল নেমেছে তার সারা অঙ্গে। সে শিবের করুণাবারি নিয়ে ধেয়ে চলেছে দুর্বার বেগে। ডাইনে সবুজ পাহাড়। তারই একটা পাথুরে দেওয়াল একেবারে পথের ধারে এসে হাজির হয়েছে।

সেখানে এসেই গাড়ি থামিয়ে দিল জালাল। শুধু আমরা নই,

সামনে দেখছি ড. চৌধুরির গাড়ি। ওঁরাও গাড়ি থেকে নামছেন।

দিলীপবাবু বলে—চলুন, নেমে একবার দর্শন করে নেওয়া যাক।

—কাকে? বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করি।

—সিদ্ধিদাতা গণেশজিকে। অতএব নেমে আসি গাড়ি থেকে। ইতিমধ্যে উৎপলরা পৌঁছে গিয়েছে মন্দিরের সামনে। আমরাও এগিয়ে চলি।

সেই খাড়া পাথরখানির খানিকটা অংশ জুড়ে মন্দির. পথ থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে। দু-দিকে ইটের দেওয়াল আর পেছনে সেই পাথর। পাথর খোদাই করেই গণপতির মূর্তি, প্রকাণ্ড মূর্তি। তবে ভক্তদের তেল-সিঁদুরে আর পাথর বলে বোঝা যাচ্ছে না। মন্দিরের সামনের দিক খোলা। ওপরে টিনের চাল।

এখানে গণেশের নাম বিঘ্নেশ্বর। কেবল এখানে নয়, গণপতি গজানন সর্বত্রই বিঘ্নবিনাশন সিদ্ধিদাতা তাই আমাদের সঙ্গে জালালও তাঁর করুণা কামনা করে, নিরাপদ ও আনন্দময় যাত্রার জন্য সিদ্ধি-দাতার দোয়া।

ফিরে আসি গাড়িতে। গাড়ি এগিয়ে চলে। পাহাড়টা খানিকটা দূরে সরে গেছে, ব্রহ্মপুত্রও তাই। পথের দু-পাশেই সবুজ-সজল খেত, আর স্বপ্নের মতো সুন্দর সুন্দর গ্রাম। সেই কাঠ বাঁশ আর টিনের ঘর। সেই নারকেল-সুপারির সারি। জলে ভরা খাল-বিল আর নদী-নালা। চাষীরা খেতে কাজ করছে, মেয়েরা বাড়িতে। মোটর সাইকেলের সঙ্গে হেলে-দুলে গরুর গাড়িও পথ চলেছে।

—বাঁদিকের এই পথটা সুয়ালকুচি গ্রামে চলে গেল। এখান থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার।

—এত কাছে! অশোকের স্বরে বিস্ময়।

—হ্যাঁ। যাবার সময় দিনের আলো থাকলে, একবার ঘুরে যাবো।

—খুব ভাল হয় তাহলে। আচ্ছা, সুয়ালকুচিতে কি কেবল 'এণ্ডি' কাপড় বোনা হয়?

—না না। এগুলি মুগা ও পাটের কাপড়। রেশমের প্রায় সব রকমের বয়নের জন্যই সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে এ গ্রামটির খ্যাতি আজও অক্ষুণ্ণ। গ্রামের সব বাড়িতেই তাঁত রয়েছে এবং বালক-বালিকা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত প্রত্যেকেই তাঁত বুনতে জানেন।

—কথাটা অবশ্য শুধু সুয়ালকুচির ক্ষেত্রে নয়, সারা আসামের পক্ষেই সমান সত্য। সুয়ালকুচির বৈশিষ্ট্য, সেখানে শুধুই মূল্যবান রেশম বস্ত্র তৈরি হয়।

দিলীপবাবু মাথা নেড়ে আমার মন্তব্যে সায় দেন। তারপরে বলেন—কেবল তাঁত নয়, কুটির শিল্পের প্রতি আসামের মানুষের একটা সহজাত আকর্ষণ রয়েছে।

একটা কাঠের পুলের ওপর দিয়ে নদী পার হয়ে এলাম। কাঠের পুলটি পুরনো হয়ে গিয়েছে, এটা স্টেট হাইওয়ে। তাই পাশে কংক্রিটের নতুন পুল তৈরি হচ্ছে।

পুল পার হয়ে একটা গ্রাম। দিলীপবাবু বলেন—এটি বেশ বড় গ্রাম, নাম কুলহাটি।

এর পরেই হাজো। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরে কামরূপ সদর মহকুমায় একটি ছোট শহর। দূরত্ব গুয়াহাটী থেকে ২০ কিলোমিটার। মহকুমার একটি রেভিন্যু সার্কেলের হেড-কোয়ার্টার্স হাজো। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী হাজো টাউন কমিটি অঞ্চলের জনসংখ্যা ১২,৭৮১ জন। শহরটি খুব তাড়াতাড়ি বড় এবং উন্নত হয়ে উঠছে।

হাজো যেমন মন্দির ও মসজিদের জন্য সুপ্রসিদ্ধ, তেমনি কুটির-শিল্পের জন্যও সুপরিচিত। এখানকার পেতল, কাঁসা ও তাঁত শিল্পের খ্যাতি বহুকালের।

বেলা ঠিক দশটার সময় হাজোর শ্রীহয়গ্রীবমাধব মন্দির চত্বরে এসে থামল আমাদের গাড়ি। আমবাড়ি থেকে এই ২২ কিলোমিটার পথ আসতে আমাদের এক ঘণ্টার মতো সময় লাগল।

মন্দির চত্বরের দুপাশে ধর্মশালা আর দোকানের সারি। আর সামনে চারিদিক খোলা একখানি চৌচালা টিনের ঘর, অনেকটা

নাট-মন্দিরের মতো। তার বাঁদিকে পাহাড় আর ডানদিকে খানিকটা দূরে এক সুবিশাল সরোবর।

ড. চৌধুরি বলেন—মাধবপুখুরি। মন্দির দর্শন করে আমরা ঐ ঘাটে গিয়ে দাঁড়াবো। দেখবেন অসংখ্য বড় বড় মাছ আর কচ্ছপ।

দিলীপবাবু গতকালই আমাদের আসার কথা জানিয়ে দিয়েছেন এখানে। তাই বোধকরি কয়েকজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন নাট-মন্দিরে। গাড়ি থামতেই তাঁরা এগিয়ে আসেন কাছে। হাতজোড় করে নমস্কার করেন। আমরাও গাড়ি থেকে নেমে প্রতিনমস্কার করি।

জনৈক প্রবীণ বলেন—আমার নাম প্রিয়নাথ শর্মা। আর এরা দুজন হল প্রসন্ন ও দীপেন ভগবতী। আমরা পুরুষানুক্রমে শ্রীহয়গ্রীবমাধব মন্দিরের পূজারী।

—আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হলাম। দিলীপবাবু বলেন—চলুন, এবারে মন্দিরে যাওয়া যাক।

শর্মাজিদের সঙ্গে সেই নাট-মন্দিরে প্রবেশ করি। বাঁদিকের পাহাড়টি দেখিয়ে শর্মাজি বলেন—ঐ ওপরে শ্রীশ্রীহয়গ্রীবমাধবজীর মন্দির। পাহাড়টির আনুমানিক উচ্চতা ১০০ ফুট। ৯৩ খানি সিঁড়ি বেয়ে প্রায় ৩০০ ফুট চড়াই ভেঙে পৌঁছতে হবে ঐ মন্দিরে।

—মামু তো তাহলে যেতে পারবেন না। অশোক বলে ওঠে।

দিলীপবাবু আমার দিকে তাকান।

একটু হেসে অশোককে বলি—আমাকে কিন্তু ডাক্তার সিঁড়ি ভাঙতে নিষেধ করেননি, তবে আস্তে আস্তে ভাঙতে বলেছেন।...

আমি থামতেই অশোক যেন কি একটা বলতে চাইছিল। কিন্তু তাকে বলতে না দিয়েই আমি আবার বলি—এতদূর এসে দেবদর্শন না করে ফিরে যাবো। তুমি ভয় পেয়ো না, আমি ঠিক আস্তে আস্তে ওপরে চলে যাবো। তোমরা তোমাদের মতো উঠে যাও, আমি আমার মতো আসছি।

—তার কী দরকার? চলুন, আমরাও আপনার মতো করে ধীরে ধীরে উঠছি, আর সেই অবসরে ড. চৌধুরির কাছ থেকে এই

পুণ্যস্থানের কিছু ইতিহাস শুনে নেওয়া যাবে। দিলীপবাবু বলেন।

ড. চৌধুরি আপত্তি করেন না, তিনি চলতে চলতে বলতে থাকেন —কামরূপ জেলায় মহানদ ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপারে অবস্থিত এই পুণ্যভূমি হাজো অসমের ঐতিহ্যমণ্ডিত তীর্থসমূহের অন্যতম। আমাদের মহাকাব্য ও পুরাণে এই পুণ্যতীর্থের প্রচুর উল্লেখ রয়েছে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণে হাজোকে বলা হয়েছে মণিকূট। একাদশ শতকের কালিকাপুরাণে হাজোর নাম অপুনর্ভব ও মণিকূট। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবিগণ কিন্তু হাজো বলেই উল্লেখ করেছেন। অষ্টাদশ শতকের দরঙ্গ রাজবংশাবলীতে হাজোকে মণিকূট গ্রাম বলা হয়েছে। কিন্তু অহোম রাজাদের বুরুঞ্জী বা রাজবংশের ইতিহাসে আগাগোড়া বলা হয়েছে হাজো। ষোড়শ শতকের যোগিনীতন্ত্রেও অপুনর্ভব তবে সেই সঙ্গে বিষ্ণুপুষ্কর। সপ্তদশ শতকে হাজোতে মোগলরা মস্ত ঘাঁটি তৈরি করেন। তাঁরা এই জনপদের নাম দিয়েছিলেন শুজাবাদ বা সুজানগর। কিন্তু সে নাম প্রচলিত হয়নি।

কথা বলতে বলতে আমরা প্রায় অর্ধেকটা পথ পার হয়ে এসেছি। অতএব একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত হবে। আমি সিঁড়ির ওপরে বসে পড়ি। ওঁরাও কেউ বসেন, কেউবা দাঁড়িয়ে থাকেন। উৎপল ছবি নেয়। আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে চারিদিক দেখি।

কী বলব? অমরাবতী আসাম, অলকাপুরী আসাম কিম্বা অপরূপা আসাম। আমার দু-পাশের বনময় পাহাড়, সামনে সবুজ সমতল আর স্বচ্ছ জলাশয়। মাধবপুখুরি আর তার তীরের গাছপালা, বাড়ি-ঘর। আসাম সত্যই অপরূপা। তাছাড়া নিচে সিঁড়ির দু-পাশে দুটি মঠাকৃতি স্তম্ভ এবং নাট-মন্দিরের লাল চৌচালাটি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে।

কিন্তু অলকাপুরীর রূপ আস্বাদনের সময় এটা নয়। সহযাত্রীরা অপেক্ষা করছেন, আমি তাঁদের দেরি করিয়ে দিচ্ছি। ওঁরা হয়তো বিরক্ত বোধ করছেন। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। সিঁড়ি ভাঙতে

শুরু করি। পাথরের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড সিঁড়ি, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। অনেক ধাপের কোনায় কোনায় ঘাস গজিয়েছে। সিঁড়ির দু-পাশে কোমর সমান উঁচু দেওয়াল—রেলিং। সব কিছুই বেশ শক্ত-পোক্ত। আর তাই তো প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাক আর ধর্মবিদ্বেষীদের সকল আঘাত সয়ে আজও সে অক্ষত। শত শত বছরের লক্ষ লক্ষ ভক্তের পদরেণু-রঞ্জিত সোপানসমূহকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চলি।

ড. চৌধুরি আবার বলতে শুরু করেন—হাজো নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। যেমন একদা নাকি কয়েকজন মুনি এখানে বসে যোগ-সাধনা করছিলেন। কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারার আগেই তাঁরা যোগভ্রষ্ট হলেন। যোগব্যর্থ মুনিগণ তাই সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন 'হত যোগ' 'হত যোগ'। তাঁদের সেই আর্তচিৎকার থেকেই এই সাধনভূমির নাম হয়ে গেল হাজো।

আরেকটি জনশ্রুতি হল, বুদ্ধদেব এই পুণ্যভূমিতেই মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন। তাঁর আকস্মিক মহাপ্রয়াণের পরে দিশাহারা শিষ্যগণ বলতে থাকলেন 'হঅ-জু' বা 'হা-জু'। অর্থাৎ সূর্য গেল অস্তাচলে। তাঁদের সেই শোকধ্বনি থেকেই এই পুণ্যভূমির নাম হয়েছে হাজো।

আরেকটি জনশ্রুতি হল, পীর গিয়াসুদ্দিন আউলিয়া পাশের পাহাড়ের ওপরে যে মসজিদ নির্মাণ করেন, পরবর্তীকালে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ সেটিকে পোয়া মক্কা বা মক্কার এক-চতুর্থাংশ পুণ্যক্ষেত্র বলে স্বীকৃতি দান করেছেন। সেই থেকে যাঁরা মক্কাশরিফে হজ করতে যেতে পারেন না, তাঁরা এখানে এসে হজ করে যান। হজভূমি বলে এই পবিত্র তীর্থের নাম হয়েছে হাজো।

চৌধুরি সাহেব থামলেন একবার। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলতে পারার আগেই তিনি আবার শুরু করেন—তবে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য জনশ্রুতিটি হল, পঞ্চদশ শতকে 'হজ' বা 'হাজু' নামে

জনৈক অধিপতির রাজধানী ছিল এখানে। তাঁর নাম থেকেই এ জায়গাটার নাম হাজো।

ষোড়শ শতকে হাজো কোচরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান কররাণির (১৫৬৩-১৫৭২ খ্রি:) সেনাপতি কালাপাহাড় কোচরাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি এ অঞ্চলের সমস্ত হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেন। বলা বাহুল্য হিন্দুতীর্থ ধ্বংস করাই তাঁর সে আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কারণ বিজিত অঞ্চল শাসন করবার কোন ব্যবস্থা না করেই তিনি গৌড়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

১৫৮৩ সালে কোচরাজ রঘুদেবনারায়ণ (১৫৮১-১৬০৩ খ্রি:) কালাপাহাড়ের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়গ্রীবমাধব মন্দির পুনরায় নির্মাণ করে দিলেন। তাঁর আমলেই হাজো স্বাধীন রাজ্যরূপে স্বীকৃত হয়। ঐতিহাসিকগণ সেই রাজ্যের নাম দিয়েছেন 'কোচ-হাজো'। একালের গোয়ালপাড়া জেলা, উত্তর-কামরূপ ও দরঙ জেলার অনেকখানি অংশ নিয়ে ছিল সেকালের কোচ-হাজো রাজ্য।...

যাক্‌গে, বাকি ইতিহাস পরে আলোচনা করা যাবে, এখন আসুন, মন্দির দর্শন করে নেওয়া যাক। আমরা সিঁড়ি ভেঙে মন্দির তোরণে পৌঁছে গিয়েছি।

চৌধুরি সাহেব চুপ করতেই দেখি, সত্যই তাই। আমরা সবাই তোরণে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে লেখা—শ্রীশ্রীহয়গ্রীবমাধব দেবালয়।'

ইটের তৈরি তোরণ। চার শ' দশ বছর আগে তৈরি মন্দির তোরণ প্রায় অক্ষত। অনুমান করি মাঝে মাঝে সংস্কারসাধন করা হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এখান থেকে চারিপাশের দৃশ্য আরও বেশি সুন্দর।

উৎপল ছবি নেয়। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। আমাদের পায়ের কাছ থেকে সিঁড়ির ধাপগুলো ধীরে ধীরে নেমে গিয়েছে নাটমন্দিরের সামনে। সিঁড়ির দু-পাশে দেওয়াল দুটিকেও ভারি সুন্দর লাগছে। ওরা নিজেরাই শুধু সুন্দর নয়, সোপানসারির সৌন্দর্যও তুলেছে বাড়িয়ে।

সিঁড়ির শেষে দুদিকের মঠাকৃতি স্তম্ভদুটি, নাট-মন্দির আর মাধবপুখুরি, সবারই সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। মাধব-পুখুরির ওপারে নারকেল আর সুপারি বাগানের মাঝে বাড়িগুলোকে তো স্বপ্নপুরী বলে মনে হচ্ছে এখান থেকে।

তবে সব সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে উঠেছে সবুজ। আসামে সর্বত্রই সবুজের জয়—সবার উপরে সবুজ সত্য তাহার উপরে নাই। আমাদের দুদিক থেকে যে সবুজ সামনে বিস্তৃত, তা গিয়ে শেষ হয়েছে ঐ সুদূর দিগন্তে, একেবারে নীল আকাশের কোলে। সবুজ ছাড়া বুঝিবা আর কোন রঙ নেই অলকাপুরী আসামে।

শর্মাজি বলেন—একটা পাহাড়ের মাথাকে সমতল করে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই মন্দির এলাকা। সেকালে এ পাহাড়টিও ছিল কামাখ্যা পাহাড়ের মতো ব্রহ্মপুত্রের তীরে। ১৮৯৭ সালের সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পরে ব্রহ্মপুত্র তার গতিপথ পরিবর্তন করে অনেকখানি দক্ষিণে সরে গিয়েছে।

শুনেছি কোচ কিম্বা অহোম রাজাদের যিনি যখুনি এ অঞ্চলের অধিপতি হয়েছেন, তিনিই এই পবিত্র ক্ষেত্র এবং মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নশীল হয়েছেন। ফলে সেকালে এটি আসামের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী মন্দির ছিল। বিভিন্ন রাজাদের আনুকূল্যে উত্তর-কামরূপ জেলার বিশটি মৌজায় এই মন্দিরের ৫৪,৪৪১ বিঘা জমি এবং প্রচুর অলঙ্কার ও বাসনপত্র ছিল। বলা বাহুল্য দেশ স্বাধীন হবার পরে সরকার সেসব ভূসম্পত্তি অধিগ্রহণ করে মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

শর্মাজির সঙ্গী দীপেনবাবু বলেন—চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।

—হ্যাঁ, চলো। শর্মাজি বলেন।

আমরা তোরণ ছাড়িয়ে ভেতরে আসি। সুপ্রশস্ত বাঁধানো অঙ্গন। শুধু বাঁধানো বললে কম বলা হবে। মসৃণ পাথর বসানো চমৎকার ঝকঝকে সুবিশাল আঙ্গিনা। তারই পাশে পাশে হয়গ্রীবমাধব এবং অন্যান্য মন্দির। এ আঙ্গিনাটিও যে পরবর্তীকালে নির্মিত তা বেশ

বোঝা যাচ্ছে।

—আচ্ছা, হয়গ্রীব মানে তো ঘোড়ার মতো গ্রীবাযুক্ত? অনেকক্ষণ পরে অশোক কথা বলে।

শর্মাজির সঙ্গী দীপেনবাবু মাথা নেড়ে বলেন—হ্যাঁ। তবে আমরা বলি, 'হয়' মানে ঘোড়া, 'গ্রীব' মানে গলা, 'মা' মানে লক্ষ্মী আর 'ধব' মানে পতি।

—তাহলে সব মিলিয়ে কি মানে হল?

এবারে শর্মাজির অপর সঙ্গী প্রসন্নবাবু উত্তর দেন—নারায়ণ এখানে হয়গ্রীবের রূপ নিয়ে হয়াসুর দৈত্যকে বিনাশ করেছেন।

এঁরা তিনজনই অসমীয়া এবং ডক্টর চৌধুরির মতো সুপণ্ডিত নন, তবু এতো সুন্দর বাংলা বলছেন যে আমাদের বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আগেই বলেছি শিক্ষিত অসমীয়ারা প্রায় প্রত্যেকেই নির্ভুল বাংলা বলতে পারেন। আমার তাই আসামে এসে কখনই মনে হয় না যে আমি বাংলার বাইরে এসেছি। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ভাষা নিয়ে আসামে কোন বিরোধ নেই। একদল সুযোগসন্ধানী ভাষাকে হাতিয়ার করে কৃত্রিম বিরোধ বাধিয়ে মুনাফা লুটতে চাইছে।

শর্মাজির কথায় ভাষার ভাবনা থেমে যায়। শর্মাজি বলেন—দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণে ঔর্বমুনি এখানে এসে বাসুদেবের মূর্তির সামনে বিষ্ণুর তপস্যায় ব্রতী হন। তখন এই অঞ্চল হয়াসুরের রাজ্য। রাজা মুনির তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে থাকলেন।

হয়াসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুনি ভগবানের করুণা প্রার্থনা করলেন। বিষ্ণু ভগবান তখন হয়গ্রীবের রূপ নিয়ে হয়াসুরকে বধ করেন। মৃত্যুকালে হয়াসুর ভগবানের শরণ নিলেন। তাই ভগবান এখানে শ্রীহয়গ্রীবমাধব রূপে চিরবিরাজমান।

কথাটা বলা বোধকরি উচিত হবে না, কিন্তু ভাবতে বাধা নেই। শর্মাজি বললেন, দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণে। কিন্তু পুরাণে বর্ণিত ভৃগুর পৌত্র ঔর্বমুনি সগররাজার গুরু ছিলেন। তাঁর সাহায্যে

সগর বিভিন্ন বর্বর উপজাতিকে পরাস্ত করেছিলেন। তাহলে ঔর্ব তো ত্রেতাযুগের ঋষি।

কথিত আছে, পিতৃপুরুষের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য ঔর্ব কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। পরে পিতৃপুরুষের অনুরোধে তিনি তাঁর ক্রোধাগ্নিকে সাগরে নিক্ষেপ করেন। সেই আগুন হয়গ্রীব রূপে সাগরে অবস্থান করতে থাকে।

চৌধুরি সাহেবের কথায় আমার ভাবনা শেষ হয়। তিনি বলছেন—চলুন, এবারে মন্দির দর্শন করা যাক। গত চার শ' বছর ধরে এই মন্দিরটি এ অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের হৃৎপিণ্ড হয়ে আছে।

আমরা তাঁর সঙ্গে হাঁটতে থাকি। তিনি বলেন—এই পবিত্র-ক্ষেত্রকে এখনও মণিকূট বলা হয়। সামনের এই বড় মন্দিরটাই শ্রীশ্রীহয়গ্রীবমাধব দেবালয়। রাজা রঘুদেবনারায়ণ এই মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন।

—আচ্ছা, এখানে কোন্ সময়ে প্রথম মন্দির নির্মিত হয়েছিল? অশোক জিজ্ঞেস করে।

—সম্ভবত ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীতে। সে মন্দিরের সামান্য খানিকটা ভিত ও কিছু শিল্পকর্ম এখনও অবশিষ্ট রয়েছে।

—কোথায়?

—চলুন। আগে সেটুকু দেখে নেওয়া যাক।

আমরা মন্দিরদ্বারের দিকে না গিয়ে তোরণের প্রায় সোজাসুজি হেঁটে মূল-মন্দিরের পেছনদিকে আসি। এটিও একটি ছোট মন্দির।

চৌধুরিসাহেব বলেন—অহোমরাজ রাজেশ্বর সিংহ ১৭৬৫ সালে এই মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছেন। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, কোন প্রাচীনতর মন্দিরের ভগ্নাংশের ওপরে এটি নির্মিত হয়েছে। কারণ পাথরের ওপরে খোদাই করা এই হাতির মূর্তিমালা দেখুন। এরা আপনাকে ইলোরার কৈলাস মন্দিরের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। অতএব অনুমান করা হয় সেই পুরনো মন্দিরটি

প্রকৃতপক্ষে একটি বৌদ্ধ-চৈত্য ছিল।

দেখা শেষ হবার পরে আমরা আঙ্গিনা দিয়ে হাঁটতে থাকি। পুরো পুবদিক প্রদক্ষিণ করে মন্দিরের উত্তরদ্বারে আসি।

শর্মাজি বলেন আগে এখানে একটি অশোকস্তম্ভ স্থাপিত ছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরের সঙ্গে সেটিও ভেঙে যায়। তারই কয়েকটি খণ্ড পড়ে রয়েছে এখানে। স্তম্ভের সিংহমূর্তি আমাদের যাদুঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে।

আমরা খণ্ডগুলো দেখি। ভারি মসৃণ পাথর। ভূমিকম্পে ভেঙে গিয়েছে। ভূমিকম্প উত্তর-পূর্ব ভারতের এক শোচনীয় অভিশাপ। গত এক শ' বছরে এ অঞ্চলে এগারোবার ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে। ১০ই জানুয়ারি ১৮৬৯, ১২ই জুন ১৮৯৭, ৩১শে অগাস্ট ১৯০৬, ১২ই ডিসেম্বার ১৯০৮, ৮ই জুলাই ১৯১৮, ৯ই সেপ্টেম্বার ১৯২৫, ২রা জুলাই ১৯৩০, ২৭শে জানুয়ারি ১৯৩১, ২৩শে অক্টোবার ১৯৪৩, ২৯শে জুলাই ১৯৭৭ ও ১৫ই অগাস্ট ১৯৫০। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল ১৮৯৭ ও ১৯৫০ সালের ভূমিকম্প। রিক্টর স্কেলে যাদের তীব্রতা যথাক্রমে ৮.৭ ও ৮.৫। বাকিগুলিও সবই ছিল ৭-এর বেশি।

১৮৯৭ সালের সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে মাত্র এক মিনিটের মধ্যে আসাম ও মেঘালয়ের ৩,৮০,৫০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে সর্বগ্রাসী ধ্বংসলীলা নেমে এসেছিল। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সিলেট, গোয়ালপাড়া, নগাঁও, কামরূপ ও শিলং প্রভৃতি অঞ্চল। সরকারি হিসেবেই ১৬৪২ জন মানুষ মারা গিয়েছেন।

সেই ভূমিকম্পের কথাই বললেন শর্মাজি। কিন্তু থাক্‌গে ভূমিকম্পের ভাবনা। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যেখানে একেবারেই অসহায়, সেখানে আমার ভাবনায় কী এসে যায়? তার চেয়ে হয়গ্রীবমাধব মন্দির দর্শন করা যাক।

সবার সঙ্গে সভামণ্ডপের সামনে আসি। সুবিশাল সভামণ্ডপ। পাথরের মেঝে কিন্তু টিনের চাল আর কাঠের খুঁটি। নিচের দিকে

মিটারখানেক উঁচু ইটের দেওয়াল, লাল রঙ করা। আর ওপরে চারিদিকেই 'গ্রিল্' বা লোহার জাফরি। দরজাটাও গ্রিল্ দিয়েই তৈরি। দরজার ওপরে অসমীয়া, ইংরেজি ও হিন্দিতে লেখা শ্রীহয়গ্রীবমাধব মন্দির। ডানপাশে একটি পৃথক বোর্ডে জুতো খুলে মন্দিরে প্রবেশ করবার নির্দেশ।

মাত্র দু-ধাপ সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে উঠে আসি। শর্মাজি বলেন—আগে এই মণ্ডপও পাথরের বাড়ি ছিল। ভূমিকম্পে ভেঙে যাবার পরে পঁচাত্তর বছর আগে এই টিনের মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে।

সভামণ্ডপ পার হয়ে গর্ভগৃহের সামনে আসি। ছোট দরজা, কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে একটু নিচে নেমে, সরু গলি, সামান্য আলো। গলির শেষে গর্ভগৃহ। অনেকটা কামাখ্যা মন্দিরের মতো।

কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে নামতে পারি না। চৌধুরিসাহেব বাধা দেন। বলেন—আগে এই শিলালিপিখানি দেখে নিন।

তাকিয়ে দেখি মন্দিরের গায়ে প্রকাণ্ড একখানি শিলালিপি।

একটু হেসে অশোক বলে—দেখলাম। কিন্তু কিছুই যে বুঝতে পারলাম না।

সহাস্যে দিলীপবাবু বলেন—বুঝিয়ে দেবার জন্যই তো ড. চৌধুরি আমাদের সঙ্গী হয়েছেন।

আপত্তি না করে চৌধুরি বলতে থাকেন—এতে লেখা রয়েছে যে, 'এই ভূমণ্ডলে বিশ্ব সিংহ নামে একজন রাজা ছিলেন। সর্বশত্রুদমনকারী দিগ্বিজয়ী রাজা মল্লদেব হলেন তাঁর সুযোগ্য সন্তান। চারিত্রিক উৎকর্ষ ও হৃদয়ের বদান্যতায় তিনি খুবই খ্যাতিমান ছিলেন। ধর্মীয় নানা সৎকার্যে তাঁর জীবন হয়েছিল পবিত্র। তাঁর ছোটভাই শুক্লধ্বজ বহু রাজ্য জয় করেছিলেন। তাঁরই পুত্র হলেন রাজা রঘুদেব, রঘুবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি ছিলেন কামরূপের রাজা। কিন্তু তাঁর খ্যাতি রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।···· তিনি দুষ্টকে দমন করতেন। কিন্তু সৎ প্রজাপুঞ্জের দুঃখের আগুন নেভাতে তিনি ছিলেন বর্ষার সজল মেঘের মতো।···ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

পরমভক্ত সেই সুমহান নরপতি ১৫০৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন। সেকালের সবচেয়ে সুদক্ষ বাস্তুশিল্পী শ্রীধর নিজে এই মন্দির তৈরি করেন।'

মন্দিরটি মাটির তলায়। গলি পার হয়ে বাঁদিকে গর্ভগৃহ। সবাই সেখানে এসে দাঁড়ালাম। চারটি সুদৃশ্য স্তম্ভের ওপরে মন্দিরের ছাদ। ঠিক মাঝখানে মসৃণ পাথরের উঁচু বেদি।

বেদির মাঝখানে হয়গ্রীবমাধব। তাঁর বাঁদিকে বুঢ়ামাধব বা গোবিন্দমাধব এবং বাসুদেব। আর ডানদিকে চলন্ত বা দ্বিতীয় মাধব এবং গরুড়।

প্রণাম শেষে উঠে আসি মন্দির থেকে। সভামণ্ডপ পার হয়ে আঙিনায় নেমে আসি। চলতে চলতে দিলীপবাবু বলেন—সুপ্রাচীন কাল থেকে এ মন্দির বৌদ্ধদের কাছে পরমপবিত্র তীর্থ, ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ ক্ষেত্র। তাই শীতকালে সারা পৃথিবী, বিশেষ করে ভুটান থেকে বহু বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী এখানে আসেন। এইমাত্র আমরা যে বিগ্রহ দর্শন করে এলাম, তাঁরা তাঁকেই বলেন বুদ্ধাবতার। বলেন, মহামুনির মূর্তি।

অতএব এই মন্দির হিন্দু ও বৌদ্ধের মিলিত তীর্থ। ধর্মীয় মিলনের মহান মন্দির।

কথা বলতে বলতে আমরা সভামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আসি আঙিনায়। শর্মাজিদের সঙ্গে কয়েক পা হেঁটে কেদারেশ্বর মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াই। কোথায় কেদারনাথ আর কোথায় হাজো। কিন্তু কেদারেশ্বর দু-জায়গাতেই বিরাজমান। এর চেয়ে সংহতির আর কী বড় উদাহরণ হতে পারে?

কিন্তু এখানে আকারহীন শিলারূপী শিব নন, অর্ধনারীশ্বররূপী সুবিশাল লিঙ্গমূর্তি। তাঁর মাথায় পেতলের শিরস্ত্রাণ।

আমরা প্রণাম করি। প্রসন্নবাবু বলেন—কৌলিন্যের বিচারে এটি এই পুণ্যক্ষেত্রের দ্বিতীয় মন্দির।

—কবে তৈরি হয়েছে? অশোক জিজ্ঞেস করে।

দীপেনবাবু উত্তর দেন—বলা মুশকিল। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এখানে এ মন্দির ছিল। তবে ১৭৫৭ সালে রাজা রাজেশ্বর সিংহ মন্দিরদ্বারের দুপাশে এই দেওয়াল দুটি তৈরি করিয়ে দিয়েছেন।

প্রণাম করি। করুণাময় কেদারেশ্বরের করুণা প্রার্থনা করি।

তারপরে আসি কমলেশ্বর বা কামেশ্বর মন্দিরে। এখানেও বেদির ওপরে লিঙ্গমূর্তি।

শর্মাজি বলেন—কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে এ মন্দিরটির বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। সেকালে এটি হাজোর একটি শ্রেষ্ঠ শিবালয় ছিল। আর সে জনপ্রিয়তার কারণ বোধকরি তখন এই মন্দিরেই 'মদন-কাম' পূজার প্রচলন ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এ মন্দির জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছে।

তবুও অষ্টাদশ শতকে রাজা প্রমত্ত সিংহ এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে সে মন্দিরও ধ্বংস হয়ে যায়।

—বর্তমান মন্দিরটি কবে তৈরি হয়েছে? অশোক প্রশ্ন করে।

—এই শতকের তৃতীয় দশকে।

কামেশ্বর মন্দিরের সামনেই গণেশ্বর মন্দির। শিবহীন তীর্থ হয় না। আবার শিবের সঙ্গে গণেশও থাকবেন।

চৌধুরিসাহেব বলেন—হাতির আকারের একখানি প্রকাণ্ড পাথর পড়ে ছিল এখানে। রাজা প্রমত্ত সিংহ ১৭৪৪ সালে সেই পাথর খোদাই করিয়ে এই সুবিশাল গণেশমূর্তিখানি তৈরি করিয়েছেন।

দর্শন করি, প্রণাম করি।

তারপরে এসে দাঁড়াই দুর্গা মন্দিরের সামনে। দেবী দশভুজা, অপরূপা। পাথরের প্রাণময়ী মূর্তি। আমরা প্রণাম করি।

ড. চৌধুরি আবার বলেন—১৭৭৪ সালে রাজা লক্ষ্মী সিংহ এই মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন।

দুর্গামন্দির দেখে দোলগৃহের সামনে আসি—উত্তর আঙিনার শেষ প্রান্তে। আসামের প্রায় সব বড় মন্দিরের সঙ্গেই একটি

দৌলগৃহ থাকে। এটি কিন্তু যেমন বড়, তেমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পাথরের মঠাকৃতি মন্দির। ওপরে শিখর-কলস। সারা গায়ে ছোট-ছোট খোপ। ভেতরে ভারি সুন্দর সুন্দর মূর্তি। আর একেবারে নিচে, ভিতের ওপরে অপূর্ব খোদাই কাজ। শর্মাজি বলেন—১৭৫০ সালে রাজা প্রমত্ত সিংহ এটি তৈরি করে দিয়েছেন।

দর্শন শেষে পুণ্য ক্ষেত্রের পশ্চিম অংশে আসি। নিচে সমতল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা—সজল ও সবুজ উপত্যকা। আগে এই পাহাড়ের তলা দিয়েই বয়ে যেত মহানদ ব্রহ্মপুত্র। তাই স্নানার্থীদের জন্য এদিক থেকেও একটা খাড়া পায়েচলা পথ তৈরি করা হয়েছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। মহানদ সরে গিয়েছে অনেকটা দূরে। কিন্তু সেই পায়েচলা পথটি এখনও রয়ে গেছে। বোধকরি স্নানার্থী ভক্তবৃন্দের পদশব্দের প্রতীক্ষায়।

—চলুন, এবারে মিনি মিউজিয়ামটা দেখে নেওয়া যাক।

আমরা মন্দিরের দক্ষিণদিকে অর্থাৎ মূল-মন্দিরের পেছনে আসি। আঙ্গিনার শেষে এখানে খানকয়েক ঘর রয়েছে। তারই শেষ ঘর-খানিতে ঢুকতে হয়। বেশ বড় ঘর। কাঠ ও টিনের তৈরি, সিমেণ্ট করা মেঝে।

শর্মাজি বলেন—এটা আসলে শ্রীশ্রীহয়গ্রীবমাধবের হোমগৃহ। এরই একপাশে আমাদের যাদুঘর।

ঘরের বাঁদিক জুড়ে হোমকুণ্ড। এখন হোমাগ্নি জ্বলছে না। তবে কিছু পোড়া কাঠ পড়ে আছে। ঘরের বাকি অংশে একটা আলমারি ও কিছু প্রাচীন সংগ্রহ।

ড. চৌধুরি বলেন—এখানে যে ক্ষত ও অক্ষত মূর্তি দেখছেন, সবই হাজোতে পাওয়া গিয়েছে। এগুলো কালাপাহাড়ের আক্রমণে কিম্বা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিচ্যুত হয়েছিল। আমরা সংগ্রহ করে করে এখানে এনে রেখেছি। কিছু অবশ্য গুয়াহাটী মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

একবার থামেন তিনি। তারপরে পড়ে থাকা শিল্প সংগ্রহের

একটিকে দেখিয়ে আবার বলেন—এই দেখুন, অশোকস্তম্ভের সিংহ। কি সুন্দর শিল্পকর্ম। এটি হাজো শিল্পকলার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

তবে এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার ছিল হয়গ্রীবমাধবের সিংহাসন। অপরূপ কারুকার্যময় পাথরের সিংহাসন। তার চারকোণ হাতির দাঁতের হাতিমূর্তি দিয়ে সুসজ্জিত ছিল। কিন্তু সেটি একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল। তার কয়েকটি অংশ কেবল পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো এখানে এনে রাখা হয়েছে। এগুলো থেকেই সেই অপরূপ শিল্পকলার কিছু হদিস পাওয়া যাবে। তবে হাতির দাঁতের হাতিগুলো ঐ আলমারিতে রয়েছে। সেগুলো একটু পরে দেখাচ্ছি।

তার আগে অসমের অপরূপ দারুশিল্পের নিদর্শন এই কাঠের দোলাখানি দেখুন। একেবারে অক্ষত নয়, ভালভাবে সংরক্ষিত তো নয়ই। তাহলেও দেখবার মতো।

দোলা মানে খোলা পালকি। বেশ হালকা। আমরা দেখি। সত্যই ভারি সুন্দর। চৌধুরি আবার বলেন—এই দোলায় করে মন্দিরের বিগ্রহদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত।

দোলা দেখার পরে আমরা একটা সিংহাসন দেখি। এটি তুলনায় অক্ষত। অনেকটা দোল-মঞ্চের মতো।

চৌধুরিসাহেব বলেন—আসুন, এবারে আলমারির জিনিসগুলো দেখা যাক। ওগুলো ছোট অথচ মূল্যবান বলে আলমারিতে রাখা হয়েছে।

—কিন্তু আলমারি তো তালা বন্ধ! অশোক জিজ্ঞেস করে।

মৃদু হেসে ডঃ চৌধুরি তাঁর ব্রিফ্‌কেস খুলে একটা চাবি বের করেন। তারপরে বলেন—এখানকার এই নিদর্শনগুলো আমরাই রক্ষণাবেক্ষণ করি। আমরাই এই আলমারিটা বানিয়ে দিয়েছি। তাই একটা চাবি আমার কাছে থাকে।

আলমারি খুলে প্রথমেই তিনি আমাদের হাতির দাঁতের হাতি-গুলো দেখালেন। তারপরে কিছু পুঁথি। গাছের বল্কলের ওপরে লেখা অনেকগুলো পুঁথি। সবচেয়ে দর্শনীয় একখানি কোরান। হিন্দু

মন্দিরের সংগ্রহশালায় একখানি মুসলমান কোরান সযত্নে সংরক্ষিত।

দেখতে দেখতে আমার স্বামী বিবেকানন্দের সেই বক্তৃতাটি মনে পড়ে গেল। স্বামীজি বলেছিলেন—'সর্বধর্মের প্রসূতিস্বরূপ সনাতন হিন্দুধর্ম···, বলেছিলেন—'আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্য করি না, সব ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি।'

মিনি মিউজিয়াম দেখে বেরিয়ে আসি বাইরে। দিলীপবাবু বলেন—এবারে চলুন, একটু বিশ্রাম নিয়ে লাঞ্চ্ করে নেওয়া যাক্। তারপরে পোয়া মক্কা দর্শন করে গুয়াহাটী ফেরা যাবে।

আমরা মাথা নাড়ি। দিলীপবাবু পাশের সবুজ পাহাড়টা দেখিয়ে আবার বলেন—পোয়া মক্কা মসজিদ ঐ পাহাড়ের ওপরে। এখান থেকে সোজা রাস্তা থাকলে খুব সহজেই যাওয়া যেত। কিন্তু আমাদের যেতে হবে সেই হাইওয়ে ঘুরে। গাড়িতে অবশ্য মিনিট পনেরো সময় লাগবে। আর মসজিদের তলা পর্যন্ত মোটরপথ তৈরি করা হয়েছে। ওখানে এতো সিঁড়ি ভাঙতে হবে না।

মনে মনে শ্রীহয়গ্রীবমাধবজিকে আরেকবার প্রণাম জানিয়ে ফিরে চলি মন্দির তোরণের দিকে। কিন্তু আমি সিঁড়ির কথা ভাবছি না। সিঁড়ি ভেঙে যখন ওপরে উঠতে পেরেছি, তখন সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতেও পারব। আমি ভাবছি হিন্দু-বৌদ্ধ আর মুসলমান ধর্মের কথা। পাশাপাশি দুটি পাহাড়ে মন্দির আর মসজিদ। শুনেছি একই সময় দু-জায়গাতেই উৎসব হয়। একই পথ দিয়ে তিন ধর্মের পুণ্যার্থীরা পাশাপাশি পথ চলেন। তারপরে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই পাহাড়ে আরোহণ করেন। মন্দির ও মসজিদে পৌঁছে আপন ঈশ্বরের কাছে করুণা আর দোয়া প্রার্থনা করেন, শান্তি কামনা করেন। তারপরে শান্ত চিত্তে ঘরে ফিরে যান। ধর্মীয় মিলনের মহাতীর্থ হাজো। হাজো এসে ধন্য হলাম।

॥ এগারো ॥

ভাত-ঘুমের জন্য দেরি হয়ে গেল। কী করব, অসমীয়াদের আতিথেয়তা যে এমনিই হয়। যেমন খাওয়া-দাওয়া, তেমনি আদর-যত্ন। আর তাই রওনা হতে তিনটে বেজে গেল। আজ বোধকরি আর সোয়াল-কুচি যাওয়া হয়ে উঠবে না। আরেকদিন আসতে হবে।

শ্রীহয়গ্রীবমাধবের উদ্দেশে শেষ প্রণাম জানিয়ে শর্মাজিদের কাছ থেকে বিদায় নিই। গাড়ি স্টেট হাইওয়ে-তে আসে। এখন আমরা গুয়াহাটীর দিকেই ফিরে চলেছি। কিন্তু তা কেবল কয়েক মিনিট। তারপরেই জালাল ডানদিকের একটি সরু রাস্তা ধরে। সরু হলেও বাঁধানো। দিলীপবাবু বলেন—এটাই পোয়া-মক্কার পথ।

পথটা পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। লালমাটির পাহাড়। তুলনায় গাছপালা কম। কোথাও কোথাও পাহাড় ধসে মাটি পড়েছে পথে। পিচ উঠে গেছে। উঁচু-নিচু আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে গাড়ি ওপরে উঠছে। জালাল বলে—এ পাহাড়টার নাম গরুড়াচল।

আশ্চর্য, স্বয়ং নারায়ণের বাহনের নামে যে পাহাড়, তারই ওপরে মসজিদ! আর সেকথা সগর্বে স্মরণ করিয়ে দিল জনৈক মুসলমান।

হর্ন দিয়ে-দিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে জালাল। আমাদের গাড়ি ছোট বলে এখন আমরা আগে আগে চলেছি। ড. চৌধুরি পেছনে আসছেন।

পথের অবস্থা তেমন সুবিধের না হলেও, পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য কিন্তু চেয়ে থাকবার মতো। বিশেষ করে নিচের উপত্যকা আর ব্রহ্মপুত্র। বহুক্ষণ বাদে আবার ব্রহ্মপুত্রকে পাশে পাওয়া গেল। আর যতো ওপরে উঠছি, তাকে ততো সুন্দর লাগছে। সীমাহীন সবুজের মাঝে একটি আঁকা-বাঁকা সাদা প্রবাহ। অবিরাম চলেছে বয়ে, অলকাপুরীর অমৃতধারা। তার ক্লান্তি নেই। সে ইতিহাসের সদাজাগ্রত প্রহরী।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সৌন্দর্য অন্তহীন, কিন্তু অনন্ত নয় পোয়া-মক্কার পথ। মাত্র মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম মসজিদের পাদদেশে, অনেকখানি প্রায় সমতল একটা প্রশস্ত প্রান্তরে। পথটা এখানে পৌঁছে প্রান্তরের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে সামান্য খানিকটা চড়াই, তারপরেই দেওয়াল ঘেরা মসজিদ এলাকা। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসি মসজিদ চত্বরে। হয়গ্রীবমাধব মন্দিরের মতো এখানেও পাহাড়ের ওপরটা সমতল করে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। তবে এই এলাকাটি অতো বড় আর অমন মসৃণ পাথর বসানো নয়।

সিঁড়ি পার হয়ে একটি সরু পায়ে চলা চড়াই পথ উঠে গেছে মসজিদে। তারই পাশে পাশে কয়েকটি ছোট ছোট দোকান আর একটি যাত্রীনিবাস। অসম সরকার তৈরি করে দিয়েছেন।

যাত্রীনিবাসকে বাঁয়ে রেখে কয়েক-পা এগিয়েই ডানদিকে মসজিদে ওঠবার সিড়ি। তিনদিকে রেলিং ঘেরা বেশ বড় কংক্রিটের বাড়ি। মিনারটি খুব উঁচু নয়, কিন্তু ভারি সুন্দর। সারা মসজিদেই সাদা রং। সাদা শান্তি ও মৈত্রীর প্রতীক।

প্রধান প্রবেশপথের ওপরে লেখা—

'পোয়া মক্কা দর্গাহ শ্বরীফ।'

আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসি। সহকারিদের সঙ্গে ইমামসাহের সহাস্যে স্বাগত জানান। তাঁর জনৈক সহকারি একখানি মাদুর বিছিয়ে দেন। ইমামসাহেব বসতে অনুরোধ করলেন।

তিনিও আমাদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করেন। তারপরে বলেন—হজরত গিয়াসুদ্দিন আওলিয়ার এই মাজার এক পরমপবিত্র ক্ষেত্র। এই মসজিদ উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীনতম ইসলামি ভজনালয়। সারা বছর ধরেই এখানে তীর্থযাত্রী আসেন তবে উৎসবের সময় হাজার হাজার ভক্ত সমবেত হন।

—উৎসব কখন হয়? উৎপল জিজ্ঞেস করে।

—একই সময়ে।

—কোন্ সময়ে ?

—যখন আপনাদের হয়গ্রীবমাধব মন্দিরে উৎসব, মাঘী-পূর্ণিমা থেকে জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা পর্যন্ত। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে ঐ সময় প্রতি পূর্ণিমাতেই হাজোতে মেলা বসে। হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলমান সকলেই যেমন সে মেলায় অংশ নেন, তেমনি এ মসজিদও দর্শন করেন। তখুনি আমাদের 'উর্‌স' বা উৎসব পালিত হয়। ভক্তরা প্রথম হজরত গিয়াসুদ্দিনের ঐ মাজারে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেন, তারপরে 'ফতিহা' পাঠ ও 'দোয়া' প্রার্থনা করেন। অবশেষে মুসলমান যাত্রিগণ মসজিদে নামাজ পড়েন। উর্‌স-এর সময় সব যাত্রীকেই সিন্নি বিতরণ করা হয়।

—আচ্ছা, আপনারা এই মসজিদকে পোয়া-মক্কা বলেন কেন ? এবারে অশোক প্রশ্ন করে।

ইমামসাহেব উত্তর দেন—কথিত আছে, হজরত গিয়াসুদ্দিন মক্কাশরিফ থেকে একপোয়া মাটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তীর্থ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি সেই একপোয়া মাটি এখানে স্থাপন করেন। তাই এটা পোয়া-মক্কা। এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন এখানে হজ্জ করলে, মক্কাশরিফে হজ্জ করার এক চতুর্থাংশ ফল লাভ করা যায়।

—কবে থেকে এ তীর্থ ? ড. চৌধুরি জিজ্ঞেস করেন।

—নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। কারণ ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে হজরত গিয়াসুদ্দিন আওলিয়া তাব্রিজ শহরে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নাম ছিল জালালুদ্দিন তাব্রিজি।

পঁয়ত্রিশ বছর রাজত্ব করবার পরে তিনি সিংহাসন ও সংসার ত্যাগ করে দরবেশ বা সন্ত হয়ে গেলেন। এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বভ্রমণে বের হলেন। ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে তিনি এখানে এসে উপস্থিত হলেন। জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও স্বর্গীয় শান্তি তাঁকে মুগ্ধ করল। জীবনের বাকি বিশটি

বছর এখানেই অতিবাহিত করলেন। তিনি আসামের আরও কয়েকটি জায়গায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। দেহত্যাগের পরে এখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

থামলেন ইমামসাহেব। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। একটু হেসে তিনি আবার শুরু করেন—আরেকটা মত হল হিজরি ৬৪২ সালে অর্থাৎ ১২২২ খ্রিস্টাব্দে আরব দেশে এক ভয়ঙ্কর মহামারী হয়। তখন হজরত গিয়াসুদ্দিন নামে একজন দরবেশ ভারতে আসেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে হজরত জামাল, হজরত সাহ গুডুর এবং হজরত সাহ বুজরুগ নামে তিনজন সন্তের সঙ্গে তিনি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উপস্থিত হন। এই গরুড়াচল পাহাড়েই বাস করতে থাকেন। এবং এখানেই দেহরক্ষা করেন।

—এই দুটি মতই বুঝি রয়েছে? দিলীপবাবু জিজ্ঞেস করেন।

—না, আরও দুটি মত আছে।

—তাহলে বলুন।

—তৃতীয় মতটি হল, ১৩০২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দিনের সেনাবাহিনী যখন আসাম আক্রমণ করে, তখন জনৈক পুণ্যবান পীর তাদের সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি এখানেই দেহরক্ষা করেন এবং এটি তাঁরই সমাধি।

—আরেকটা?

—সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫-১৬২৭ খ্রিঃ) যখন পূর্ব-কোচরাজ্যের মোগল শাসনকর্তা মকররাম খাঁ অহোমরাজ্য আক্রমণ করে পরাজিত হন, তখন গিয়াসুদ্দিন নামে জনৈক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ফকিরের মৃত্যু হয়। এই পাহাড়ের ওপরে তাঁকে সসম্মানে সমাধিস্থ করা হয়।

—এইসব মত থেকে আপনি কী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন?

—পোয়া মক্কার এই পবিত্র মাজার নিঃসন্দেহে গিয়াসুদ্দিন নামে জনৈক ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষের এবং তিনি কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

—আচ্ছা, এই মসজিদ কবে নির্মিত হয় ? উৎপল প্রশ্ন করে।

—আপনারা জানেন সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয়পুত্র আবু গাজি সুজাউদ্দিন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন।

আমরা মাথা নাড়ি। ইমামসাহেব বলে যেতে থাকেন—তিনিই এখানে প্রথম মসজিদ নির্মাণের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অনেকে বলেন, তিনিই নাকি মসজিদের ভিৎ প্রতিষ্ঠার সময় মক্কা থেকে একপোয়া মাটি আনিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে তিনি মসজিদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য কিছু ভূসম্পত্তি পর্যন্ত দান করেছিলেন। তবে সুজা এ মসজিদ দেখে যেতে পারেন নি। কারণ ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সেই প্রথম মসজিদের নির্মাণকার্য শেষ হয়। তার আগেই সুজা আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর হাতে বারাণসীর কাছে বাহাদুরপুরের যুদ্ধে (১৬৫৩ খ্রিঃ) পরাস্ত হন। তিনি বাংলা হয়ে আরাকানে পালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পথে মগ দস্যুদের হাতে নিহত হন। তবে সুজার নাম খোদিত একখানি শিলালিপি এখনও এখানে রয়েছে।

—সেকি! আওরঙ্গজেব ভেঙে ফেলেন নি ?

—না। বরং পরে আওরঙ্গজেবও এই মসজিদকে কিছু মাটি (জমি) দান করেছেন।

কিন্তু আওরঙ্গজেব মসজিদের জন্য মাটি দান করবেন, এতে অবাক হবার কিছু নেই। শুনে খুশি হবেন যে যুগে যুগে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুরাও এ মসজিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। রাজা রুদ্র সিংহ, রাজা লক্ষ্মী সিংহ ও রাজা কমলেশ্বর সিংহ প্রভৃতি হিন্দু নরপতিগণ এই মসজিদের উন্নতিকল্পে মুক্তহস্তে দান করে গিয়েছেন।

১৮৯৭ সালের ভূমিকম্প হয়গ্রীবমাধব মন্দিরের মতো পোয়া মক্কা মসজিদকেও ধ্বংস করেছিল। হিন্দু রাজারাই নতুন করে মসজিদ তৈরি করে দিয়েছিলেন। তবে এখন যে মসজিদ দেখছেন. এটি একেবারে নতুন বাড়ি, হালে তৈরি হয়েছে।

—আচ্ছা, মসজিদের জমিদারী তো সরকার নিয়ে নিয়েছেন।

তাহলে এখন মসজিদের ব্যয়ভার কিভাবে নির্বাহ হচ্ছে ? অনেকক্ষণ পরে অশোক প্রশ্ন করে।

ইমামসাহেব সহাস্যে বলেন—হ্যাঁ, ১৯৫৯ সালে সরকার সব ভূসম্পত্তি অধিগ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিনিময়ে আমাদের একটা বাৎসরিক অনুদান দিচ্ছেন। তাছাড়া তীর্থযাত্রীদের দান তো রয়েছেই। এখন একটা কমিটি মসজিদ পরিচালনা করছেন।

একবার থামলেন ইমামসাহেব। তারপরে বলেন—আমি বোধহয় দেরি করিয়ে দিলাম। আপনাদের গুয়াহাটী ফিরতে হবে। চলুন, এবারে দর্শন করে নেবেন।

আমরাও তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়াই।

মাথায় রুমাল বেঁধে প্রথমে মাজারের সামনে আসি। ইমামসাহেব আমাদের মঙ্গলের জন্য হজরত গিয়াসুদ্দিনের দোয়া ভিক্ষে করেন।

তারপরে তাঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মসজিদ দর্শন করি।

অবশেষে ইমামসাহেব ও তাঁর সহকারিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে আসি পোয়া মক্কা মসজিদ থেকে। পরিতৃপ্ত অন্তরে ফিরে চলি গাড়ির কাছে।

মসজিদ এলাকা থেকে নেমে সেই সমতল প্রান্তরে পৌঁছই। জালাল শইকিয়া ও চৌধুরীসাহেব ড্রাইভার তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছে।

আমরা কিন্তু পৌঁছতে পারি না। তার আগেই দেখতে পাই ওঁদের দু'জনকে, সেই লালমাটির প্রায় সমতল প্রান্তরটির প্রান্তে। একই গাছের ছায়ায় দু'জন। একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ও একজন মুসলমান ফকির। একজনের পরনে গেরুয়া, আরেকজনের লুঙ্গি। একজনের মাথায় কালোচুল মুখে কালো দাড়ি, আরেকজনের মাথায় পাগড়ি ও মুখে সাদা দাড়ি। একজন যুবক আরেকজন বৃদ্ধ।

দুজনেই চোখ বুজে রয়েছেন। একই তীর্থের আঙ্গিনায় প্রায় পাশাপাশি বসে আপন আপন পরমেশ্বরের প্রেম প্রার্থনা করেছেন।

এমন দৃশ্য দেখতে পাওয়া রীতিমত ভাগ্যের কথা। তাই উৎপল

তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় দুজনের সামনে। দুজনকে একই সঙ্গে ক্যামেরাবন্দি করে।

ওঁরা কিন্তু নির্বিকার। আমাদের কথাবার্তা কানে যেতে একবার দুজনেই চোখ মেললেন। কিন্তু পরক্ষণেই চোখ বুজে দুজনে আবার ধ্যানস্থ হলেন।

হিন্দু-মুসলিম মিলনের মহানতীর্থ পোয়া মক্কাশরিফের শেষ দর্শনটি সেরে নিয়ে প্রসন্নচিত্তে ফিরে আসি গাড়ির কাছে। প্রশান্ত মনে গাড়িতে উঠে বসি। সত্যই সার্থক হল আমাদের তীর্থ দর্শন। আমরা ধন্য হলাম।

পোয়া-মক্কার পাহাড় থেকে নেমে এসেছি সমতলে। সেই স্টেট হাইওয়ে ধরে ফিরে চলেছি গুয়াহাটী। আজকের দিনটি খুবই আনন্দে কাটল। কেবল একটা আফসোস রয়ে গেল, যাওয়া হল না সুয়াল-কুচি। দিনের আলো আসছে নিভে। সন্ধ্যার পরে সেখানে গিয়ে কিছুই ঠিকমত দেখা যাবে না। তার চেয়ে আরেকদিন আসা যাবে।

অতএব আর সোয়ালকুচির কথা নয়। তার চেয়ে দিলীপবাবুর কাছে হাজোর কথা শোনা যাক। সেইসঙ্গে আসামের সামান্য কিছু ইতিহাস। আসামের ইতিহাসে হাজোর ভূমিকা যে মোটেই অবহেলার নয়।

দিলীপবাবু বলে চলেছেন—তখন বাংলার কোচবিহার থেকে আসামের উত্তর-কামরূপ পর্যন্ত কোচরাজ্য। মহারাজা পরীক্ষিত হলেন কোচরাজা। বাংলার মোগল প্রতিনিধি অর্থাৎ ঢাকার নবাব কোচরাজ্য দখল করতে এলেন। পরীক্ষিত দশ হাজার পদাতিক, চার শ' অশ্বারোহী. ও বিশটি হাতি নিয়ে তাঁদের বাধা দিলেন। কিন্তু বিশাল মোগলবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করতে পারলেন না। তিনি পিছু হটতে বাধ্য হলেন। মোগলরা তাঁকে অনুসরণ করে ধরে ফেললেন। বন্দি করে দিল্লি পাঠিয়ে দিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর সঙ্গে কথা বলে খুশি হলেন। চার লক্ষ টাকা বার্ষিক করের বিনিময়ে তাঁকে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে সম্মত হলেন। পরীক্ষিত দেশে রওনা হলেন। কিন্তু ফিরে আসতে পারলেন না। পথেই অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

সংবাদটি পাবার পরেই ঢাকার নবাব পরীক্ষিতের কোচরাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এবং মুকাররাম খাঁন নামে জনৈক সেনাধ্যক্ষকে আসামে মোগল ফৌজদার করে পাঠালেন। মুকাররাম হাজোকে তাঁর প্রধানঘাঁটি নির্বাচিত করলেন। প্রচুর হাতি-ঘোড়া ও রণতরী-সহ বারো হাজার মোগল সৈন্য স্থায়ীভাবে হাজোতে বাস করতে থাকলেন।

পরীক্ষিতের ভাই বলিনারায়ণ পালিয়ে গেলেন অহোমরাজ্যে। অহোমরাজ প্রতাপ সিংহ তাঁকে আশ্রয় দিলেন।

১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নবাব ফতোপুরি ইসলাম খাঁন মারা গেলেন। তাঁর ভাই শেখ কাসিম নবাব হলেন। মুকাররাম তাঁর অধীনে কাজ করতে সম্মত হলেন না, তিনি পদত্যাগ করলেন। কাসিম তখন সৈয়দ হাকিম নামে জনৈক সেনানায়ককে হাজোর ফৌজদার নিযুক্ত করলেন। তাঁকে হাজো পৌঁছেই অহোমরাজ্য আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। আর তাই তাঁকে আরও দশ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক এবং চার শ' রণতরী দিয়ে আসামে পাঠালেন।

মোগলদের এই অভিযানের সংবাদ পেয়ে অহোমরা ভরালী নদীর মোহনায় প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। এবং রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মোগলদের সম্পূর্ণ পরাজিত করলেন। অহোমদের হাতে কয়েকজন মোগল সেনানায়ক বন্দি হলেন এবং বহু সৈন্য মারা গেলেন। অহোমরা হাতি ঘোড়া রণতরী কামান ও বন্দুক সহ প্রচুর সম্পদ পেয়ে গেলেন। বিজয়ী অহোমরাজ নিশ্চিন্তে রাজধানী গড়গাঁও রওনা হলেন।

১৬১৭ সালে বলিনারায়ণের সহায়তায় প্রতাপ সিংহ আবার মোগলদের আক্রমণ করে পাণ্ডু অধিকার করে নিলেন। মোগলরা

হাজোতে পালিয়ে এলেন।

১৬১৯ সালে মোগলরা প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। তাঁরা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণতীরে বলিনারায়ণের দুর্গ অবরোধ করলেন। খবর পেয়ে অহোমরা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। দুই সেনাবাহিনী মুখোমুখি হয়ে প্রায় দেড়মাস দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত অহোমরাই আক্রমণ করলেন। বহু মোগলসৈন্য মারা গেলেন। বাকিরা ভয় পেয়ে হাজোতে পালিয়ে এলেন। আসার সময় তাঁরা দশটা কামান, পঞ্চাশটা বন্দুক, প্রচুর গোলা-বারুদ এবং কয়েকটা গরু-ঘোড়া ফেলে রেখেই চলে এলেন।

তারপরে বছর পনেরো আর কোন বড় যুদ্ধ হয়নি। ১৬৩৫ সালে মোগলরা আবার বলিনারায়ণের দুর্গের ওপরে হামলা শুরু করে দিলেন। কিন্তু কোনই সুবিধে করে উঠতে পারলেন না।

তাঁদের ব্যর্থতার সংবাদ শুনে ঢাকার নবাব রেগে গেলেন। তিনি এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ১৬৩৮ সালে বলি-নারায়ণ নিহত হলেন।

আশ্রিতের এই অপমৃত্যুতে মহারাজা প্রতাপ সিংহ খুবই দুঃখ পেলেন। তিনি মোগলদের শিক্ষা দিতে চাইলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে স্থির করলেন, যুদ্ধ হবে শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলে। এবং কোন বড় যুদ্ধ নয়। অতর্কিতে শত্রুশিবিরে হানা দিয়ে তাঁদের ক্ষতি করে নিরাপদে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসা।

এই পরিকল্পনা খুবই কার্যকরী হল। এমনকি অহোমরা হাজোর মোগল ছাউনির ওপরে পর্যন্ত হানা দিতে লাগল। একটা বড় হানা থেকেই তাঁরা মোগলদের তিন শ' ষাটটি কামান এবং প্রচুর গোলা-বারুদ হাতে পেয়ে গেলেন।

হাজোর মোগল সেনাপতি আবদুস-সালাম ঢাকার নবাব ইসলাম খানের কাছে, জরুরি এত্তেলা অর্থাৎ এস. ও. এস. পাঠালেন।

নবাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একহাজার অশ্বারোহী ও দু' শ' দশটি রণতরী-সহ সেনাপতি জয়নুল আবেদিনকে আসামে পাঠিয়ে দিলেন।

হাজো পৌঁছবার পরে দুই সেনাপতি স্থির করলেন, আবদুস-সালাম হাজোতেই থাকবেন আর জয়নুল নৌবাহিনী নিয়ে সরাইঘাটের দিকে এগিয়ে যাবেন। অহোমদের পাণ্ডুর উপকণ্ঠেই আটকে রেখে দেবেন। এই অবসরে আবদুস-সালাম স্থলপথে আক্রমণ চালাবেন।

তাঁদের পরিকল্পনা খানিকটা সফল হল। প্রথম যুদ্ধেই মোগলরা অহোমদের কয়েকটা কামান ও চারখানা রণতরী দখল করে নিলেন।

সংবাদ পেয়েই প্রতাপ সিংহ সরাইঘাটে প্রচুর সৈন্য ও রণতরী পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা মোগলদের সুয়ালকুচি পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। এইযুদ্ধে অহোমদের হাতে একজন ফিরিঙ্গি মোগল সেনানায়ক বন্দি হলেন। তিনিই আসামে প্রথম য়ুরোপীয় আগন্তুক।

এই সময় প্রকৃতিও মোগলদের প্রতি বিরূপ হলেন। ব্রহ্মপুত্রের যে ধারাটি হাজোর পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, সেটি সহসা শুকিয়ে গেল। বাধ্য হয়ে জয়নুল তাঁর যুদ্ধজাহাজগুলি ব্রহ্মপুত্রের মূল-ধারায় ফেলে রেখে হাজোতে চলে এলেন।

অহোমরা খবরটা পেয়ে গেলেন। সেই রাতেই তাঁরা প্রায় পাঁচ শ' রণতরী নিয়ে মোগল-নৌবাহিনীকে আক্রমণ করলেন। মোগলরা সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন। তাঁদের তিন শ' রণতরী ও তিন শ' কামান বন্দুক অহোমদের অধিকারে এলো। প্রচুর মোগলসৈন্য মারা গেলেন এবং বন্দি হলেন।

আসামে মোগলশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে অহোমরা হাজো অবরোধ করলেন। তাঁরা মোগলদের সর্বপ্রকার সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিলেন। মোগল শিবিরের খাবার ফুরিয়ে গেল। বাধ্য হয়ে অধিকাংশ সৈন্যসহ আবদুস-সালাম আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁদের বন্দি করে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

জয়নুল কিন্তু অধীনতা স্বীকার করলেন না। বাকি মোগল-বাহিনী নিয়ে হাজোতে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। কিন্তু সফল হলেন না। অহোমরা হাজো আক্রমণ করলেন। জয়নুল ও তাঁর সৈন্যরা সবাই মারা গেলেন। দু' হাজার কামান ও বন্দুক এবং সাত শ'

ঘোড়া-সহ প্রচুর গোলাবারুদ এবং টাকা-পয়সা ও মণি-মুক্তো অহোমদের হাতে এলো। তারপরে তাঁরা ইটের তৈরি হাজোর মোগল সেনানিবাসটি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন।

এর পরেই ঢাকার নবাব মীর জুমলার আসাম আক্রমণ। সেটা ১৬৬২ সালের কথা। আওরঙ্গজেব তখন দিল্লির সম্রাট এবং জয়ধ্বজ সিংহ অহোমরাজ। তিরিশ হাজার পদাতিক, বারো হাজার অশ্বারোহী, এক হাজার কোচ-তীরন্দাজ, বহু রণতরী এবং অঢেল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মীর জুমলা অহোমরাজ্য অধিকার করতে এসেছিলেন। সে যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন বটে। কিন্তু অহোমরা তাঁকে বিনা বাধায় এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেননি। আর এই বাধাদানে শিক্ষিত সৈন্যদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ সমানভাবে শামিল হয়েছিলেন। গোয়ালপাড়ার যোগিগোপা থেকে শুরু করে কাজলি গুয়াহাটী গজপুর সিমলাগড় শ্যামাধারা মথুরাপুর ও গড়গাঁও পর্যন্ত প্রত্যেকটি রণাঙ্গনে তাঁকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কেবল ঐসব শহরগুলোর ওপরেই দখল কায়েম করতে পেরেছিলেন। শহরসীমার বাইরে গ্রামীণ বৃহত্তর আসামের ওপরে মোগলদের কোন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় নি। তাছাড়া মোগল ছাউনিগুলোর ওপরে অহোমদের আকস্মিক আক্রমণ তো লেগেই ছিল। পাহাড় জঙ্গল নদী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে কিম্বা রাতের অন্ধকারে অহোমরা অবিরত হামলা চালিয়ে গিয়েছেন। এবং এই মুক্তিযুদ্ধে ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে আসামের সাধারণ মানুষ সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ' ধ্বনি সেদিন সত্যই আসামে বাস্তব হয়ে উঠেছিল।

আর তারই ফলে মীর জুমলার সৈন্যদের লেবু চটকে মোটাচালের ভাত খেয়েই জীবনধারণ করতে হচ্ছিল। ডাল তরকারি মাছ মাংস তো দূরের কথা, একটু নুন পর্যন্ত জুটত না। কারণ গ্রামবাসীরা তাঁদের কাছে কিছুই বিক্রি করতেন না। শেখ মুজিবর রহমানের সেই 'ভাতে মারব, পানিতে মারব...' কথাগুলো অনেককাল আগেই

আসামে সত্য হয়েছে।

বাধ্য হয়ে মীর জুমলাকে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে হল। এবং যুদ্ধে ক্লান্ত অহোমরাজ কিছু সময় পাবার জন্য সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন। সন্ধি শেষে মীর জুমলা বিজয়ী রূপে ঢাকা ফিরে গেলেন। কিন্তু সে বিজয় দীর্ঘস্থায়ী নয়। আসাম কখনও স্থায়ীভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

একবার থামলেন দিলীপবাবু। আমি ও অশোক তাঁর দিকে তাকাই। তিনি সহাস্যে বলেন—এর পরের কথা তো যাবার পথে বলেছি। সেই প্রসঙ্গে এখন কেবল একটি কথা আপনাদের বলব।

—কী?

—তখন আপনাদের যা বলেছি, তা 'ব্রহ্মপুত্র' (মহেশচন্দ্র দেব) রচিত 'রক্তস্নাত-সরাইঘাট' নামে একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসকে অবলম্বন করে, আর এখন যা বললাম সবই E. A. Gait সাহেবের 'A History Of Assam' বইখানি থেকে।

আরেকটা কথা, দিলীপবাবু বলেন—আসামের ইতিহাস স্মরণ করলে বাংলার জন্য বড় দুঃখ হয়।

—কেন?

—প্রায় এক শ' বছর ধরে আসাম সাম্রাজ্যবাদী মোগলদের সকল আক্রমণ প্রতিহত করেছে। দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, হাজার হাজার প্রাণের বিনিময়ে তার স্বাধীনতা রক্ষা করেছে। আর বখতিয়ার খল্‌জির মতো একজন তৃতীয় শ্রেণীর সেনানায়কের সামান্য শক্তির কাছে বাংলা বিনা বাধায় তার স্বাধীনতাকে বিলিয়ে দিয়েছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে দিলীপবাবু চুপ করে থাকেন। আত্মগ্লানি আমাদেরও গ্রাস করে নিয়েছে। আমরাও চুপ করে থাকি।

হঠাৎ বাইরে নজর পড়ে। আমাদের গাড়ি আলো ঝলমল সরাইঘাট পুলে উঠছে। মুহূর্তে মনটা আনন্দের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সরাইঘাট তো শুধু আসামের নয়, মুক্তিকামী সকল ভারতবাসীর অবিস্মরণীয় তীর্থক্ষেত্র।

॥ বারো ॥

—বলো দেখি আমি কে ?

প্রশ্ন করে ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়। আমি ওর মুখের দিকে তাকাই।

সে এগিয়ে আসে আমার দিকে। নত হয়ে প্রণাম করে আমাকে। উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলে—বলতে পারলে না তো, আমি কে ? সে একটু হাসে।

আমি আবার ওকে দেখি। বয়স বোধকরি বছর পঁচিশ। গায়ের রংটা কালো হলেও সুশ্রী ও সপ্রতিভ চেহারা, দোহারা গড়ন। কিন্তু কোথাও তাকে দেখেছি বলে তো বোধ হচ্ছে না, অথচ সে আমাকে 'তুমি' বলে ডাকছে।

ওকে বসতে বলি। আমিও বসে পড়ি, সে আমার দিকে কেবল মুচকি হাসছে আর কিছু বলছে না। সত্যি বলতে কি একটু অস্বস্তির মধ্যেই পড়ে গেছি।

একটু আগে আমি প্রাতঃভ্রমণ সেরে ঘরে ফিরছি। প্রভাত দরজা খুলে দিয়েছে। ওরা এখনো বিছানা ছাড়েনি। তাই একা একা ঘরে বসেছিলাম।

এমন সময় ডোর-বেল বেজে উঠল। তারপরেই প্রভাত এসে বলল—দাদু, তমার কাসে এটা লরা (ছেলে) আহিসে। ডাঙ্গর লরা। ড্রয়িং-রুমে বহাইয়া আহিসু।

প্রভাতের কথা বলা হয়নি। প্রভাত কলিতা নলবাড়ির ছেলে। গতবছর হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করেছে। পয়সার অভাবে পড়াশুনা করতে পারছিল না। ববি অফিসের কাজে নলবাড়ি গিয়েছিল। তাকে নিয়ে এসেছে। সে গতকাল থেকে খুকুকে সাহায্য করছে। কারণ গতকাল অশোকের সঙ্গে অপর্ণা কলকাতায় চলে গেছে। আরো

তাইতো, অশোক যে কাল চলে গিয়েছে। সে কথাটাও বলা হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু এসব কথা পরে ভাবা যাবে। আপাতত আগন্তুক তরুণটির ভাবনাই পেয়ে বসেছে। সে আমাকে 'তুমি' ডাকছে, অথচ তাকে চিনতে পারছি না।

—চিনতে পারবে কী করে? তুমি যে আমাকে আজই প্রথম দেখলে। ছেলেটি হঠাৎ বলে ওঠে—তুমি আমার জেঠু। আমি শান্তনু, কাকলির দাদা।

—তাই বলো! আমি বলে উঠি। খুশি হই। ভারি ভাল লাগছে। কাকলি আমার পাঠিকা। জোড়হাটে থাকে। কয়েকবছর ধরে চিঠিতে যোগাযোগ। আমি ওদের জেঠু হয়ে গিয়েছি। সেই সূত্রে শান্তনু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু কাকলি? সে আসে নি?

সেই কথাই জিজ্ঞেস করি ওকে।

সে উত্তর দেয়—না। আমি কাল রাতের বাস ধরে আজ সকালে এখানে একটা কাজে এসেছি। কাজটা আজই শেষ হয়ে যাবে। কাকলি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছে। সে তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছে, জোড়হাটের সন্দেশ পাঠিয়েছে।

সে কাঁধের ঝোলা থেকে মিষ্টির প্যাকেট বের করে টেবিলে রাখে আর চিঠিটা আমার হাতে দেয়।

প্রভাতকে ডাক দিই। সে এলে সন্দেশের প্যাকেটটা দেখিয়ে বলি—ভেতরে নিয়ে রেখে দে। আর তোর মাসিকে বল্, জোড়হাট থেকে কাকলির দাদা এসেছে।

প্রভাত চলে যাবার পরে আমি কাকলির চিঠিটা পড়তে থাকি। কাকলি লিখেছে —

'জেঠু,

গতকাল কলেজ থেকে ফিরে এসে তোমার চিঠিখানি পেয়ে কি

যে আনন্দ হল, তা আমি তোমাকে লিখে বোঝাতে পারব না। তুমি আবার গুয়াহাটী এসেছো। এবারে নিশ্চয়ই জোড়হাটে আসবে।

দাদা আজ তার কাজে গুয়াহাটী যাচ্ছে। তুমি দাদার সঙ্গে চলে আসবে। তুমি তো বাসে চড়ে আসতে পারবে না, তোমার বুকে পেস্‌মেকার। তাই দাদা তোমাকে নিয়ে রেলে আসবে। বাবা দাদাকে রেলভাড়া দিয়ে দিয়েছে।

মোটকথা তোমার আসা চাই। না এলে আমার খুব কষ্ট হবে। এবারে জোড়হাট এসে তুমি আমার কাছে থাকবে। দিদিদের ব'লো, তোমার কোন অসুবিধে হবে না। আমি নিজে গিয়ে তোমাকে তাঁদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসব।

যদি কোন কারণে কাল না আসতে পারো, তাহলে দাদাকে বলে দিও কবে আসবে?' দাদা কিম্বা আমি গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব।

আমরা সবাই ভাল। তোমরাও নিশ্চয়ই ভাল আছো।

প্রণাম নিও এবং দিদিদের দিও।

ইতি

তোমার স্নেহের কাকলি।'

শান্তনু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু আমি ওকে কি বলব? কেমন করে ওকে জানাই, এ জীবনে আমার আর জোড়হাটে যাওয়া সম্ভব নয়। অমরাবতী আসামে এসে আমি যে জোড়হাটের মাটিতে প্রথম পা রেখেছিলাম, সেই জোড়হাট আমার কাছে সারাজীবনের মতো অগম্য হয়ে গিয়েছে। অথচ কি আশ্চর্য! প্রগতির সেই জোড়হাট থেকেই আরেকটি কিশোরী আমাকে আজ আবার জোড়হাট যাবার আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। কারণ সে-ও আমাকে তেমনি ভালোবেসে ফেলেছে। পার্থক্য কেবল সে ডাকত 'দাদা, এ ডাকছে 'জেঠু,' কিন্তু এ যে সেই একই ভালোবাসা, যার চেয়ে বড় সম্পদ আর নেই এ সংসারে।

আর চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না। শান্তনু এখনো তেমনি করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাই মুখে একটু কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বলি—আজ তো যেতে পারব না বাবা!

—কবে যাবে বলো! আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।

এবারে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়। বলি—ফোনে তোমাদের জানিয়ে দেব।

খুকু বুলা ও ববি ঘরে ঢোকে। শান্তনু উঠে দাঁড়ায়। সে খুকু ও বুলাকে প্রণাম করে, ববির সঙ্গে হাত মেলায়।

ওরা বসার পরে খুকুর হাতে কাকলির চিঠিখানি দিই।

আমরা শান্তনুর সঙ্গে কথা বলতে থাকি। প্রভাত ওর জন্য চা নিয়ে আসে। খুকুর চিঠি পড়া শেষ হয়। সে চিঠিখানি বুলার হাতে দিয়ে শান্তনুকে বলে—তুমি দুপুরে এখানে খাবে!

—না, দিদি! তা পেরে উঠব না। আমার সঙ্গে আরেকজন এসেছে। বাস থেকে নেমেই আমরা একটা হোটেলে ঘর নিয়েছি। তাকে সেখানে রেখে আমি এখানে চলে এসেছি। তাকে নিয়ে দশটার সময় আমাকে একটা অফিসে যেতে হবে।

—তাকেও নিয়ে এলে পারতে। চান-খাওয়া করে এখান থেকেই অফিসে চলে যেতে পারতে।

—আজই তো প্রথম তোমার এখানে এলাম! এর পরে যেদিন জেঠুকে নিতে আসব, সেদিন তাই করব। তোমার এখানেই খাওয়া-দাওয়া করব।

—জেঠু কবে যাবে বলেছে? প্রশ্নটা শান্তনুকে করলেও খুকু আমার দিকে তাকায়।

—তারিখটা বলেনি, তবে খুব শিগগির। ফোনে আমাকে জানাবে, আমি এসে নিয়ে যাবো।

খুকু আর কোন কথা বলে না উঠে ভেতরে চলে যায়। একটু বাদে একখানি প্লেটে কিছু খাবার এনে শান্তনুর সামনে রাখে।

বাধ্য ছেলের মতো শান্তনু জলখাবারে হাত লাগায়। তারপরে

উঠে দাঁড়ায়। বলে—আজ তাহলে আসি।

সে আবার আমাদের প্রণাম করে, ববি ও প্রভাতের কাছ থেকেও বিদায় নেয়। আমরা ওকে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

ঘরে ফিরে আসার পরে ববি বলে—তোমার কিন্তু কাকলিকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে তুমি জোড়হাটে যেতে পারবে না।···

খুকু যোগ করে—সেইসঙ্গে তুমি ওকেই এখানে আসতে লিখে দাও! অসুবিধের কি, আমার কাছে থেকে যাবে দুয়েকটা দিন। আমারও মেয়েটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

পরামর্শটা ভাল লাগে আমার।

ভদ্রলোক একটা ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্কের বেশ একটি বড় শাখার চিফ ম্যানেজার। সুতরাং ঠিক পাঁচটাতেই অফিস ছেড়ে বেরুতে পারবেন, এমন আশা করিনি। তবু ভেবেছিলাম গাড়ি করে আসবেন, পল্টন বাজার থেকে এখানে আসতে মিনিট পনেরো সময় লাগবে। সুতরাং ছ'টার মধ্যে এসে যাবেন। আমি সেইভাবেই তৈ'র হয়ে নিয়েছি।

অথচ অনেকক্ষণ হল ছ'টা বেজে গিয়েছে। সুখময়বাবুর ফিয়াট গাড়ির পাত্তা নেই। কথা আছে মানসবাবু পাঁচটার আগেই সুখময়-বাবুর অফিসে আসবেন। তাঁরা এখানে এসে আমাকে তুলে নেবেন। আমরা নবকান্তবাবু মানে কবি নবকান্ত বড়ুয়ার বাড়িতে যাবো। মানসবাবু তাঁকে খবর দিয়ে রেখেছেন।

ওঁদের দেরি দেখে খুকু ও বুলা বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসাহাসি করছে। এবারে প্রভাতও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমাকে বলে —এই গরমে জামাটা গায়ে না চড়াইলেই ভাল করতা দাদু! তোমার ফিয়াট কেতিয়া (কখন) আহিব, তা মা-কামাখ্যারও জনা নহয় (জানা নেই)।

এবং বলা বাহুল্য তার কথায় খুকু ও বুলার হাসাহাসি আরও

বেড়ে গিয়েছে। আর আমি আগের মতই অসহায়ভাবে বার বার ল্যাম্ব. রোডের দিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু হায়! কোথায় সুখময় মিত্রের সেই বেগুনি ফিয়াট।

শেষ পর্যন্ত বোধহয় প্রভাতের পরামর্শই মেনে নিতে হবে। এই গরমে জামা গায়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকতে সত্যই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু জামা খুললে যে ওরা আরও বেশি হাসাহাসি করবে।

হঠাৎ বুলা বলে ওঠে—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে মামু, ব্যালান্স মেলে নি।

—কার?

—তোমার এসকর্ট মিস্টার মিত্রের। আর ব্যালান্স না মিললে, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কেমন করে ব্যাঙ্ক ছেড়ে বের হবেন? তাই তুমি বরং জামাটা খুলেই ফেলো।

ওর কথা শুনে খুকু ও প্রভাত আবার হেসে দেয়। কিন্তু কথাটাকে আমি অবহেলা করতে পারি না। কারণ ব্রাঞ্চটি বেশ বড়, প্রচুর লেন-দেন। আর সুখময়বাবু মানুষটা যেমন পরিশ্রমী. তেমনি ন্যায়নিষ্ঠ। ভদ্রলোক অকৃতদার। এখানে একা থাকেন। একজন কাজের লোক আছে। কিন্তু তার নাকি একমাত্র গুণ, সে একজন সৎ মানুষ। রান্নাবান্না কিছুই জানে না। তাই সুকুমারবাবুকে নিয়মিত আধ-সেদ্ধ কিম্বা পোড়া খাবার খেতে হয়। তাতে অবশ্য তিনি মোটেই দুঃখিত হন না। কারণ সাদাসিধে ও সরল মানুষটি এসব সামান্য দুঃখে বিচলিত হন না। বরং রসিক ও আড্ডাবাজ মিত্রমশাই আনন্দেই দিন কাটাচ্ছেন।

ববির সঙ্গে তাঁর আলাপ অফিস সূত্রে। সেই আলাপ এখন আত্মীয়তায় পর্যবসিত। তাঁর বয়স ববির প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু দুজনে বন্ধুর মতো। পঞ্চাশ বছরের মানুষটি খুকুকে উচ্চকণ্ঠে মাসিমা ডাকেন। কিন্তু আজ এখনও সেই পরিচিত ডাকটা কানে আসছে না কেন?

না। শেষ পর্যন্ত সত্যই আমার প্রতীক্ষার অবসান হল। সন্ধ্যে সাতটায় সেই পরিচিত ডাক আমার কানে এলো। তার মানে তিনি

মাত্র ঘণ্টাখানেক দেরি করেছেন।

কিন্তু সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা গেল না। কারণ তার আগেই মিত্রমশাই দুঃখ প্রকাশ করে দেরির কারণ ব্যাখ্যা করলেন। অতএব আর কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে এসে বসি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা নবকান্তবাবুর বাড়ির সামনে পৌঁছে যাই। অসমীয়া টাইপের বাড়ি। সামনে একফালি বাগান। তারপরে একটুকরো খোলা বারান্দা।

মানসবাবুর সঙ্গে বারান্দা পার হয়ে বসবার ঘরে আসি। বেশ বড় ঘর। সুন্দর করে সাজানো ও গোছানো। এমনকি একাধিক ফুলদানিতে টাটকা ফুল পর্যন্ত রয়েছে।

এমনটি কিন্তু আশা করিনি। ভেবেছিলাম কোন অগোছালো ব্যাচিলরের বৈঠকখানায় বসতে হবে। কারণ মানসবাবু বলেছেন, নবকান্তবাবুর দুঃসময় চলেছে। তার স্ত্রী বীণাদেবী পা ভেঙে বিছানায় পড়ে আছেন।

খবর পেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে নবকান্তবাবু ঘরে এসে ঢোকেন। আমাকে দেখে খুবই খুশি হলেন। কুশল বিনিময়ের অনতিকাল পরেই চা চলে আসে। শুধু চা নয়, সেইসঙ্গে প্রচুর জলখাবার। একটু অবাক হতে হয়। যে সংসারে গৃহকর্ত্রী শয্যাশায়ী, সেখানে এই অসময়ে এমন ভরপেট জলখাবার। আমার বাড়িতেও তো লোকজন আসেন। কোথায়, আমি তো তাঁদের এমন আদর আপ্যায়ন করতে পারি না!

পারতাম। যদি আমি আসামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতাম। কারণ অতিথিসেবা অসমীয়া সংস্কৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু আসামের কথা থাক। চা খেতে খেতে নবকান্তবাবুর কথা ভাবা যাক। আগেই বলেছি তিনি একজন কবি ও বিদগ্ধ অধ্যাপক। কটন কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। কয়েক বছর হল অবসর নিয়েছেন। কিন্তু চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তাঁর পক্ষে আমার মতো অবসর-জীবন যাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ

তিনি বর্তমান অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ। ভারত সরকার তাঁকে আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। তিনি ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমির সদস্য, অসম সাহিত্যসভার সভাপতি এবং আরও অনেক সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত। তিনি ব্যস্ত মানুষ। দেশে-বিদেশে তাঁকে প্রচুর ভ্রমণ করতে হয়। সভা-সমিতি তো লেগেই আছে। আরও আনন্দের কথা, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক সুমধুর। তাঁর কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়েছে এবং তিনি বেশ কিছু বাংলা কবিতা লিখেছেন। এমন মানুষের সান্নিধ্যে আজকের সন্ধ্যাটি কাটাতে পেরে ভারি ভাল লাগছে আমার।

কথায় কথায় প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি তাঁর দাদা দেবকান্ত বড়ুয়ার কথা এসে পড়ে। নবকান্তবাবু বলেন—শারীরিক দিক থেকে দাদা বেশ ভাল আছেন। তবে মানসিক দিক থেকে ভাল নন।

—কেন বলুন তো?

—কেবল রাজনীতি নয়, সব কাজ থেকেই যে তাঁকে অবসর নিতে হয়েছে। কর্মহীন জীবন মেনে নিতে পারছেন না। তাই, কেউ কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলে, দাদা বিরক্ত বোধ করেন।

—এ তো খুবই স্বাভাবিক, অমন একজন কর্মপ্রিয় মানুষকে যদি কর্মহীন হয়ে পড়তে হয়, তাহলে তো বিরক্ত বোধ করারই কথা।

—হ্যাঁ, আমরাও তাঁর বিরক্তিতে বিস্মিত হই না। তবে জানেন তো বার্ধক্যকে মেনে নেওয়াই জীবনের নিয়ম। মাদার টেরিজার মতো ঐশ্বরিক শক্তি নিয়ে এ সংসারে ক'জন জন্মগ্রহণ করেন।

—এবারে আপনার কথা বলুন। আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাই।—আপনি কেমন আছেন?

—আমি ভাল নেই।

—কেন? আমরা প্রায় আঁতকে উঠি।

—শুনলেন তো আমার অর্ধাঙ্গিনী পা ভেঙে বিছানা-বন্দি।

সবাই সোচ্চার স্বরে হেসে উঠি। এবং নবকান্তবাবুও আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।

হাসি থামলে গম্ভীর স্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করি—কিন্তু বীণাদেবী বিছানায় পড়ে থাকায় আপনার কি খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে ?

—হচ্ছে না। আমার স্ত্রী ঘর-সংসার দেখতে পারছেন না আর আমার অসুবিধে হবে না ! নবকান্তবাবুর স্বরে কৃত্রিম গাম্ভীর্য।

সহাস্যে বলি—অসুবিধে হলে কি আমাদের ভাগ্যে এই আপ্যায়ন জুটত ? আর আপনিও কলকাতা-দিল্লি করতে পারতেন ?

এবারে নবকান্তবাবু সত্যই গম্ভীর হয়ে যান। বলেন—আমি তো আপনাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। সে সুস্থ থাকলে, আপনাদের আজ রাতে না খাইয়ে ছাড়ত না। আপনি এত বছর বাদে এলেন। কিন্তু আমার আসল মুশকিল হয়েছে কি জানেন ?

—কি ?

—বাড়িতে অসুস্থ ও অচল মানুষকে রেখে গুয়াহাটীর বাইরে যাওয়া। সত্যি বলতে কি এই সভার ভূতের জন্য কিছুই করে উঠতে পারছি না। না পারছি সংসারের দিকে তাকাতে, না পারছি মনের খোরাক মেটাতে। লেখাপড়ায় এত বাধা পড়ছে যে বলে শেষ করতে পারব না।

—বলার দরকারও নেই। কারণ খ্যাতির বিড়ম্বনা বড়ই বিষম বস্তু। তাই আমিও এবার গৌহাটি এসে সভাওয়ালাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করিনি।

—ভাল করেছেন। শান্তিতে আছেন। আর কতদিন থাকবেন ?

—যাদের কাছে এসেছি, তারা বলছে পুজোর আগের দিন তাদের সঙ্গে কলকাতা ফিরতে হবে।

—ভালই তো। থাকুন না কিছুদিন। আসামকে আপনি ভালোবাসেন, আসামও আপনাকে ভালোবাসে। আসামে থাকতে ভালই লাগবে। তা আর কোথায় কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন ?

—গত সপ্তাহে হাজো গিয়েছিলাম। আগামী সপ্তাহে বরপেটা ও তার পরের সপ্তাহে নগাঁও যাবো ঠিক করেছি।

—আর শিলং ?

—হ্যাঁ, যেতে হবে একবার। আগামী মাসে। একবার তেজপুর যাবারও ইচ্ছে। কারণ বহুদিনের নিমন্ত্রণ পড়ে রয়েছে।

—পাঠক-পাঠিকাদের ?

আমি মাথা নাড়ি।

নবকান্তবাবু আবার বলেন—তেজপুরও খুব ভাল লাগবে আপনার। তেজপুর হল পুরাণের শোণিতপুর, রাজা বাণাসুরের রাজধানী। সেখানে সূর্যমন্দির, শিবমন্দির, সৌভাগ্যমাধব নাগশঙ্কর ভৈরব ও মহাভৈরবী মন্দির, রুদ্রপদ ভৈরবপদ হলেশ্বর শুক্লেশ্বর নন্দিকেশ্বর ও ঢুলালমাধব প্রভৃতি বহু দেবালয় এবং বামুনীপাহাড়, দ পর্বতীয়া ও কন্যাকাশ্রম-সহ আরও কয়েকটি পুণ্যস্থান ও বিশ্বনাথ ক্ষেত্র দেখে আসতে পারবেন।

বিশ্বনাথকে বলা হয় দ্বিতীয় কাশী অথবা গুপ্তকাশী। বাণরাজা নাকি এই ক্ষেত্রে উনকোটি মানে একটি কম এক কোটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

—তা একটি কম করলেন কেন ?

—তিনি নাকি এক কোটি শিবলিঙ্গই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এক কোটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হলে ক্ষেত্রটি কাশীধাম হয়ে যায় বলে, গণেশ একটি শিবলিঙ্গ চুরি করে নিয়ে যান।

—ভারি মজার ব্যাপার তো!

—হ্যাঁ। তাছাড়া আসামের সাংস্কৃতিক জীবনেও তেজপুরের প্রভাব প্রচুর। আর তাই তেজপুর অবশ্য দর্শনীয়।

একবার থামলেন নবকান্তবাবু। এবং তারপরেই বোধকরি কথাটা মনে পড়ে যায় তাঁর। হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন আমাকে—আপনি জোড়হাট যাবেন না ? আর আপনার প্রগতি এখন কোথায় ?

এখানে আসার আগে একবারও ভাবিনি এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারি। কেমন করেই বা ভাবব ? বোধকরি বছর পনেরো আগে তিনি আমার 'অমরাবতী আসাম' পড়েছেন। তাঁর মতো একজন ব্যস্ত মানুষ এতদিন পরেও প্রগতিকে মনে রেখেছেন, এটা

অনুমান করব কেমন করে ?

কিন্তু তাঁর প্রশ্নের কি জবাব দেব ?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে নবকান্তবাবু নিশ্চয়ই বিস্মিত হলেন। কিন্তু তিনি প্রগতির প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন করলেন না। হঠাৎ উঠে ভেতরে চলে গেলেন। কেন ? কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

একখানি বই হাতে করে নবকান্তবাবু ফিরে এলেন একটু বাদে। এসে আগের চেয়ারখানিতেই বসলেন। পকেট থেকে কলম বের করে বইখানির ওপরে কি যেন লিখলেন। তারপরে সেখানি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন—গত বছর আমার এই বাংলা বইখানি প্রকাশিত হয়েছে। সময় করে পড়ে দেখবেন।

—নিশ্চয়ই। সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে নিই। বইখানি দেখি। নাম—'নবকান্ত বড়ুয়ার কবিতা'। উৎসর্গ করেছেন—'তরুণ বাঙালি কবি-বন্ধুদের'। উৎসর্গপত্রের পেছনে কবি পরিচিতি—

'অসমের অগ্রগণ্য কবি নবকান্ত বড়ুয়া সর্বভারতীয় আধুনিক কবিতায় এক স্মরণীয় নাম। বাংলার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও ভালোবাসা সর্বজনবিদিত। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলির এই বাংলা সংকলন তাই নিছক অনুবাদ নয়. অনেক সময় বাংলাতেই পুনর্লিখিত।'

কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন, ছবি গুপ্তা রমানাথ ভট্টাচার্য মানস বটব্যাল এবং কবি নিজে।

বইখানি বন্ধ করে বলি—এই কাব্যগ্রন্থ আমি সযত্নে বাড়ি নিয়ে যাবো এবং মন দিয়ে পড়ব। তবে তার আগে কবি ও একজন অনুবাদকের কণ্ঠে একটি করে কবিতাপাঠ শুনতে পারলে আজকের এই আসরটি মধুময় হয়ে উঠত।

—সাধু! সাধু! অতি উত্তম প্রস্তাব। সুখময়বাবু সোচ্চার স্বরে সমর্থন করেন আমাকে।

অতএব নবকান্তবাবু হাত বাড়িয়ে বইখানি নিয়ে পড়তে শুরু করেন—

সর্বং প্রাণ এজাতি

এখন কত রাত হল ?
অলকনন্দা, এখন রাত কত
গ্যাসপোষ্টের আবছা আলোর সংকেত নিষ্ফল
সময়ের কাঁটা রাতের ঘড়িতে স্থির।

রাত কত হল ? হয়ত দুপুর রাত :
অলকনন্দা, হাতে হেলান মাথা, তুমি শুয়ে আছ
রাতের সুগন্ধ ধূপের ধোঁয়ার মতো
তোমার দেহের প্রতি ভাঁজে ভাঁজে
স্তব্ধ
রাতের বাতাস নীরব নগ্ন
আকাশ স্বপ্নরতা
রাত ঝিলমিল তারা ঝিলমিল
মানিকতলার খাল !

আমার বিকেলের অলকনন্দা তুমি তো ঘুমিয়ে আছ

আকাশ ফুলের এত পাপড়ি
উপনিষদের ইঙ্গিত...
বাতাস জ্যোৎস্না ঢেউ আর তারা
মৃত্যুশীতল ঘুমপাড়ানিয়া গান
ঘুমের হিম চোখের পাতায় কাঁপে
রাত সুগভীর স্বপ্ন নিবিড়
মানিকতলার খাল।

অলকনন্দা স্বপ্ন দেখছ কার ?
তার ছন্দ ভাঙার গম্বুজ জাগে শহরতলীর কোজাগরী জ্যোৎস্নায়

আছে, জেগে আছে
রাত জেগে আছে, আমি জেগে আছি
আকাশ জোছনা কেউত' ঘুমিয়ে নেই
আর জেগে আছে কুন্তীর উৎকণ্ঠা
জতুগৃহে বুঝি আগুন জ্বলে···এই জ্বলে !
মোমবাতি শিখা নিদ্রাবিহীন
সৃষ্টির জাগরণ :
দাস ক্যাপিটাল এগারো পৃষ্ঠা বাকী
অলকনন্দা শুয়ে আছ এখনও ?

রাত ঝিকি প্রাণ ধিকি ধিকি
মানিকতলার খাল।

১৯৫০ — অনুবাদ : ছবি গুপ্তা

পাঠ শেষ করে নবকান্তবাবু বইখানি মানসবাবুর হাতে দিলেন। মানসবাবু জিজ্ঞেস করেন—কোন্‌টা পড়ব !

—তোমার যেটা ইচ্ছে।

পাতা উল্টে মানসবাবু পড়তে শুরু করেন—

প্রত্যেক রাত্রি

প্রত্যেক রাত্রিতেই আমি আত্মহত্যা করি
আমার মৃত বন্ধুরা এসে দিয়ে যায় তাদের সঙ্গসুখ
কেউ দেয় প্রেম কেউ ঘৃণা কেউ প্রতারণা
কেউবা দিয়ে থাকে প্রেমহীন দেহের তাড়না
সকলেই কিন্তু দেয় নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে মুক্ত করে
আর তাদের ছাই হয়ে যাওয়া মাটি হয়ে যাওয়া
বা তাদের নিখোঁজ দেহগুলি
আবার গঠিত হয় আমার স্নায়বিক বিদ্যুতকণায়

আর তখনই আমি আত্মহত্যা করি, এবং
পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে আমার অসংখ্য মৃত্যু।

প্রত্যেক রাত্রিতেই আমি আত্মহত্যা করি
আমার জীবিত বন্ধুরা এসে দিয়ে থাকে তাদের নিঃসঙ্গতা
কারো কারো অনুগ্রহ কারো কারো কলমে নিস্পৃহ শ্রদ্ধা
কারো খোলা চুলে নিষ্ঠুর ভালোবাসা অথবা শংকাতুর দূরত্ব
কারো হাসিতে আত্মনিগ্রহের অসার বেদনা
অথবা রোমন্থনের কৌতুক

সকলেই কিন্তু বন্ধ করে আসে নিজেকে নিজের রাত্রিখানি
আর তাদের শুয়ে থাকা বসে থাকা লিখতে থাকা বা
মৈথুন করে থাকা বা অন্ধকারে স্থির হয়ে থাকা
অথবা নৈশ বাস্-এ আসা দেহগুলি
আবার গঠিত হয় আমার মগজের তড়িৎতরঙ্গে
তারা আমাকে হত্যা করার আগেই আমি আত্মহত্যা করি
আর পুনরুজ্জীবিত হয় আমার অসংখ্য জীবন
মৃতদের জন্য আমি জীবিত থাকি
জীবিতদের জন্য মরি
মৃত্যু যেন ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের সুইং ডোর
দু-দুদিকেই দোলে।

১৯৮৪

অনুবাদ : মানস বটব্যাল

॥ তেরো ॥

আজ ১২ই সেপ্টেম্বার রবিবার ১৯৯৩। আজ সকালে ওর আসার কথা ছিল। অতএব উৎপলকে দেখে অবাক হলাম না। অবাক হলাম ওর সঙ্গে দেবযানী ও তার বোনকে দেখে।

দেবযানীদের সঙ্গে আমার পরিচয় বছর চারেক আগে, কাশী রামকৃষ্ণ মিশনে। একই সময়ে অতিথি নিবাসে আমরা পাশাপাশি ঘরে বাস করেছি কয়েকদিন। কাশী থেকে ওরা চলে এসেছে গৌহাটি, কিন্তু পরিচয়টা যায়নি হারিয়ে। চিঠির যোগাযোগ রয়েছে। এবং কাকলিদের মতো দেবযানীরাও আমাকে জেঠু বলে ডাকে।

দেবযানীর বাবা রেলে চাকরি করেন। ওরা মালিগাঁও রেল কলোনিতে থাকে। গতবারও দেবযানী আমাদের নারিকেল বস্তির বাড়িতে গিয়েছিল। আমিও যেদিন মিসেস ভট্টাচার্যের বাড়ি গিয়েছিলাম, সেদিন ওদের কোয়ার্টাসে গিয়েছি। দেবযানী এ বছর এম. এ. পাশ করে এখন বি. টি. পড়ছে। ওর বোন বি. এস. সি. পড়ে।

অতএব দেবযানী এসেছে বলেও অবাক হবার কিছু নেই। অবাক হলাম উৎপলের সঙ্গে এসেছে বলে। সেই কথাই জিজ্ঞেস করি।

হেসে বলে—আমরা যে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করি।

কথাটা খেয়াল ছিল না আমার।

দেবযানীর সঙ্গে খুকুর গতবছরই আলাপ হয়েছিল। আজ তাই সে সুযোগ পেয়ে একহাত নেয়—থাক্, থাক্, আর দিদি দিদি করতে হবে না। জেঠু গৌহাটি এলেই দিদি আর চলে গেলেই হাওয়া!

—সত্যি বিশ্বেস করুন দিদি, আমি জানি না যে আপনারা এখানে বাড়ি নিয়েছেন। জানলে নিশ্চয়ই আসতাম! আপনার আগের বাড়িটা আমার পক্ষে বড় দূর হয়ে যেতো।

—তাহলে কথা দিচ্ছ, এবারে জেঠু চলে যাবার পরেও মাঝে

মাঝে আসবে ?

—নিশ্চয়ই।

—তাহলে তুমিও চা পেলে।

—মানে ?

—মানে তোমাকে আমি আজ চা দেব না ঠিক করেছিলাম। ওরা দুজনে তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে চা খেত।

দেবযানীর ছোট বোন আজই খুকুকে প্রথম দেখছে। সে বলে ফেলে—আপনি তো বেশ মজার মানুষ দিদি।

—মোটেই মজার নয়। আমি ভাল-র গোলাম মন্দের যম। মালিগাঁওতে থেকেও যে একবছর আমার কাছে আসে না, সে এ বাড়িতে চা পায় না। তবে আজ যখন কথা দিয়েছে মাঝে মাঝে আসবে, তখন যাই দেখি চায়ের সঙ্গে আর কি দেওয়া যায় ?

খুকু উঠে দাঁড়ায়। আমরা হেসে উঠি।

হাসি থামলে খুকু আর বুলা ভেতরে চলে যায়। উৎপল জিজ্ঞেস করে—আগামী শনিবার সকালে বরপেটা যাওয়া ঠিক আছে তো ?

—হ্যাঁ। সেই কথাই তো রয়েছে দিলীপবাবুর সঙ্গে। তুমি সকাল ন'টায় ঝালুকবাড়ি মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমরা তোমাকে গাড়িতে তুলে নেব।

উৎপলের সঙ্গে কথা শেষ হতেই দেবযানী আবার সেই পুরনো প্রশ্ন করে—জেঠু, আমাদের বাড়িতে কবে যাচ্ছেন ? মা-বাবা আজ জেনে যেতে বলেছে।

—মিসেস ভট্টাচার্য কলকাতায় গিয়েছেন। এ মাসের শেষদিকে তিনি ফিরে এলে যেদিন তাঁর বাড়িতে যাবো, সেদিন তোমাদের বাড়িও ঘুরে আসা যাবে। তিনিই তোমাদের খবর পাঠিয়ে দেবেন।

—তার মানে তো এবারেও আপনি ওনার বাড়িতে খেয়ে আসবেন, আমাদের বাড়িতে কিছুই খেতে পারবেন না। মাঝখান থেকে দেবযানীর বোন বলে ওঠে।

হেসে বলি—পারব বৈকি ! চা নিশ্চয়ই খাবো।

—আপনি কিন্তু গতবছরও শুধু চা খেয়ে এসেছেন।

—তাতে কি হয়েছে? চা খাওয়া কি খাওয়া নয়?

—না। এবারে দেবযানী তার বোনের হয়ে ওকালতি করে—কারণ চা খায় না, চা পান করে। কথাটা আমরা ভুল বলি।

কথাটা আরও কিছুক্ষণ চলত। অন্তত আমি যতক্ষণ না ওদের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনে সম্মত হতাম! কিন্তু সে সম্মতি দেবার আগেই উৎপল আমার মুখপাত্রের ভূমিকা নেয়। বলে—দাদা তো আরও অনেকদিন গুয়াহাটী থাকবেন। এর মধ্যে নিশ্চয়ই একদিন তোমাদের বাসায় দুপুরে খাবেন। আমি এসে দাদাকে নিয়ে যাবো।

—তার মানে? গম্ভীর স্বরে দেবযানী জিজ্ঞেস করে।

উৎপল উত্তর দেয়—মানে, দাদার সঙ্গে যদি এই গরিব হস্টেলবাসী নেমন্তন্ন পায়, তাহলে দাদার যাতায়াতে সুবিধে হয়, এই আর কি।

—ভারি মজা পেয়েছো, তাই না। সেদিন জেঠুর সঙ্গে আলাপ হল, আর এরই মধ্যে একবার হাজো ঘুরে এলে, বরপেটা যাওয়াও ঠিক করে রেখেছো। এখন আবার আমাদের বাড়িতেও পাত পাততে চাইছ। সে গুড়ে বালি, তা আমি আগেই বলে রাখলাম।

—সে তুমি যা-ই বলো না কেন, তোমাদের বাসায় আমিই দাদাকে নিয়ে আসছি।

—বেশ আসুন। আপনি আমার গেস্ট।

দেবযানীর বোন উৎপলকে নেমন্তন্ন করে।

উৎপল হাসিমুখে দেবযানীর দিকে তাকায়। তার চোখে জয়লাভের পরশ।

আর আমি মনে মনে ভাবি, ছেলে-মেয়েগুলো দেখছি বড্ড চালাক। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে ওরা আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার ব্যাপারটা পাকা করে ফেলল। অথচ আমি এখনও যেতে রাজি হইনি। অবশ্য বেশ বুঝতে পারছি, তাতে এদের কিছু এসে যায় না। কারণ খাওয়াবার ব্যাপারে আসামের মানুষগুলো বড়ই নাছোড়বান্দা।

ওরা চলে যাবার পরে আজ আর বের হইনি। আজ তাই দুপুরের খাওয়া অন্যদিনের চেয়ে কিছু আগে হয়েছে। তার ওপরে রবি আবার কাল সুচিত্রা-উত্তমের একটা ক্যাসেট নিয়ে এসেছে। সুতরাং দিবানিদ্রা পরিহার করে বুলা ও খুকুর সঙ্গে ভিডিও দেখছি। প্রভাতও তার কাজকর্ম সেরে কিছুক্ষণ আগে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। পুরনো ছবি, এর আগে বেশ কয়েকবার দেখেছি, রঙিন নয় কালো সাদা, তবু দেখতে ভাল লাগছে।

কিন্তু ছবিটা শেষ হবার আগেই ডোর-বেল বেজে ওঠে। প্রভাত দরজা খুলে দেয়। বীরেশ্বরবাবু ঘরে ঢোকেন। বুলা ভি. সি. পি. বন্ধ করে দেয়।

বীরেশ্বরবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। সবিনয়ে বলেন—আমি বোধহয় অসময়ে এসে আপনাদের অসুবিধে করলাম।

—না, না। অসময় বলছেন কেন। বিকেল পাঁচটা। এই তো মানুষের বাড়িতে বেড়াতে আসার সময়। তাছাড়া বহুবার দেখা ছবি, অসুবিধের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

বীরেশ্বরবাবু একখানি চেয়ারে বসেন।

সেদিন তাঁর বাড়িতে যাবার পরে বীরেশ্বরবাবু একদিন এসেছিলেন এ বাড়িতে। সেদিনই বুলা আর খুকুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁর। সুতরাং এ বাড়িতে তিনি নতুন নন। তাছাড়া এই সাদাসিধে ও অমায়িক অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস ভদ্রলোককে আমার মতো ওদেরও ভালো লেগেছে। অতএব বীরেশ্বরবাবু আসায় আমরা সকলেই খুশি হয়েছি।

—আগামী শনিবার আমার দেশে যাবার কথা ছিল আপনাদের?

—আপনার দেশ! বুঝতে পারি না তাঁর কথা।

বুঝিয়ে দেন তিনি—হ্যাঁ, আমার দেশ মানে বরপেটা, সুন্দরীদিয়া।

সুন্দরীদিয়া যে বীরেশ্বরবাবুর জন্মভূমি, কথাটা খেয়াল ছিল না। তাই একটু লজ্জা পেয়ে বলে উঠি—হ্যাঁ। দিলীপবাবু আগামী শনিবার সকালে আমাকে তৈরি থাকতে বলেছেন।

—যাওয়া হবে না।

—হবে না। আমি বিস্মিত।

—না। মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায়কে আজ হঠাৎ একটা জরুরি কাজে দিল্লী চলে যেতে হল। একবার ঘড়ি দেখেন তিনি। তারপরে আবার বলেন—এতক্ষণে তাঁর ফ্লাইট প্রায় পালাম পৌঁছে গেল। বিমানবন্দরে রওনা হবার আগে ফোনে আমাকে বলে গেলেন, খবরটা আপনাকে জানাতে।

আর তাই ফোন ছেড়ে দিয়েই ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়েছেন পথে। বামুনি ময়দান থেকে বাস ধরে চলে এসেছেন আমবাড়ি, আমাকে খবরটা পৌঁছে দিতে। বড় চাকুরে ছিলেন, পণ্ডিত ও কবি, এসব কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। বয়সটার কথা যে কোনমতেই অবহেলা করা যায় না, এখন ষাট চলেছে। সত্যি এমন মানুষ সংসারে খুব বেশি পাওয়া যাবে না।

—প্রভাত? চায়ের জল চড়িয়ে দে। বরুয়াসাহেব অনেক দূর থেকে এসেছেন। খুকু বলে ওঠে।

প্রভাত ভেতরে চলে যায়। খুকু আবার বলে—আমাদের এ বাড়িতে আপনার একজন ভক্ত আছে। সেদিন আপনি চলে যাবার পরে আমি তাকে আপনার কথা বলেছি। শুনে তার সেকি আফসোস! আমি বলেছি, আপনি আবার এলে তাকে একটা খবর দেব।

—তা দিন। কিন্তু আমার ভক্ত, ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

—মানে আপনার কবিতা তার খুব ভাল লাগে।

—ও। আচ্ছা, ডাকুন একবার।

—ডাকছি। আজ রবিবার। বাড়িতেই আছে।

—চাকরি করে বুঝি?

—হ্যাঁ,। ইঞ্জিনিয়ার।

—তাই নাকি।'

খুকু মাথা নাড়ে। আমি জিজ্ঞেস করি—কে, বন্দিতা?

খুকু আবার মাথা নাড়ে। আমি বীরেশ্বরবাবুকে বলি—আপনি তার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হবেন। চমৎকার মেয়ে—যেমন দেখতে শুনতে, তেমনি মধুর ব্যবহার। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ কিন্তু দেখে বোঝা যায় না। অসম্ভব পরিশ্রমী, ঘরে ও বাইরে সমানে কাজ করে। প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফিরে এসে দেখি, নিজের হাতে গাড়ি ধোয়াচ্ছে, তারপরে সে জামা-কাপড় কেচে ছাদে নিয়ে শুকোতে দেয়। স্নান সেরে রান্না করে। খেয়ে নিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে অফিসে রওনা হয়। যাবার পথে মেয়েকে স্কুলে দিয়ে যায়।

—কেন? ওর স্বামী কোথায় থাকেন?

—ব্যবসার কাজে তাঁকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। তাঁর পক্ষে সংসারের জন্য সময় দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। একবার একটু থেমে আবার বলতে থাকি—আপনি শুনলে অবাক হবেন যে বন্দিতা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম মহিলা ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট। সারাদিন সংসার ও অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে। তবু সে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করে।

—সাহিত্যচর্চা! বীরেশ্বরবাবু বিস্মিত।

একটু হেসে উত্তর দিই—হ্যাঁ। সে একজন অতিশয় নিষ্ঠাবতী সাহিত্যসেবী। এ পর্যন্ত তার পনেরো-ষোলোখানি বই ও সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সবই ছোটদের জন্য। যেমন গল্প উপন্যাস রয়েছে, তেমনি আছে কল্পবিজ্ঞান ও ছোটদের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ কিছু অনুবাদের কাজও করেছে।

—কি নাম বলুন তো মেয়েটির? বন্দিতা ফুকন?

—কেন, আপনি তাকে চেনেন নাকি?

—না। সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। তবে আমি তার লেখা দু-তিনখানি বই পড়েছি। বেশ ভালই তো লেখে মেয়েটি। সে বুঝি আপনাদের নিচের তলায় থাকে?

আমি মাথা নাড়ি। বীরেশ্বরবাবু বলতে থাকেন—'সোণটির দিনবোর', 'বন্ধর দিনত সোণটিহত' এবং 'জয়মতী' আমার বেশ ভাল লেগেছে।

—ডাকি তাহলে ? খুকু জিজ্ঞেস করে।

—নিশ্চয়ই। এমন গুণী মেয়ের সঙ্গে আলাপ করব না।

প্রভাতকে আরেক কাপ চা বানাতে বলে খুকু বারান্দায় চলে যায়। ওকে ডাক দিয়ে বলে—তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য একজন ভদ্রলোক এখানে বসে আছেন।

—কে বৌদি ? বন্দিতার গলা পাই।

—এলেই দেখতে পাবে। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো। এখানেই চা খাবে।

—আসছি।

খুকু দরজা খোলা রেখে এসে বসে। প্রভাত চা নিয়ে আসে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করি—দিলীপবাবু কবে ফিরে আসবেন ?

—আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে। বীরেশ্বরবাবু উত্তর দেন।

—তাহলে কি পরের শনিবার আমরা বরপেটা যেতে পারব ?

—আশা করছি পারবেন। মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায় ফিরে এসেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

বলা উচিত হবে কি না বুঝতে পারছি না। কিন্তু না বললে যে ছেলেটার কষ্ট হবে। তাই বলে ফেলি কথাটা—আমি যে একটা মুশকিলে পড়ে গেলাম।

—কি বলুন তো ?

—আজই সকালে উৎপল এসেছিল।

—হ্যাঁ। সেও তো আপনাদের সঙ্গে বরপেটা যাচ্ছে।

—তাই তাকে শনিবার সকাল ন'টায় ঝালুকবাড়ি মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছি।

কি একটু ভাবলেন বীরেশ্বরবাবু। তারপরে বললেন—ঠিক আছে আমি তাকে খবর দিয়ে দেব। বলব পরের সপ্তাহের মাঝামাঝি আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

—সেকি! আপনি আবার ঝালুকবাড়ি ছুটবেন নাকি! বুলা বলে ওঠে।

একটু হেসে বীরেশ্বরবাবু উত্তর দেন—না, না। আমি নিজে যাবো কেন? তোমাদের এখানে চলে এসেছি গল্প করার লোভে। কাল-পরশু আমার কাজের ছেলেটার হাতে একটা চিঠি পাঠিয়ে দেব সে উৎপলের হস্টেল জানে।

বন্দিতা ঘরে ঢোকে।

খুকু পরিচয় করিয়ে দেয়। বন্দিতা বীরেশ্বরবাবুকে প্রণাম করে আমার দিকে এগিয়ে আসে।

আমি বলি—এটা সামাজিক নিয়ম হলেও আজ না হয় থাকত।

—না, দাদা। সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করা উচিত হবে না। সে আমাকে প্রণাম করে।

খুকু তাড়াতাড়ি বলে—নিয়মটা আবার আমার ওপরে চালু ক'রো না বাপু। খুকু তাড়াতাড়ি একখানি হাত ধরে তাকে টেনে পাশে বসায়।

বন্দিতা বলে—আপনার কবিতা আমার খুব ভাল লাগে।

—আমিও তোমার বই পড়েছি। বেশ ভাল লেগেছে।

—শুধু পড়েন নি। নামগুলো পর্যন্ত মনে রেখেছেন। বুলা যোগ করে।

—তাই নাকি। বন্দিতা খুশি হয়। বলে—কিন্তু আমি তো নেহাৎই 'অ্যামেচার' সংসার ও অফিস করে সামান্যই সময় পাই। সেই সময়ে কিছু চেষ্টা করা।

—'অ্যামেচার' তো আমিও। এবং আমরাই তো সৎসাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করে যাচ্ছি। অতএব সাহিত্যের আঙ্গিনায় আমরা মোটেই অচ্ছুৎ নই।

বন্দিতা চুপ করে রয়েছে। বীরেশ্বরবাবু আবার বলেন—তোমার কথা শুনে ভারি ভাল লাগল।

—কি কথা?

—তোমার ঘরকন্না, তোমার চাকরি, তোমার সাহিত্যসেবা।

—দাদা বুঝি এইসব বলেছেন? বন্দিতা আমার দিকে তাকায়।

কিন্তু আমাকে কোন জবাব দিতে হয় না। বীরেশ্বরবাবুই বলেন—না বলে ওঁর উপায় কি বলো! তোমার মতো মেয়ে যে সংসারে খুব বেশি পাওয়া যায় না।

—এভাবে বললে কিন্তু আমি পালিয়ে যাবো।

—না। পালিও না। কারণ সংসারে তোমরা বিরল হলেও একেবারে অমূল্য নয়।

—কি রকম?

—মাঝে মাঝে তোমাদের মতো মেয়ে পাওয়া যায়।

—আপনি পেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—কে?

—আমার স্ত্রী।

বন্দিতার সঙ্গে আমরাও হেসে উঠি।

হাসি থামলে বীরেশ্বরবাবু বলেন—দেখো বাংলায় একটা কথা আছে, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। এর চেয়ে বড় সত্য সংসারে আর নেই। নারীকে হতে হবে বধূ জায়া ও মাতা। পরিবর্তিত সামাজিক পটভূমিতে তোমারা যতই 'নারীমুক্তি' ও 'নারীর অধিকার' নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলো না কেন, ঐ চিরন্তন সত্যকে স্বীকার করে না নিলে, সংসারে শান্তি আসতে পারে না। নারী ও পুরুষ দু'জনকে নিয়েই সংসার। সহজাত প্রকৃতিতেই পুরুষ বহির্মুখী। সুতরাং স্বামীকে সংসারবন্ধনে বন্দি করা ও সন্তানকে মানুষ করে তোলায় প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে নারীকে। প্রেম আর স্নেহ দিয়ে সে-ই কেবল সংসারকে সোনার সংসারে পরিণত করতে পারে। তুমি এই সাধনায় অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করতে পারবে। সেই সঙ্গে তোমার সাহিত্যসেবাও সার্থক হয়ে উঠবে।

অন্যান্য রাজ্যের রাজধানীর মতো গুয়াহাটী থেকেও বেশ কয়েকটি স্থানীয় সংবাদপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হয়। যেমন—'Assam Tribune', 'Sentinel', 'North-East Times,' অসমীয়া 'দৈনিক অসম', 'আজির বাতরি' এবং বাংলা 'সময় প্রবাহ' ইত্যাদি।

খবরের কাগজ একটা নেশা। তার সঙ্গে খবরের সম্পর্ক নেই, একথা বলব না। কিন্তু সংবাদপত্র সংবাদসর্বস্ব নয়। তার বাইরেও একটা বড় জিনিস রয়েছে, যাকে বলা যেতে পারে পরিচিতি। যে পরিচিতি থেকে গড়ে ওঠে অভ্যেস, সৃষ্টি হয় ঘরানা। আমাদের দেশে এমন অসংখ্য পরিবার রয়েছে, যাঁরা তিন-চার পুরুষ ধরে একই সংবাদপত্র পাঠ করে চলেছেন।

আর তাই প্রায় প্রত্যেক পরিবারের একটি বা একাধিক নিজস্ব সংবাদপত্র থাকে। অন্য সংবাদপত্র তুলনায় ভাল সংবাদ কিম্বা সম্পাদকীয় পরিবেশন করলেও, তাতে তাঁদের মন ভরে না। বছরের পর বছর ভিনরাজ্যে এমনকি বিদেশে বাস করেও এই আকর্ষণমুক্ত হওয়া যায় না। সুদূরে বসেও তাঁরা নিজের কাগজটি কাছে পাবার ব্যবস্থা করে ফেলেন।

ববিও গৌহাটি এসে সে ব্যবস্থা করে ফেলেছে। ওর নিজস্ব কাগজ 'স্টেট্‌সম্যান' আর ওর মায়ের 'আনন্দবাজার.' ছুটি কাগজই এখানে আসে। তবে দিনে নয়, রাতে। কেন এত দেরি হয়, তার কারণ অবশ্য আমাদের জানা নেই।

রাত ন'টা নাগাদ কাগজ ছুখানি আমাদের বাড়িতে পৌঁছয়। আজও তাই এলো। ববি দরজার সামনে বসে আছে। সে হাত বাড়িয়ে কাগজ ছুখানি নিয়ে একখানি পড়তে শুরু করে। আমরা টি. ভি. দেখতে থাকি। এখন একটা সিরিয়াল চলেছে।

হঠাৎ ববি বলে ওঠে—দাছু, তোমার বাবুজি চলে গেলেন।

—কি বলছ! আমি চিৎকার করে উঠি।

ববি আনন্দবাজার পত্রিকাখানি আমার হাতে দেয়। তাড়াতাড়ি দেখতে থাকি—

'শোক সংবাদ

স্টাফ রিপোর্টার : বিশিষ্ট সলিসিটর ভগবতীপ্রসাদ খৈতান দীর্ঘ অসুস্থতার পর শুক্রবার শেষ রাতে কলকাতায় মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। ১৯২৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতি (সাম্মানিক)-তে স্নাতক হওয়ার পর তিনি ১৯২৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি লাভ করেন। পেশাগত কাজকর্ম ছাড়াও তিনি বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।'

—'স্টেটসম্যান'-ও খবরটা ছেপেছে। বলে ববি সে খবরটাও আমাকে দেখায়—

'OBITUARY

B. P. Khaitan

Mr. Bhagwati Prasad Khaitan (89), an outstanding lawyer, died in Calcutta on Saturday. Born in a family of lawyers of repute on July 9, 1904, he graduated from the Presidency College with honours in Economics in 1924 and took his Law degree from Calcutta University in 1927.

He was enrolled as an Attorney of Calcutta High Court on April 3, 1930 and joined Khaitan & Co. Solicitors in the same year as a partner. He was enrolled as a Notary by the Archbishop of Canterbury on August 30, 1933.'

আর দেখতে পাচ্ছি না, আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠেছে। কাগজ দুখানি ববির হাতে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমার স্নেহময় বাবুজি আর নেই। বাবুজি, হ্যাঁ প্রয়াত ভগবতীপ্রসাদ খৈতান,

আমার বাবুজি, আমার পিতৃতুল্য। অথচ আমি এমনই দুর্ভাগা যে তাঁকে একবার শেষ দেখাটাও দেখতে পারলাম না। শনিবার অর্থাৎ গতকাল খুব সকালে তিনি অমরলোকে মহাপ্রস্থান করেছেন। কাল ও আজ সারাদিন চলে গিয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁর শেষকৃত্য সুসম্পন্ন হয়েছে। অতএব আগামীকাল সকালের ফ্লাইটে কলকাতা গিয়েও কোন লাভ নেই। আমার বাবুজিকে আমি আর দেখতে পাবো না এ জীবনে।

বছরখানেক ধরে তিনি শয্যাশায়ী, অথচ তাঁর কোন রোগ ছিল না। শুধুই বার্ধক্য। জরা যে কি জিনিস, তা বাবুজিকে দেখে বুঝেছি। ঐ রকম স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ নিরোগ মানুষটি বার্ধক্যের আক্রমণে একবছরে যেন বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। সুযোগ্য পুত্ররা তাঁর চিকিৎসার জন্য যেমন অঢেল খরচ করেছেন, তেমনি তাঁদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা দিবা-রাত্রি সেবা-শুশ্রূষা করে গিয়েছেন। কিন্তু জরাকে জয় করা সম্ভব হল না।

এখানে রওনা হবার আগের দিন আমি তাঁর কলকাতার বাড়ি অলকাপুরীতে গিয়েছিলাম। এক অলকাপুরীতে আমি তাঁকে শেষ প্রণাম জানিয়ে আরেক অলকাপুরী রওনা হয়ে এসেছি।

সেদিনও তাঁকে ভাল দেখিনি। তবু ভাবতে পারিনি, এত তাড়াতাড়ি তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। বরং মাঝে মাঝে ফোন করে ও 'ফ্যাক্স'-এ যে খবর পাচ্ছিলাম, তাতে আশা করেছিলাম কলকাতায় ফিরে গিয়ে আবার দেখা হবে তাঁর সঙ্গে।

কিন্তু মানুষ আশা করে, ভগবান বাদ সাধেন। নিষ্ঠুর ভগবান তাকে কেড়ে নিলেন, আমার কলকাতা ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না। আমি অসহায়, আমাকে এ অবিচার মেনে নিতেই হবে।

—খবরটা তোমার কাছে যেমন আকস্মিক, তেমনি বেদনাদায়ক। বুলা আমাকে সান্ত্বনা দেয়—কিন্তু তুমি তো নিজেই বলতে, বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন। চোখে দেখা যায় না। ভগবান তাঁকে সব কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ভালই করেছেন। ভালই হয়েছে যে তিনি আর

কষ্ট না পেয়ে অমরলোকে মহাপ্রস্থান করেছেন।

বুলা হয়তো ঠিকই বলল। ভগবান যা করেন, ভালর জন্যই। কিন্তু ভগবান তাঁকে এত কষ্ট দিলেন কেন? বাবুজি তো কেবল একজন আইনজীবী ছিলেন না, ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী সমাজ-সেবী সৎ ও সরল ধর্মপ্রাণ মানুষ।

তাঁর সম্পর্কে প্রয়াত প্রভুদয়াল হিমৎসিঙ্কা লিখে গিয়েছেন—'It is no secret that he is the founder of Ballygunge Siksha Sadan, Calcutta and the President of Shri Shikshayatan College and School.

From his dedicated service, these educational institutions have attained a high position in the field of education in West Bengal. He is connected with many public charitable trusts···'

নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বুদ্ধানন্দজি লিখেছেন—'There are many rich and affluent people in our country, but there are very few who ardently feel for others. Khaitanji is one such rare person. I pray to God for his good health and long life dedicated to the service of the poor. I quote below from Swami Vivekanandaji, who said,

"টাকায় মানুষ করে না। মানুষে টাকা করে।
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের স্বামী নিত্যানন্দজি লিখেছেন—'Khaitanji is a man with feelings, an active man and a man of great wisdom. He understands the true meaning of the world around him and he has

the wisdom to look at things in the correct perspective always and everywhere'.

নিত্যানন্দজি আশা প্রকাশ করেছিলেন—'Khaitanji has been able to live in practice the essence of Vedic injunction. One can assume that he will complete a hundred years and continue beyond that, not so much for himself but for the good of others, particularly for the benefit of people lying, unfed, unclothed and uneducated ·...'

সেইসব অন্ন বস্ত্র ও শিক্ষাহীনদের মুখ চেয়ে অন্তত ভগবান তাঁকে আরও কয়েকটা বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন। তিনি তা করলেন না। বরং তাঁর মতো একজন বৈদিক নির্যাসে স্নিগ্ধ পুণ্যবান মানুষকে দুঃসহ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়ে অবশেষে নিজের কাছে টেনে নিলেন।

বুলা বলল—ভগবান নাকি ভালই করেছেন। কি জানি, হয়তো হবে। তাই আমি ভগবানের কথা ভাবছি না। ভাবছি বাবুজির কথা। যাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে সত্যি কথাটি বলেছেন শ্রী আর. এন. ঝুনঝুনওয়ালা—'One finds in him rare virtues of head, heart and hand···I am yet to meet or know a person who would talk otherwise about him···We bow to him, not out of fear, but out of reverence. He is an institution by himself.'

সত্যই তাই। তাঁর কাছে গিয়ে সর্বদা কিছু না কিছু সৎশিক্ষা নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছি। আর তাই আমি কলকাতায় থাকলে প্রায় প্রতি শনিবার সকালে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসতাম। এবার কলকাতায় ফিরে যাবার পরে শনিবারের সকাল শুধু সেই স্মৃতিসম্বল হয়ে রইবে।

—দাদু, কাল সকালে আমাকে একটা শোকবার্তা লিখে দিও, আমি অফিসে গিয়েই ফ্যাক্স পাঠিয়ে দেব। রবি আমাকে বলে।

আমি মাথা নাড়ি।

খুকু যোগ করে—তুমি বরং তাঁর ছেলে পিণ্টুবাবুকে একখানি চিঠিও লিখো।

আমি আবার মাথা নাড়ি। মনে মনে তাঁরই কথা ভেবে চলি। কত কথা, কত মধুর স্মৃতি। মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে চাণ্ডিল এলাহাবাদ চিত্রকূট সুইজারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড ভ্রমণের কথা। কিন্তু আমার 'চিত্রকূট' ও 'জয়ন্তী জুরিখ' বইতে আমি সেইসব ভ্রমণের কিছু স্মৃতি-চারণ করেছি। তাই যেসব কথা কোনদিন বলা হয়ে ওঠেনি, তারই একটি কথা ভেবে চলি।

কলকাতা হাইকোর্টে একনাগাড়ে ষাট বছর 'প্র্যাকটিস' করা এবং তাঁর বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের জন্য ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে তাঁর এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন। সেদিন তাঁর ভাষণে অশোকবাবু বলেছিলেন, এমন একটা সময় ছিল যখন আমি ইনকাম ট্যাক্স আইন প্রায় কিছুই জানতাম না। আজ আমি স্বীকার করতে কোন লজ্জাবোধ করছি না যে ভগবতীবাবু আমাকে সেই আইন শিখিয়েছেন।

সেদিন সভা থেকে বাড়ি ফেরার সময় আমি গাড়িতে বসে বলে ফেললাম—ভারতের আইনমন্ত্রীর মুখে এমন একটা কথা শুনে আমি সত্যই গৌরব বোধ করছি।

মৃদু হেসে অমায়িক মানুষটি বললেন—দেখো, এ ব্যাপারে যদি আমার কোন কৃতিত্ব থেকে থাকে, তা হল মানুষের ঠিক ঠিক গুণ বিচার করতে পারা। তখন অশোকবাবু সবে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। কয়েকদিন আদালতে তাঁকে দেখে আমি বুঝতে পারলাম, মানুষটির যেমন অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, তেমনি অসাধারণ তাঁর বক্তব্য পেশ করার ক্ষমতা। তাই একটা খুব বড় মামলায় আমি ওঁকে 'ব্রিফ্' করলাম। অশোকবাবু ব্রিফ্ পেয়ে অবাক হয়ে আমাকে ফোন করে বললেন, আমি যে ইনকাম ট্যাক্স আইনের প্রায় কিছুই জানি না।

আমি হেসে উত্তর দিলাম, আমরা আপনাকে আইনের ব্যাপারগুলো সব বের করে দেব। আপনি সেগুলো একবার দেখে নিয়ে শুধু সুন্দরভাবে গুছিয়ে জজসাহেবের সামনে উপস্থাপিত করবেন।

তাই করেছিলেন তিনি। এবং সে মামলায় আমাদেরই জয় হয়েছিল। ফলে অশোকবাবুর কিছু পশার বেড়ে গিয়েছিল।

এমনি আর কত কথা, কত শিক্ষা, কত স্মৃতি। সে স্মৃতির মালা গাঁথতে বসলে রাত ভোর হয়ে যাবে, তবু মালা শেষ হবে না। আমার সেই পিতৃপ্রতিম মানুষটিকে আমি একবার শেষ দেখাও দেখতে পেলাম না। আজ এই দূর থেকেই তাঁর স্বর্গগত অমর আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বলি—হে মৃত্যুহীন প্রাণ, তুমি আমাকে আশীর্বাদ ক'রো। আমি যেন আমৃত্যু তোমাকে আমার অন্তরের অন্তরলোকে অমর করে রাখতে পারি।

॥ চোদ্দ ॥

পনেরো দিন কেটে গেল, কিন্তু মনটা শান্ত হল না। অথচ এর মাঝে কয়েকবার পিন্টুবাবু ও তাঁর ছেলে হয়গ্রীবের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি, ওঁদের কাছ থেকে ফ্যাক্স ও চিঠি পেয়েছি। খুবই সুন্দরভাবে তাঁর শেষকৃত্য সুসম্পন্ন হয়েছে। তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছি না, বাবুজি আমাদের ছেড়ে সত্যই চলে গিয়েছেন। কি জানি, হয়তো তাঁর শেষ সময়ে সামনে থাকতে পারলে এমন মনে হত না।

আজ তাই দিলীপবাবুর গাড়িতে ওঠার সময়ও তাঁর কথা মনে পড়ে গেল, আমার বাবুজির কথা। আমি যে গাড়িতে তাঁর পাশে বসে দেশে-বিদেশে বহু জায়গায় যাতায়াত করেছি।

তাহলেও আমার বেদনা, আমারই থাক। তাই বাবুজির কথা না বলে আজকের বরপেটা ভ্রমণের কথায় আসছি।

সাতদিনের জায়গায় দিলীপবাবু চোদ্দদিন বাদে দিল্লী থেকে ফিরেছেন। তাই গত শনিবারও আমাদের বরপেটা যাওয়া হয়নি। আজ চলেছি। আজ ২৫শে সেপ্টেম্বার।

দিলীপবাবুর সময়নিষ্ঠার কথা আগেই বলেছি। আজও তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। ঠিক সকাল ন'টায় তাঁর নীল মারুতি আমাদের বত্রিশ নম্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আজও ডঃ চৌধুরি এবং উৎপল আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। তবে আজ আর মিউজিয়ামের সামনে নয়, একেবারে ঝালুকবাড়ি মোড়ে তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। আজও ডঃ চৌধুরির গাড়ি আগে আগে চলেছে। এবং আজও সরাইঘাট পুল পার হয়ে আমরা স্টেট হাইওয়ে ধরেছি। কারণ এ পথে গাড়ি কম এবং এ পথটাও বরপেটা গিয়েছে।

কথায় কথায় দিলীপবাবু বরপেটার কথাই বলে চলেছেন।

বরপেটা আসামের একটি প্রাচীনতম মহকুমা। ১৮৪১ সালে তৎকালীন কামরূপ জেলার ঐ অঞ্চল নিয়ে একটি পৃথক মহকুমা গঠিত হয়। তখন ঐ অঞ্চলের নাম ছিল তাঁতকুচি। সে সময় অঞ্চলটি বাউসী পরগণার অন্তর্গত ছিল। শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমাধবদেব এবং তাঁদের শিষ্যগণ এ অঞ্চলে অনেকগুলি সত্র প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।

বরপেটার প্রধান উৎসব দোলযাত্রা। তখন আসামের বাইরে থেকে পর্যন্ত প্রচুর পুণ্যার্থী বরপেটায় আসেন। বরপেটা তখন সেজে-গুজে উৎসবের আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

বরপেটার আরেকটি আকর্ষণ বাৎসরিক বাইচ বা নৌচালন প্রতিযোগিতা। জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সে উৎসবে যোগদান করেন।

হাতির দাঁতের শিল্পসম্ভার, মাটির মূর্তি, কাঠের খেলনা ও সোনার অলঙ্কারের জন্য বরপেটার খুবই খ্যাতি। তাছাড়া বরপেটা একটি বড় ব্যবসাকেন্দ্রও বটে। এই অঞ্চলে প্রচুর ধান পাট শরষে ও তরি-তরকারি উৎপন্ন হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রেও বরপেটা খুবই উন্নত। অনেকগুলি স্কুল এবং কলেজ রয়েছে। যাতায়াতেরও কোন অসুবিধে নেই।

রেল ও মোটরপথে সারা দেশের সঙ্গে যুক্ত। বরপেটা সদরের নিকটতম রেলস্টেশন বরপেটা রোড। সেটিও একটি পৃথক শহর। সদর থেকে স্টেশনে পৌঁছবার জন্য চমৎকার মোটরপথ রয়েছে। নিয়মিত বাস চলাচল করে। গৌহাটি থেকে বাসে বরপেটা যাওয়া-আসায় কোন অসুবিধে নেই।

বরপেটা পুরসভার আয়তন ৩·৮৬ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ২৩,৩৪৫ জন। বরপেটা রোড শহরটির জনসংখ্যা কিন্তু সদর বরপেটার চেয়ে বেশি। ২৯,৮১৩ জন। ১৯৮৩ সালের ১লা জুলাই বরপেটা মহকুমাকে একটি পৃথক জেলার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

এখন সকাল সওয়া দশটা। তার মানে সওয়া ঘণ্টা আগে আমরা রওনা হয়েছি গৌহাটি থেকে। হাজো ছাড়িয়ে এসেছি বেশ কিছুক্ষণ।

কাঠের পুলের ওপর দিয়ে আরেকটা নদী পার হয়ে এলাম। মাঝে মাঝেই এমনি নদী পার হতে হচ্ছে। আর মনে পড়ছে আমার ছেড়ে আসা জন্মভূমির কথা। আসামও পূর্ববঙ্গের মতো নদী-নালা আর খাল-বিলে ভরা। পার্থক্য কেবল একটাই, এখানে মাঝে মাঝেই ছোট-বড় সবুজ পাহাড়। যেটি আমার ছেড়ে আসা জন্মভূমি বরিশালে নেই।

পথের ওপরে গাছের ছায়া। পথের দু-পাশেই গাছের সারি। পথের পাশে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ খেত আর মাঝে মাঝে ছবির মতো সুন্দর-সুন্দর গ্রাম, খড় কিম্বা টিনের ঘর।

খেতের মধ্যে ধানই বেশি। কিছু পাটখেতও রয়েছে। আগে আরও বেশি ছিল। এখন বাজারের অভাবে পাটের চাষ অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ আমলে পাটের আরেক নাম ছিল 'গোল্ডেন ফাইবার' বা সোনার তন্তু। সারা পৃথিবীর প্রয়োজনীয় পাট, চট ও চটের থলির যোগান দিতাম আমরা। আমাদের পাট দিয়ে ইংলণ্ডের 'ডাণ্ডি'-তে পাটকল চলত।

প্লাস্টিক-এর আবিষ্কার পাটের বাজার মন্দা হবার একমাত্র কারণ নয়, সেইসঙ্গে আমাদের অতিশয় লোভ, অদূরদর্শিতা এবং উদ্যোগ-হীনতাও অনেকখানি দায়ী। সোনার তন্তুকে আমরা চটশিল্পের বাইরে সামান্যই কাজে লাগাতে পেরেছি। এবং চটশিল্পকেও বহুমুখী করে তুলতে পারিনি। ফলে পাটের চাষ কমিয়ে ফেলতে হয়েছে।

পরাধীন ভারতে আসামের কৃষিজাত প্রধান উৎপাদন ছিল ধান পাট কাঠ ও চা। পাট আগেই গিয়েছে। অসৎ সরকারী কর্মচারী ও বিবেকহীন ব্যবসায়ীদের জন্য কাঠ এবং চা-শিল্পের নাভিশ্বাস উঠেছে। ব্যাপারটা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক।

গাড়ি ও সাইকেল ভ্যানের সঙ্গে পথে পথচারীদের সংখ্যাও প্রচুর। মেখলা পরা মেয়ে ও প্যান্ট-সার্ট পরা ছেলের সংখ্যাই বেশি। মেয়েরাই ভারতীয় পোশাকের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এখন বেলা এগারোটা। আবার একটি নদী পার হতে হল।

তেমনি কাঠের পুল। পুল পেরিয়ে গ্রাম আর গ্রামের বাজার। এ গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। আর যেখানেই বিদ্যুৎ, সেখানেই প্রতি বাড়ির সামনে একটি করে বাল্ব লাগানো রয়েছে। দিলীপবাবু বলেছেন, সারারাত নাকি পথচারীদের সুবিধের জন্য এঁরা এই আলোটা জ্বালিয়ে রাখেন। আপন খরচে সমবায় প্রথায় এমন সমাজসেবার খুব বেশি উদাহরণ নেই এদেশে।

পাহাড়-জঙ্গল নদী-নালা গাছপালা খেত-খামার বাড়ি-ঘর মন্দির-মসজিদ মানুষ-জন দেখতে দেখতে পথ চলেছিলাম। এবারে একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল, মাটির বাঁধ। না, মাটির নয়, ঘাসের। ঘাসে ছাওয়া মাটির বাঁধ। একটা সবুজ সমান্তরাল গিরিশিরার মতো। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

ব্রহ্মপুত্র বহুদূরে। কিন্তু কবে সে সহসা ফুলে উঠবে, ভয়ঙ্কর বন্যা ধেয়ে আসবে, তার কি কিছু ঠিক আছে? গাঁয়ের মানুষের রক্ষাকবচ এই মাটির বাঁধ।

কিন্তু বাঁধ দিয়ে বন্যা রোধ করা যায় না। আর তাই আসাম প্রতি বছর বন্যার শিকার হচ্ছে। ভারতে বন্যার প্রধান কারণ নদীগুলো বুজে এসেছে, তাদের জলবহনের ক্ষমতা গিয়েছে কমে। নদীর সংস্কার না করে বাঁধ দেওয়া আর গাছের আগায় জল দিয়ে গাছকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা একই কথা।

বাঁধ ছাড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে আবার একটা নদী। জালাল জানায়—এই নদীটার নাম নখণ্ডা।

নদী পার হয়েই পথের ধারে সাইনবোর্ড—'স্বাগতম। বরপেটা।

গৌহাটি থেকে এই ১৪০ কিলোমিটার পথ গাড়িতে আসতে আমাদের আড়াইঘন্টা সময় লাগল। এখন দুপুর সাড়ে এগারোটা।

শহরে পথ দিয়ে গাড়ি চলেছে। পথের পাশে বাড়ি-ঘর দোকান-পাট। টিনের বাড়ি বেশি, তবে কংক্রিটের বাড়িও প্রচুর।

এ যে দেখছি একটা সুবিশাল জলা! বিলও বলা যেতে পারে। শহরে মাঝখানে বিল!

তাই তো হবে। পেটা মানে জলা। বরপেটা মানে বড়জলা। জলা আছে বলেই এ শহরের নাম বরপেটা। শঙ্করদেব নৌকো করেই এখানে এসেছিলেন।

বিল ছাড়িয়ে আবার বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট।

শহুরে পথে মিনিট পাঁচেক পথচলার পরে আমাদের গাড়ি সার্কিট হাউসের সামনে পৌঁছল। ডেপুটি কমিশনার শ্রীরাজীব বরা ও অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার শ্রীবিষ্ণু বরুয়া এবং জেলা প্রশাসনের আরও কয়েকজন অফিসার আমাদের স্বাগত জানালেন।

তাঁদের সঙ্গে ঘরে এলাম। ঘর নয়, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্যুইট। উৎপলের জন্যও একটা ঘর নির্দিষ্ট হয়েছে। ড. চৌধুরি সেই ঘরেই চলে গেলেন। তাঁর পৃথক ঘরের দরকার নেই। তিনি বিকেলে গৌহাটি ফিরে যাবেন।

চা-পানের পরে দিলীপবাবু আমাদের ঘরে বসেই মিটিং শুরু করে দিলেন। শান্তি রক্ষা থেকে সংহতি প্রতিষ্ঠা, কৃষিকার্য থেকে মৎস্যচাষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক আলোচনা হল।

বেলা দু'টোয় মিটিং শেষ হল। বিদায় নেবার সময় ডেপুটি কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন—ক'টার সময় বের হবেন স্যার?

দিলীপবাবু উত্তর দিলেন—সাড়ে তিনটে।

—কিন্তু স্যার, দুটো বেজে গেছে। আপনারা স্নান-খাওয়া করবেন। অ্যাডিশনাল ডি. সি. সবিনয়ে বলেন।

স্নান আমরা করে এসেছি। দিলীপবাবু বলেন—খেতে আর কত সময় লাগবে। তোমরা সাড়ে তিনটেয় আমাদের প্রস্তুত পাবে।

—ঠিক আছে। ডি. সি. বলেন—কিন্তু স্যার, একটা কথা।

—কি?

—আপনাকে সিকিউরিটি নিতে হবে।

—কেন? পরিস্থিতি ভাল নয় বুঝি?

—না। তা ঠিক নয়, তবে খারাপ হতে কতক্ষণ। তাছাড়া

আমার ওপরে সেইরকম নির্দেশই রয়েছে।

একটু হেসে দিলীপবাবু বলেন—তার মানে আমি আপত্তি করলেও তুমি সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবে, এই তো।

ওঁরা চুপ করে থাকেন। দিলীপবাবু আবার একটু হাসেন। বলেন —ঠিক আছে, তাই করো। নইলে এই বুড়োটার কিছু হয়ে গেলে তো আবার তোমরা বিপদে পড়ে যাবে।

—এ ভাবে বলবেন না স্যার। আমরা সাড়ে তিনটায় আসছি।

—এসো।

ওঁরা চলে যান। দিলীপবাবু বেয়ারাকে বলেন—আমরা আর ডাইনিং হলে যাচ্ছি না, এ ঘরেই আমাদের খাবার দিতে বলো। আর পাশের ঘর থেকে চৌধুরিসাহেব আর উৎপল সাহেবকে ডেকে নিয়ে এসো। ওরাও এখানেই খাবে।

ঠিক সাড়ে তিনটেয় ওঁরা এলেন, ডি. সি. এবং এ. ডি. সি। আমরাও তৈরি ছিলাম। নিচে নেমে এলাম। আমি এবং দিলীপবাবু ডি. সি.-র গাড়িতে উঠলাম, ডঃ চৌধুরি এবং উৎপল বসল অ্যাডিশনাল-এর গাড়িতে। দু-গাড়িতেই ম্যাগাজিন হাতে দুজন করে দেহরক্ষী আর সামনে একটা পুলিশ ভ্যান।

যে পথ দিয়ে বরপেটা এসেছি, সেই পথ দিয়েই গাড়ি চলেছে। গাড়ি নয়, গাড়ির কনভয়। পুলিশ ভ্যান ছাড়াও আরেকখানি জিপ রয়েছে সঙ্গে। তাতে জেলা প্রশাসনের কয়েকজন অফিসার।

পুলিশ ভ্যান দেখে পথচারীরা পথের দু-পাশে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। সভয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছেন আর তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের দেখছেন।

ব্যাপারটা ভাল লাগছে না আমার। এসেছি তীর্থ দর্শনে—দেখতে শুনতে আর অনুধাবন করতে। এই সরকারি সফরে কি সে সুযোগ পাওয়া যাবে? না, পেলেও উপায় নেই। আমি যে অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে তীর্থ দর্শনে এসেছি।

যে নদী পার হয়ে তখন বরপেটা শহরে প্রবেশ করেছিলাম, সেই

নদী পার হয়েই শহরতলিতে ফিরে এলাম। শ্রীবরা বলেন—আমরা এখন শ্রীশঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত পাটবাউসি সত্র দেখতে যাচ্ছি। পাটবাউসি বরপেটা থেকে ৮ কিলোমিটার।

একবার থামলেন বরাসাহেব। তারপরে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি তো সত্র দেখেছেন ?

—না। আমি নামঘর দেখেছি।

—সত্রেও নামঘর থাকে। দিলীপবাবু বলেন—সেই সঙ্গে দৌল এবং অন্যান্য মন্দির, রঙ্গালয় বিদ্যালয় বাসগৃহ রন্ধনশালা। এক কথায় একটা বিরাট ব্যাপার।

—কিছু বলুন না, সত্র সম্পর্কে। আমি অনুরোধ করি।

—বেশ তো। দিলীপবাবু বলেন—এসো, আমরা সত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে করতেই পাটবাউসি সত্রে পৌঁছে যাই।

শ্রীবরা মাথা নাড়েন। এবং আলোচনা শুরু হয়ে যায়—

শ্রীশঙ্করদেবের জ্ঞাতিভাই ও সুপণ্ডিত জগদানন্দ তাঁর বরদোয়ার বাড়িতে যে দেবগৃহ নির্মাণ করেছিলেন, সেটি আসামের প্রথম নামঘর এবং সকল সত্রের প্রথম অঙ্কুর। শঙ্কর সেখানে শাস্ত্রালোচনা ও নাম-কীর্তনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই সেই দেবগৃহকে গ্রামের মানুষ 'কীর্তনঘর' বলতে শুরু করেন। শঙ্কর কিন্তু নাম দিলেন 'নামঘর'। আর এই নামঘর থেকেই বোধকরি শঙ্করের সত্র প্রতিষ্ঠার ভাবনাটি মনে দানা বেঁধেছিল।

প্রতি সত্রে নামঘর থাকে কিন্তু প্রতি নামঘর সত্র নয়। সত্র মানে সংঘ, আখড়া অথবা আশ্রম। এবং তা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে সত্র বলতে বোঝাতো যজ্ঞগৃহ, যেখানে দিবারাত্র সৎকথা আলোচিত হত। কথিত আছে, পুরাণ-প্রবক্তা সুত নৈমিষারণ্যে প্রথম সত্র প্রতিষ্ঠা করে ঋষিদের কাছে ভাগবত কীর্তন করেছিলেন। আসামের সত্রসমূহেরও মূল উদ্দেশ্য ভাগবত কীর্তন। তবে শঙ্কর সম্ভবত বুদ্ধদেবের সংঘগুলিকে স্মরণে রেখে তাঁর সত্রসমূহকে গড়ে তুলেছিলেন।

তাই সত্র শুধু ধর্মপ্রচার কেন্দ্র নয়, সেইসঙ্গে একটি শিক্ষা ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান। সেই মধ্যযুগ থেকেই সত্র অসমীয়া সমাজে সর্বস্তরের মানুষকে সমানভাবে ধর্মচর্চার সুযোগ দান করে বর্ণের বিভেদ দূর করে দিয়েছে। আর পণপ্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে।

সত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বটে। কারণ অধিকাংশ সত্রে এক বা একাধিক বিদ্যালয় রয়েছে। আছে হস্তশিল্প ও শিল্পকলা শিক্ষাকেন্দ্র। শেখানো হয় নাচ-গান বাজনা ও অভিনয়। পাথর কাঠ ও হাতির দাঁতের ওপরে খোদাইকাজ. মাটির মূর্তি ও কাঠের মুখোশ তৈরি এবং তাঁত বোনা, বাঁশ ও মাদুরের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। পড়ানো হয় কাব্য দর্শন ও শাস্ত্র। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এক কথায় আসামের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে সত্র একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে চলেছে।

নামঘরে কোন মূর্তি থাকে না। থাকে ভাগবতের আসন। নামঘরের চারিদিকে খোলা বারান্দা। তারপর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে দৌলগৃহ, রঙ্গালয় এবং একাধিক মন্দির আর চারিদিক জুড়ে ঘরের সারি। বিভিন্ন শিক্ষা ও সমাজসেবা কেন্দ্র এবং ভক্তদের নিবাস তথা 'হাটি'।

এখন প্রায় প্রতি সত্রেরই একটি পরিচালনা সমিতি রয়েছে। তাঁরা অনেকেই সত্র পরিচালনার জন্য কর্ম-পদ্ধতি বা 'Scheme for management' করে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য সেগুলি আদালত কিম্বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। তাছাড়া সত্রে কোন বিশেষ উৎসব উদ্‌যাপিত হলে, তার জন্য পৃথক পৃথক সমিতি গঠিত হয়। তাঁরাই উৎসবটি উদ্‌যাপন করেন। বছর চারেক আগে (১৯৮৯) অনুষ্ঠিত মহাপুরুষ মাধবদেবের ৫০০ তম আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষেও বরপেটা সত্রে এমনি এক সমিতি গঠন করা হয়েছিল। এই সমিতিতে যেমন সত্রের বুঢ়াসত্রীয়া ছিলেন, তেমনি ছিলেন ডি. সি., এস. পি এবং বরপেটা শহরের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

সত্রের প্রধানকে বলা হয় সত্রাধিকার বা শুধুই অধিকার। তিনি

সত্রের ভক্ত ও শিষ্যদের শুধু দীক্ষাগুরু কিম্বা ধর্মগুরু নন, সেইসঙ্গে তাঁদের আধ্যাত্মিক পথের নির্দেশক। শিষ্যদের দীক্ষাদান থেকে সত্রের উৎসব পর্যন্ত সবকিছু তাঁরই নির্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরই মনোনীত কিশোরদের ভাবী কেবলিয়া ভক্ত বা ব্রহ্মচারী রূপে মনোনীত করা হয়। সেই কিশোর কেবলিয়াদের স্থায়ীভাবে সত্রে বাস করে কয়েক-বছর পড়াশুনা পূজা-অর্চনা ও অন্যান্য কাজ শিখতে হয়। তাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ কেবলিয়াদের কাছে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যায়ন এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ ও সত্রের রীতি-নীতি শিক্ষা করেন। সত্রগুরুর কাছে তাঁদের মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হয়। পরীক্ষার পরে সত্রগুরু তাঁদের কেবলিয়া ভক্তের স্বীকৃতি দান করেন। তখন তাঁরা ধর্মপ্রচারে আত্ম-নিয়োগ করতে পারেন।

বৈষ্ণবধর্ম ও সত্রে অনুরক্ত যেকোন নর-নারী সত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারেন। চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংসার তাঁদের ধর্মপথের কোন অন্তরায় হয় না। কারণ শঙ্করদেব কাউকে সন্ন্যাসী হতে বলেন নি। তিনি নিজেও সংসার পরিত্যাগ করেন নি। তিনি বলেছেন—তুমি যেকোন পেশায় নিযুক্ত হয়ে থাকো, তার মাঝেই হরির নামকীর্তন করো। তোমার মন শুদ্ধ হয়ে উঠবে। তোমার লোভ মোহ কাম ক্রোধ দূর হয়ে যাবে। তখন বিষয় কিম্বা সংসার আর তোমার হরিভক্তির অন্তরায় হবে না। তুমি নিজের সংসারকে হরির সংসার বলে অনুভব করতে থাকবে।

একবার থামলেন বরা সাহেব। কিন্তু আমি ও দিলীপবাবু কোন কথা বলতে পারার আগেই তিনি আবার বলতে থাকেন—আসামের বিভিন্ন স্থানে প্রায় পাঁচ শ' সত্র রয়েছে। এ রাজ্যের প্রত্যেকটি বৈষ্ণব পরিবার এর কোন না কোন সত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্ত।

শঙ্করদেব প্রথম সত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাধবদেব এবং তাঁদের শিষ্য এবং সহযোগীরাও সত্র স্থাপন করেন। মাধবদেবই প্রথম সত্রসমূহকে সংগঠিত করে তোলেন। তিনি সত্রের

আদর্শ এবং শিষ্যদের কর্তব্য স্থির করে দিলেন। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সত্রগুলি সমাজের অলিখিত অভিভাবকের মর্যাদা লাভ করল। আনন্দের কথা আসামের সমাজ-জীবনে সত্র আজও শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাদপীঠ, ন্যায় ও সুবিচারের পুণ্যভূমি এবং প্রেম ও প্রীতির এক অচ্ছেদ্য বন্ধন। আর তাই 'রাজার খাজনা'-র মতো 'গুরুর প্রণামী'-ও অবশ্য দেয় বলে বিবেচিত।

গাড়ি থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দিলীপবাবু বলে ওঠেন—আমরা পাটবাউসি এসে গিয়েছি।

তাকিয়ে দেখি একটি বেশ বড় তোরণের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। তোরণের ওপরে লেখা—'জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের থান।'

অতএব এখন সত্রের আলোচনা থামিয়ে সত্র দর্শন করতে হবে। নেমে আসি গাড়ি থেকে। একদিকে সত্র আর তিনদিকে গাছপালা ও বাড়িঘর। শান্ত-সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ।

সাময়িকভাবে সেটি অবশ্য নষ্ট করেছি আমরা। কেবল অনেকগুলি গাড়ি নয়, সেইসঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ। গাড়ি দেখে কিছু কৌতূহলী নারী-পুরুষ ও শিশু ছুটে এসেছিলেন পথের পাশে। এবারে পুলিশ দেখে তাঁরা পেছু হাঁটছেন। এই মানুষগুলোকে বাদ দিয়ে পাটবাউসির কথা ভাবা যায় না। কারণ মানুষকে বাদ দিয়ে তীর্থ হয় না।

কিছু মানুষ অবশ্য কাছে আসেন। কারণ স্বয়ং ডেপুটি কমিশনার আমাদের নিয়ে এসেছেন। তাঁরা তোরণের সামনে অপেক্ষা করছিলেন। এঁদের একজন যুবক দিলীপবাবুর পরিচিত। নাম খনিন্দ্রনাথ দাস। সত্রের পাশেই তাঁর বাড়ি। তিনি একজন ফরেস্ট রেঞ্জার। অনেকগুলো পদের মধ্যে দিলীপবাবুর একটি পদ বনদপ্তরের সচিব।

খনিবাবুই আলাপ করিয়ে দেন তাঁর পাশের প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে। নাম বনমালী মিশ্র। তিনি এই সত্রের সভাপতি।

তাঁদের সঙ্গে আমরা তোরণ পার হয়ে ভেতরে আসি। বিস্মিত হই। সত্র সম্পর্কে এতকথা শুনেও অনুমান করতে পারি নি যে সত্র

সত্যই এমন একটা বিপুল ও ব্যাপক ব্যাপার।

সুবিরাট এলাকা জুড়ে ঘর-বাড়ি মন্দির ও মঠ। ঠিক মাঝখানে নামঘর—চৌচলা টিনের মস্ত বাড়ি, চারিদিকে খোলা বারান্দা। নামঘরের চারপাশেই সুপ্রশস্ত অঙ্গন।

চলতে চলতে বনমালীবাবু বলতে থাকেন—অহোমরাজ্য ছেড়ে এখানে এসে আশ্রয় নেবার পরে কোচরাজ নরনারায়ণ শ্রীশঙ্করদেবকে বাউসি পরগনার ভূঞা পদ দান করেছিলেন। যে পাটে বসে শঙ্করদেব ভূঞার কাজ চালিয়েছেন, পরবর্তীকালে সেই পুণ্যস্থানের নাম হয় পাটবাউসি। শঙ্কর আঠারো বছর ছ'মাস এখানে বাস করেছেন। সেই সময় শ্রীদামোদরদেব শঙ্করের নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তাই শঙ্কর কোচবিহার চলে যাবার পরে তিনিই এই সত্র পরিচালনা করেছেন।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা প্রাঙ্গণ পার হয়ে নামঘরের বারান্দায় এসে উঠি। কিন্তু নামঘরের ভেতরে প্রবেশ না করে, ডানদিকের বারান্দা ধরে হাঁটতে থাকি। এদিকে নামঘরের পাশে প্রাঙ্গণ জুড়ে একটি মাঝারি আকারের মঠাকৃতি মন্দির, একখানি ছোট ঘর। পাশে একটি কুয়ো রয়েছে।

আমরা মন্দিরটির সামনে আসি। লেখা রয়েছে—

'জয় দামোদরদেব।
দণ্ডবতে করো সেবা ॥'

সেবা তো দূরের কথা, দণ্ডবত করারও সাধ্য নেই। শুধু নতজানু হয়ে প্রণাম করি একবার। তারপরে মন্দিরটিকে ভাল করে দেখি। মন্দিরের গড়নটি ভারি চমৎকার। নির্মাণশৈলীও সুন্দর। শিখরে তিনটি মঙ্গল-কলস।

—মন্দিরের ভেতরে শ্রীদামোদরদেবের পদশিলা আর একখানি শিলালিপি রয়েছে। ফণিবাবু বলেন—আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করুন, মন্দিরটির বাইরের দিকটা চারকোনা হলেও ভেতরটা কিন্তু আটকোনা।

আমরা লক্ষ্য করি। সত্যই তাই।

—আচ্ছা এই শিলালিপি থেকে নিশ্চয়ই জানতে পারা গিয়েছে যে মন্দিরটি কবে তৈরি হয়েছে? ছবি নেওয়া শেষ হলে উৎপল প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ। মিশ্রজী উত্তর দেন—শিলালিপিতে ১৬৬৯ শকাব্দ কথাটি খোদিত রয়েছে।

—তার মানে···

—১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত। মনে হয় রাজা প্রমত্ত সিংহ নির্মাণ করে দিয়েছেন। অনেকে অবশ্য বলেন রাজা শিব সিংহ এটি তৈরি করিয়েছেন।

মন্দির দর্শন করে পাশের ঘরখানির দিকে এগিয়ে চলি। চলতে চলতে মিশ্রজী আবার বলেন—যতদূর জানা যায় রাজা গৌরীনাথ সিংহ এই সত্রকে ১৫৬ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি দান করে গিয়েছেন।

মন্দিরের অনতিদূরে শ্রীশঙ্করদেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী পরমপূজনীয়া কালিন্দী আই-এর বাসগৃহ। ঘরখানি সযত্নে সংরক্ষিত। এমন কি তাঁর শোবার খাট-বিছানা পর্যন্ত তেমনি ভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রণাম করি। কেবল সেই মহীয়সী মাতার উদ্দেশে নয়, সেইসঙ্গে মহাপুরুষ শঙ্করের উদ্দেশেও। এই পুণ্যকুটির যে তাঁদের দুজনের চরণধূলিতেই ধন্য হয়ে আছে।

মা-য়ের ঘরের পাশেও একটি পাতকুয়া। মা এরই জল ব্যবহার করতেন। তাই এটিও সযত্নে সংরক্ষিত। আমরা দর্শন করি।

তারপরে আবার সেই বারান্দা ধরে হেঁটে ফিরে আসি নামঘরের প্রধানদ্বারে। দরজার ডানদিকে লেখা—

‘গোবিন্দর প্রেম
অমৃতর নদী
বহে বৈকুণ্ঠর পরা,
চারি পুরুষার্থ
তাহার নিজরা
হরিনামে মূলধারা।’

আর বাঁদিকে লেখা রয়েছে—

'বৈকুণ্ঠ প্রকাশে
হরিনাম রসে
প্রেম অমৃতর নদী,
শ্রীমন্ত শঙ্করে
পার ভাঙি দিলা
বহে ব্রহ্মাণ্ডক ভেদি।'

আমরা নামঘরে প্রবেশ করি। কিন্তু একে তো ঘর না বলে প্রাসাদ বলাই উচিত। কি বলে বোঝাবো এর আকার? জুট-মিলের পাটের গুদাম কিম্বা ফুড কর্পোরেশনের চালের গুদাম! তাতে না হয়, আকার খানিকটা অনুমান করা গেল কিন্তু এই সুবিশাল উপাসনা গৃহের ঐতিহ্য? লাদাখের গুম্ফাগুলির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই গাম্ভীর্য আর পবিত্রতার পরশ পাচ্ছি এখানে এসে।

সেখানে বুদ্ধদেব, এখানে শঙ্করদেব। কিন্তু না, কোন মূর্তি নয়, কেবলি কাঠের সিংহাসনে শ্রীমদ্‌ভাগবত। কৃষ্ণ নয়, কৃষ্ণকথা। মূর্তিপূজা নয়, পুঁথিপূজা। শিক্ষা ছাড়া ধর্ম বৃথা, জ্ঞান ছাড়া মোক্ষ অসম্ভব। শঙ্করদেব সেই জ্ঞানের দীপশিখাটি জ্বালিয়ে গিয়েছেন। এবং তা আজও জ্বলছে, জ্বলবে চিরকাল।

আমরা ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখি। তারপরে মিশ্রজী বলেন—আমাদের এখানে কয়েকটি মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে।

—দেখাতে কোন অসুবিধে আছে কি?

—না না। অসুবিধে থাকবে কেন? আসুন আমার সঙ্গে।

আমরা দেখি—শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমাধবদেবের হাতের লেখা। শঙ্করের ভক্তিগীতি, নাটক ও ভাগবতের অনুবাদ, মাধবের ভক্তি-রত্নাবলী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। আর দেখি গুরুজনার শাস্ত্রলিখা পীরা অর্থাৎ শঙ্করদেব যে কাঠের টেবিলে শাস্ত্ররচনা করতেন তারই উপরিভাগ। ইংরেজিতে যাকে বলে Table top। সবশেষে ওঁরা দেখালেন একটা পেতলের হরাই বা সরাই। যেমন বড়, তেমনি

সুন্দর—চমৎকার 'ডিজাইন'। সারা গায়ে ভারি সূক্ষ্ম খোদাই কাজ।

মিশ্রজী বললেন—কোচবিহারের মহারাজা এটি সত্রে দান করেছিলেন। ওপরে লেখা রয়েছে তারিখ, ২৯ শে ফাল্গুন, ১৭২১ শক।

—অর্থাৎ? উৎপল জিজ্ঞেস করে।

ডঃ চৌধুরি উত্তর দেন—১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসের ১৪/১৫ তারিখ হবে।

শঙ্করদেব মাধবদেব ও দামোদরদেব এবং কালিন্দী আই-এর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত পাটবাউসি নামঘর থেকে বেরিয়ে আসি, বেরিয়ে আসি সত্র থেকে। কিন্তু বিদায় নিতে পারি না। আসতে হয় ফণিবাবুর বাড়িতে। তিনি আমাদের ফল-মিষ্টি ও চা-বিস্কুট খাওয়ালেন। গ্রামের কয়েকজন গণ্য-মান্য ব্যক্তিও উপস্থিত রয়েছেন এই চা-য়ের আসরে। তাঁরা জানালেন, এখন এ গ্রামে হাজার পাঁচেক মানুষ বাস করেন।

অবশেষে শঙ্করদেবের পাটবাউসি থেকে ফিরে চলেছি মাধবদেবের বরপেটায়। কিন্তু বরপেটা নয়, শঙ্কর ও মাধবের ভাবনাই পেয়ে বসেছে আমাকে। আমি ভেবে চলেছি—

পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগ। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবিচার, বর্ণবৈষম্যের অত্যাচার ও বলির নিষ্ঠুরতা এবং তন্ত্রের ভীতিতে আসামের সমাজ জীবনে ঘনিয়ে এসেছে ঘন-অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আলোকরশ্মি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীমন্ত শঙ্কর।

পরিবারের আদিপুরুষ চণ্ডীবর গৌড়দেশ থেকে কামরূপে এসেছিলেন। তাঁরই প্রপৌত্র শিবের আরাধনা করে পুত্রলাভ করেছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হল শঙ্কর।

পাঁচ বছর বয়সে মা ও সাত বছর বয়সে বাবাকে হারালেন। তাঁর একটি ছোটভাই ছিল। পিতামাতার যৌথ স্নেহে ঠাকুরমা দু-ভাইকে মানুষ করে তুললেন।

সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান শঙ্কর অল্প বয়সেই নানা বিদ্যা ও গুণে সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। সবাই তাঁকে আদর করে 'ডেকাগিরি' বলে

ডাকতেন। যৌবনে পদার্পণ করার পরেই অন্যান্য ভূঞারা তাঁকে ভূঞা শিরোমণি পদে বরণ করে নিলেন। ভূঞা মানে জমিদার, তাঁরা রাজার নির্দেশে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করতেন।

একুশ বছর বয়সে শঙ্করের বিয়ে হল। পরমাসুন্দরী ও প্রেমময়ী স্ত্রী, নাম সূর্যবতী। কিন্তু বেশিদিন সংসার তাঁর ভাগ্যে সইল না। একটি কন্যার জন্মদান করেই তিনি মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন।

সব থেকেও সবকিছু হারাবার ব্যথায় বিচলিত শঙ্কর কিন্তু কর্তব্যে অটল রইলেন। শিশুকন্যাটি যখন আটবছরে পদার্পণ করলেন, তখন তাঁর বিয়ে দিলেন। জামাতা হরির হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে এবং ভাই ও জ্ঞাতিদের হাতে জমিদারি দেখাশোনার ভার দিয়ে তীর্থযাত্রা করলেন।

কিন্তু তাঁর সেই সুদীর্ঘ যাত্রাকে তীর্থযাত্রা না বলে আসমুদ্র-হিমাচল পরিক্রমা বললেই ঠিক বলা হয়। কামরূপ থেকে সাগর-মেখলা পুরীধাম, সেখান থেকে দেবতাত্মা হিমালয়ের বদরিকাশ্রম। এবং শুধুই পর্যটন আর দর্শন নয়, সেইসঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ, আপন আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্নয়ন।

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি তাঁকে ব্রজবুলি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করলেন, কাশীধামের স্বামী রামানন্দ ও ভক্ত কবীর তাঁকে রামানুরক্ত করে তুললেন, বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের রস আস্বাদন করলেন, অযোধ্যায় রামজন্মভূমি দর্শন করলেন। তিনি ভক্তিবাদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতে থাকলেন।

হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথের পথে চলতে চলতে তাঁর মনে প্রশ্নের উদয় হল—একই সঙ্গে সারা ভারতে এই ভক্তিবাদ এলো কেমন করে?

উত্তর পেলেন—এসেছে, কারণ সেই পরমব্রহ্মই তো পরমানন্দময় কৃষ্ণ। মানুষের রূপ নিয়ে তাঁরই বৃন্দাবন ও দ্বারকালীলা। তাঁর নামকীর্তন করে তাঁকে অন্তরে গ্রহণ করতে পারলেই অক্ষয় মোক্ষলাভ।

দীর্ঘ বারো বছর ধরে তীর্থপথের ধূলি অঙ্গে মেখে শঙ্কর ঘরে ফিরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভূঞা শিরোমণি পদ ফিরে দেওয়া হল,

কয়েক বৎসর পরে তিনি আবার বিয়ে করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু জমিদারী ও সংসার তাঁকে আর বাঁধতে পারল না।

ভগবদ্ উপাসনা, শাস্ত্র আলোচনা আর গ্রন্থ রচনাতেই তাঁর দিন কাটে, মাস যায়, বছর অতিবাহিত হয়। জ্ঞাতিভাই জগদানন্দ তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। শঙ্করের অনুমতি নিয়ে তিনি বাড়িতে একটি দেবগৃহ তৈরি করালেন। শঙ্কর সেখানেই শাস্ত্র আলোচনা ভগবদ্ উপাসনা শুরু করলেন। নামঘর ও সত্র প্রতিষ্ঠার বীজ বপিত হল।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত পরিক্রমা করে শঙ্কর বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তিবাদের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ভক্তিবাদের মধ্যে তিনি গণচেতনা ও গণজাগরণ প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। সুতরাং শাক্ত কামরূপ, তান্ত্রিক কামরূপ, অজ্ঞান কামরূপের জন্য তাঁর বড় কষ্ট। এই কষ্ট লাঘবের উপায় কি? কি করে বর্ণাশ্রমের বিভীষিকা দূর করা যায়? সমাজ-জীবনকে তিনি কেমন করে ধর্মব্যবসায়ীদের কবলমুক্ত করবেন?

জনশিক্ষা! তাঁর মন বলে উঠল, শিক্ষার মাধ্যমেই গণজাগরণ আসবে। সেইসঙ্গে সমাজের সব অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। অতএব শুরু হল শঙ্করের সাহিত্য-সাধনা।

এবং এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই যে শঙ্করদেব যদি ধর্মপ্রচার, সত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজসেবা না-ও করতেন, কেবল সাহিত্য-সৃষ্টির জন্যই তাঁর নাম এদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকত।

শঙ্করের সাহিত্যকীর্তির মূল্যায়ন করতে গিয়ে ডঃ নগেন শইকিয়া লিখেছেন—'শঙ্করদেব ছিলেন কবি, গীতিকার, নাট্যকার, সুরকার, বাদ্যবিশারদ, বাদ্যে নতুন তালের স্রষ্টা, অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক, অভিনয়ের মুখোশাদির নির্মাতা, চিত্রকর, নৃত্যবিদ এবং বিশিষ্ট নান্দনিক শিল্পকলার অধিকারী। মাধবদের যথাযথভাবেই তাঁর গুরুকে "সর্বগুণাকর" বলে অভিহিত করেছেন। এই সর্বতোমুখী প্রতিভা দৈবশক্তি ছাড়া সম্ভব হয় না। অসমে শঙ্করদেব তাই ভগবানের

অবতার স্বরূপেই পূজিত।'

তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি রাজা থেকে প্রজা পর্যন্ত, সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছ থেকে পুজো পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি কখনই অহঙ্কারী হয়ে ওঠেন নি। কারণ তিনি নিজেকে কেবল কৃষ্ণের কিঙ্কর বলে মনে করতেন। তার বেশি কিছু নয়।

বেলগুড়ির জনৈক যুবক গয়াপাণি। তিনি ভক্তিমার্গের মানুষ। তিনি মাধবদেবের ছোট বোনকে বিয়ে করেছেন। তাঁর তীর্থ দর্শনের বড়ই শখ। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আর তীর্থে যাওয়া হয়ে উঠছে না। তাই দুঃখিত অন্তরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন কৃষ্ণকথা শুনতে দেবগৃহে এলেন। ভাগবত পাঠ শেষ করে শঙ্কর সেদিন বললেন, যেখানে বসে কৃষ্ণলীলার মধুর কথা আলোচনা করা হয়, সেখানেই গঙ্গা যমুনা সরস্বতী কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী ও সিন্ধুর সপ্তধারা এসে মিলিত হয়। তার চাইতে বড় তীর্থ আর নেই কোথাও। অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করলেই সর্বতীর্থ দর্শনের পুণ্যফল লাভ করা যায়।

সেদিন থেকেই গয়াপাণি শঙ্করদেবের ভক্ত হয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর শাক্ত সম্বন্ধী সুপণ্ডিত মাধবের ভয়ে কথাটা বাড়িতে গোপন রাখলেন।

পিতৃবিয়োগের পরে মাধবও মায়ের সঙ্গে ছোটবোনের বাড়িতে বাস করছিলেন। তাঁর মা তখন খুবই অসুস্থ। মায়ের রোগমুক্তি প্রার্থনা করে তিনি মা-দুর্গার কাছে জোড়া পাঁঠা মানত করে বসলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই মাধবের মা বেশ খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। মাধব সঙ্গে সঙ্গে গয়াপাণিকে দুটো পাঁঠা কিনে আনতে বললেন।

বৈষ্ণব গয়াপাণির পক্ষে কাজটা অসম্ভব। কিন্তু সেকথা তিনি বলতেও পারেন না। একে তো মাধব বয়সে বড়, তার ওপরে মস্ত বড় পণ্ডিত। তিনি তাই ছল-ছুতো করে দেরি করতে থাকলেন। দু-চারদিন অপেক্ষা করার পরে মাধব চটে গেলেন। বললেন—আজ যদি তুই পাঁঠা না নিয়ে আসিস, তবে আমি নিজে গিয়ে কিনে আনব।

অগত্যা গয়াপাণিকে বলতে হয়—দাদা, প্রভু জগন্নাথের কৃপাতেই মা ভাল হয়ে উঠবেন। তাঁর জন্য পাঁঠা বলি দেবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ জীব হত্যা করে জীবন ফিরে পাওয়া যায় না।

—সেকি রে! তুই আবার এসব শাস্ত্রকথা শিখলি কার কাছে? পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে মাধব তাঁকে উপহাস করেন।

শান্তস্বরে গয়াপাণি উত্তর দেন—যাঁর কাছে শিখেছি, তিনি একজন সর্বশাস্ত্র বিশারদ মহাপুরুষ, তাঁর নাম শ্রীশঙ্করদেব।

—কোথায় থাকেন?

—বরদোয়া গ্রামে।

—তাহলে তো তাঁকে একবার দেখে আসতে হয়।

গয়াপাণি ভাবলেন, তাই ভাল। অহঙ্কার ঘুচিয়ে মাধবকে দলে আনতে পারলে, তাঁদের সম্প্রদায়ের সুবিধে হবে। তিনি মাধবকে নিয়ে গেলেন শঙ্করদেবের কাছে।

শুরু হল তর্কসভা। মাধবের সব অভিযোগ খণ্ডন করে শঙ্কর তাঁর মত ও পথের প্রাধান্য প্রমাণ করলেন। পণ্ডিত হলেও মাধব ছিলেন অত্যন্ত উদার। তিনি স্বীকার করলেন, শ্রীমন্ত শঙ্কর সর্বশাস্ত্র বিশারদ। সেইসঙ্গে বুঝতে পারলেন, তাঁর গুরু অন্বেষণ শেষ হল। তিয়াত্তর বছরের সেই সত্যাশ্রয়ীকে তিনি গুরু বলে মেনে নিলেন।

গুরু শিষ্যকে বুকে টেনে নিয়ে সগর্বে সবাইকে জানালেন, মাত্র বত্রিশ বছর বয়সেই মাধব অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। তাঁর মতো শিষ্য যে-কোন গুরুর গৌরব।

শাক্ত মাধব বৈষ্ণব শঙ্করের 'এক-শরণিয়া' ভক্তিধর্ম গ্রহণ করলেন। সুপণ্ডিত মাধব শ্রীমন্ত শঙ্করের প্রধান শিষ্য ও শ্রেষ্ঠ সহায় হয়ে উঠলেন।

ধর্মব্যবসায়ীরা প্রমাদ গণলেন। মাধব তাঁদের বড়ই ভরসা ছিলেন। সেই মাধবও কিনা শঙ্করপন্থী হয়ে গেলেন! এভাবে চললে তো কেউ আর ব্রাহ্মণকে ভয় করবে না, পূজা-পাটের উৎসাহ থাকবে না, রোজগারপাতি বন্ধ হয়ে যাবে! তাঁরা দল বেঁধে রাজদরবারে

এলেন। রাজার কাছে শঙ্করের নামে বহু অভিযোগ জানালেন।

কিন্তু কোন সুবিধে হল না। শঙ্কর নিজে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগের অসারত্ব প্রমাণ করলেন।

এই বিজয়ে শঙ্করের নাম আরও ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা কৃষ্ণকথা শুনে মোহিত হয়ে এক-শরণিয়া ভক্তিধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হলেন।

ধর্মব্যবসায়ীরা এবার অন্যপথ ধরলেন। তাঁরা রাজাকে বোঝালেন, ভূঞারা এখন আর রাজাকে আগের মতো মান্য করেন না। আর রাজার প্রতি এই আনুগত্যহীনতার মূলে বৈষ্ণব-শঙ্কর।

রাজা তখন ভূঞাদের আদেশ পাঠালেন—হাতি ধরার জন্য আমি ধুয়াহাঁটা ও নারায়ণপুরে হাতি-খেদা তৈরি করেছি। তোমাদের সেই খেদা পাহারা দিতে হবে। সাবধান! একটা হাতিও যেন পালিয়ে যেতে না পারে!

ভূঞারা পাহারা দেবার সব ব্যবস্থাই করলেন। কিন্তু তাঁদের কয়েকজন কর্মচারীর অনবধানতায় কয়েকটা হাতি পালিয়ে গেল।

ব্যস, আর যায় কোথায়? অহোমরাজ ভূঞাদের ধরে আনার আদেশ দিলেন। শঙ্কর অনেক আগেই জমিদারি দেখাশোনার কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তাহলেও তিনি ভূঞা তো বটেই।

বিপদ বুঝে শঙ্কর আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয় শিষ্যদের নিয়ে নৌকায় কোচরাজ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু তাঁর জামাই হরি ও শিষ্য মাধব ধরা পড়ে গেলেন। হরিকে হত্যা করা হল। কিন্তু সন্ন্যাসী বলে মাধবকে কয়েকমাস পরে ছেড়ে দেওয়া হল।

শেষ পর্যন্ত শঙ্কর পাটবাউসি এসে আশ্রয় পেয়েছিলেন। কারণ এই বরপেটা অঞ্চল তখন কোচরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপরে মাধবও এখানে চলে আসেন।

শঙ্করদেবকে তাড়িয়ে দিয়েও অহোমরাজ কিন্তু তাঁর রাজ্যে বৈষ্ণবধর্মের বিজয়যাত্রা বন্ধ করতে পারলেন না। বরং শঙ্করের নির্বাসনে সেখানে এক-শরণিয়া ধর্ম আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে

উঠতে থাকল। ফলে কিছুকালের মধ্যেই অহোমরাজগণ বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েন। অহোমরাজ্যে শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের বিরোধিতা মিটে যায়।

আপাতদৃষ্টিতে শঙ্করদেব প্রাণের মায়ায় অহোমরাজ্য পরিত্যাগ করে কোচরাজ্যের পাটবাউসিতে পালিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, যাঁর ইচ্ছায় সংসারচক্র আবর্তিত হচ্ছে, তাঁর ইচ্ছেতেই এমনটি হয়েছে। কারণ অহোমরাজ্যে শঙ্করদেবের আর উপস্থিত থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেখানে তখন ভক্তিধর্মের প্লাবন শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই প্লাবনে সকল সঙ্কীর্ণতা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ সব ভেদাভেদ ভুলে এক-শরণিয়া ধর্মগ্রহণ করছেন। কিন্তু প্রতিবেশী কোচরাজ্যের অবস্থা অন্যরকম। সেখানে শঙ্করের উপস্থিতি প্রয়োজন। সুতরাং জগৎপতি জগন্নাথের ইচ্ছেতেই শঙ্কর পাটবাউসিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

রাজা নরনারায়ণ তখন কোচরাজ্যের রাজা। তাঁর ছোটভাই শুক্লধ্বজ বা চিলারায় রাজ্যের সেনাপতি। তিনি শঙ্করের জ্ঞাতিভাই রামরায়ের মেয়ে কমলাপ্রিয়ার রূপে মুগ্ধ হলেন। তাঁকে বিয়ে করলেন। একদিন কমলার কণ্ঠে শঙ্করের একটি বরগীত শুনে মোহিত হলেন চিলারায়। তিনি শঙ্করদেবকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন।

এলেন শঙ্কর। চিলারায় তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর কাছে কৃষ্ণলীলাকীর্তন শুনতে চাইলেন। শঙ্কর তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করলেন।

কীর্তন শুনে চিলারায় বললেন—এইসব লীলাকীর্তনের চিত্ররূপ দেখতে পেলে খুবই খুশি হতাম।

সেনাপতির সে ইচ্ছাও পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন শঙ্কর। তিনি গেলেন তাঁতিকুচিতে। বরপেটার তাঁতিদের তখনও খুবই সুনাম। কিন্তু তার আগে তাঁরা কেউ কাপড়ে কৃষ্ণলীলার চিত্র ফুটিয়ে তোলেন নি। শঙ্কর কিন্তু তাঁদের দিয়েই কৃষ্ণলীলার চিত্রসহ একখানি সুবিশাল তাঁতবস্ত্র তৈরি করলেন। কাপড়খানি লম্বায় ১২০ হাত ও

চওড়ায় ৬০ হাত। তিনি সেখানির নাম দিলেন 'বৃন্দাবনী বস্ত্র'।

বস্ত্রখানি দেখে রাজা নরনারায়ণ ও সেনাপতি চিলারায় চমৎকৃত হলেন। নরনারায়ণ শঙ্করকে তাঁতকুচির অধিকার দিতে চাইলেন। সবিনয়ে অসম্মতি জানিয়ে শঙ্কর সেই পদে রামরায়ের নাম সুপারিশ করলেন। রাজা সে অনুরোধ রক্ষা করলেন।

নিশ্চিন্ত মনে শঙ্করদেব ধর্মপ্রচার ও সাহিত্য-সাধনা শুরু করে দিলেন। সর্বস্তরের মানুষ তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করতে থাকলেন—ব্রাহ্মণ দামোদরদেব ও হরিদেব, কবি অনন্ত কন্দলি। ব্যবসায়ী রাজকর্মচারী ও চাষী, কৈবর্ত কোচ ও উপজাতির মানুষ, এককথায় জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবাই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকলেন।

সাহিত্য সৃষ্টিও চলতে থাকল। বহু কীর্তন ও গীত সহ কয়েক-খানি নাটক রচিত হল। আর চলল ভাগবতের সহজ-সরল অনুবাদ। অথচ মহাপুরুষের বয়স তখন প্রায় এক শ' বছর।

সহসা শঙ্কর স্থির করলেন, তিনি আরেকবার জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করবেন। অনেকে বলেন তিনি মাধবদেবের হাতে পাটবাউসির দায়িত্ব দিয়ে পুরী গিয়েছিলেন। আবার অনেকে বলেন, প্রায় শ' খানেক শিষ্য এবং মাধবদেবকে সঙ্গে নিয়েই তিনি সেবারে পুরীধামে রওনা হয়েছিলেন। এবং সেটি ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ। তাহলে তাঁর সঙ্গে সেবারেও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয় নি। কারণ শ্রীচৈতন্য ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে অপ্রকট হয়েছেন।

যাক্ গে, এবারে সেই তীর্থযাত্রার কথা ভাবা যাক। কোচবিহার শহর থেকে এগারো কিলোমিটারের মতো এসে এক নির্জন প্রান্তরে একটি পাকুড় গাছের ছায়ায় সেদিন তাঁরা সাময়িক যাত্রাবিরতি ঘটিয়েছেন। শঙ্কর শিষ্যদের কাছে ভাগবত ব্যাখ্যা করছেন। হঠাৎ গাছের ওপর থেকে এককোটা মধু তাঁর মুখে ঝরে পড়ল।

সবাই সবিস্ময়ে ওপর দিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন একখানি মধুচক্র। তা থেকে মধু ক্ষরিত হচ্ছে।

মাধবদেব বলে উঠলেন—কি মধুময় পরিবেশ! ভক্তদের পাদপদ্মে

মধু মাখানো, গুরুমুখে মধুকথা আর আকাশ থেকে মধু ঝরছে। সত্যই এটি মধুপুর।

শঙ্করদেব ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—একদিন পবিত্রতীর্থ বলে গণ্য হবে এই রমণীয় স্থান।

সিদ্ধবাক মহাপুরুষের সে ঘোষণা সত্য হয়েছে। পরবর্তীকালে এখানেই তোরসা নদীর তীরে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়। গড়ে ওঠে মধুপুর সত্র। এক-শরণিয়া ধর্মের প্রধান তিনটি সত্র হল, পুবে শিবসাগরের কমলাবাড়িতে, মধ্যে বরপেটায় এবং পশ্চিমে কোচ-বিহারের মধুপুরে।

জগন্নাথ দর্শন করে মাস ছয়েক বাদে শঙ্কর সদলবলে পাটবাউসি ফিরে এলেন। এসেই শুনতে পেলেন, তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোচরাজ্যে ধর্মব্যবসায়ীরাও রাজা নরনারায়ণের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ এনেছেন—শঙ্কর সনাতন ধর্ম মানে না, দেব-দেবীর উপাসনা করে না, পূজার নির্মাল্য নেয় না ইত্যাদি।

সব শুনে শঙ্কর চিলারায়কে বলেন—আমি রাজার কাছে যাবো, তুমি আমাকে রাজসভায় নিয়ে চলো।

রাজসভায় তর্কযুদ্ধ হল। একদিকে মথুরা কাশী গৌড় ও শ্রীহট্ট থেকে নিয়ে আসা কয়েকজন ব্রাহ্মণ সভাপণ্ডিত, আরেকদিকে শতাধিক বছরের বৃদ্ধ এক কায়স্থ বৈষ্ণব। কিন্তু সে যুদ্ধেও শঙ্কর জয়লাভ করলেন।

রাজা নরনারায়ণ চেয়েছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্র ও কাব্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য হোক। তাই তিনি মথুরা কাশী গৌড় ও শ্রীহট্ট থেকে পণ্ডিত আনিয়ে তাঁদের সেই অনুবাদ ও সরলীকরণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁরা সে কাজ প্রায় কিছুই করে উঠতে পারেন নি। অথচ সেই তর্কযুদ্ধের সময় রাজা বুঝতে পারলেন, রাজকোষের শত শত স্বর্ণমুদ্রা আত্মসাৎ করেও তাঁরা যেকাজ সম্পাদন করেন নি, শ্রীমন্ত শঙ্কর একাই তা করে রেখেছেন।

মুগ্ধ রাজা শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন। রাজাকে

বুকে জড়িয়ে ধরে মহাপুরুষ বললেন—রাজার কখনই রাজধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তাছাড়া রাজা ধর্ম নিয়ে মেতে থাকলে, রাজকার্য অচল হয়ে পড়ে।

কোচবিহারেও শঙ্করদেবের এক-শরণিয়া ধর্মের জয়যাত্রা শুরু হয়ে গেল। মদনমোহনজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হল।

শঙ্করের বিশ্রাম নেই। হয় প্রচার, না হয় নামকীর্তন অথবা সাহিত্য-সাধনা। অথচ তখন তাঁর বয়স এক শ' বিশ বছর। এইসময় তাঁর ডানহাতে একটা ফোড়া হয়। আর আশ্চর্য সেই স্বাস্থ্যবান ও নিরোগ মানুষটির শেষ পর্যন্ত সেই বিষাক্ত ফোড়া থেকেই দেহান্ত হল। সেটা ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দ। আসামের মহাপুরুষ বাংলার মাটিতে দেহরক্ষা করলেন।

তোরসা নদীর তীরে কাগজকুটা ঘাটে শ্রীমন্ত শঙ্করের পবিত্র মরদেহ সমাধিস্থ করা হল। সমাধিকালে বাংলা ও আসামের মানুষ যে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন, তাতে সেদিন তোরসা নাকি পুষ্পনদীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। মধুক্ষরা মধুপুর মহাপুরুষের মধুময় মহাজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে রইল।

॥ পনেরো ॥

সকাল ছ'টায় ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলার পরে খেয়াল হয় গৌহাটি নয়, বরপেটা। আমি বরপেটা সার্কিট হাউসের একটা এ. সি. স্যুইটের দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায়। আমার পাশে দিলীপবাবু। তিনি ঘুমোচ্ছেন। ঠিকই করছেন। কাল আমাদের খুবই ধকল গিয়েছে। তবু আমার ঘুম ভেঙে গেল। অভ্যেস যাবে কোথায়?

উৎপল রয়েছে পাশের ঘরে। ডঃ চৌধুরি গতকাল পাটবাউসি থেকেই গৌহাটি ফিরে গিয়েছেন। আজ রবিবার। তবু তাঁর নাকি কি একটা জরুরি কাজ রয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় সার্কিট হাউসে ফিরে এসে উৎপলকে নিয়ে আমি আবার পথে বেরিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম আমার এক পাঠিকার বাড়িতে। সে-ও 'অমরাবতী আসাম' পড়ে আমাকে চিঠি লিখেছিল—

'আপনার সু-স্বাস্থ্য কামনা করে লিখতে বসেছি। আমি আপনার অপরিচিতা। কিন্তু তাই বলে লিখব না কেন? আমি আপনাকে লিখছি নিজের তাগিদে।...

আপনার লেখা 'অমরাবতী আসাম' পড়ে নিলাম। বেশ ভাল লাগলো, খুব ভালো।...

আমি অসমীয়া, আমি বিজ্ঞানের স্নাতক। কিন্তু কবিতা লিখি, নিজের মতো করে, অনেক দিন ধরে। যখন খুশি, তখুনি। আমার মাতৃভাষায় এবং বাংলায়ও লেখার চেষ্টা করছি। আশীর্বাদ করুন শঙ্কুদা।...

আমার অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণামী স্বরূপে আপনাকে উৎসর্গ করছি, বাংলা ভাষায় আমার প্রথম প্রয়াস "অনুভব", অপ্রকাশিত, তাইতো আপনাকে দিলাম—

'আমি দেখেছি—
প্রভাতের আলোয়
পাহাড়-চূড়ার স্বর্ণালী সাজ,
আমি দেখেছি—
কচুরিপানার সবুজ পাতায়
জোনাকির কারুকাজ।
আমি শুনেছি—
অরণ্য-গভীরে বনান্তরে
পাখির কাকলি বাঁশি,
আমি শুনেছি—
ঘাসের ডগায় ঝংকার তোলা
শিশির বিন্দুর হাসি।
ভেসেছি আমি শেষ-প্রহরে
সূর্যবন্দনার গানে,
জীবন জলসায় মেতেছি আমি
জাগ্রত-যৌবনের তানে॥'

কবিতাটি কবিতা হয়েছে কি না আজও জানা নেই আমার। কারণ আগেই বলেছি, আমি কবিতা না লিখেই লেখক হয়েছি এবং আমি আধুনিক কবিতা বুঝতে পারি না।

তবু নন্দিতাকে উৎসাহিত করে চিঠির উত্তর দিয়েছিলাম। তাতে সে কতটা উপকৃত হয়েছে বলতে পারব না। তবে সে আর কখনও আমাকে কবিতা পাঠায় নি। চিঠি লিখেছে। এবং পত্রের সম্পর্ক আজও রয়েছে। কিন্তু এবার আসামে এসে আর লেখা হয়ে ওঠে নি ওকে।

আগে খবর দিতে পারি নি। তাই নন্দিতা আমাকে দেখে যেমন অবাক, তেমনি খুশি হল। খুশি হল ওর পাঁচ বছরের মেয়ে। দেখা হল না ওর স্বামীর সঙ্গে। সে সরকারি চাকরি করে। তবু

তাকে নাকি রাত নটা অবধি অফিসে থাকতে হয়। ব্যাপারটা সত্যই অবাক হবার মতো।

তবে নন্দিতার সুখ ও শান্তির সংসার দেখে সুখী হলাম আমি। ওর স্বামীর বাড়িফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি নি। তবে ও বলেছে তাকে আজ দুপুরের দিকে সার্কিট হাউসে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু নন্দিতা আসতে পারবে না। তার আজ স্কুল আছে। সে একটা সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করে।

কিন্তু থাক গে নন্দিতার কথা, গতকালের কথাও আর নয়। আজকের কথায় আসা যাক। আজ আমরা বরপেটা ও সুন্দরীদিয়া সত্র দর্শন করব আর বরপেটা রোডের অনতিদূরে একটা কৃষি সমবায় দেখতে যাবো। বলা বাহুল্য শেষেরটা দিলীপবাবুর সরকারি সফর। অতএব সকাল সকাল তৈরি হয়ে নেওয়া ভাল। সেফটি রেজার ও টুথ ব্রাশ নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করি।

দিলীপবাবুও স্নান সেরে নিলেন। ঠিক সাতটায় ব্রেক-ফাস্ট এলো। উৎপলকে ডাক দিই।

শ্রীবরা ও শ্রীবরুয়া এলেন সাড়ে সাতটায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিচে নেমে আসি। সেই দুখানি অ্যামবাসাডার ও দুখানি জিপ এবং বন্দুকধারীদের সংখ্যা হ্রাস পায় নি।

সামনের গাড়িতে শ্রীবরার সঙ্গে আমি ও দিলীপবাবু আর পেছনের গাড়িতে শ্রীবরুয়া এবং উৎপল। বরপেটা শহরের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের আগে বরপেটা আসামের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ছিল। ১৮৭০ সালে এ শহরে প্রায় হাজার দশেক মানুষ বাস করতেন। অর্থাৎ জনসংখ্যার বিচারে বরপেটার স্থান ছিল গৌহাটির পরে। এবং বলা বাহুল্য সেই জনসমাগমের কারণ ছিলেন শঙ্করদেব ও মাধবদেব। তাঁদের আকর্ষণে বহু মানুষ ছুটে এসেছিলেন এখানে। ওঁদের ধারণা হয়েছিল দুই মহাপুরুষের চরণধূলায় ধন্য বরপেটা মোক্ষক্ষেত্র। এখানে দেহরক্ষা করলে অক্ষয় স্বর্গবাস।

শহরের ভেতর দিয়ে কয়েক মিনিট পথ চলে বরপেটা সত্রে এলাম। তোরণের সামনে গাড়ি থামল। পথ জুড়ে সুসজ্জিত তোরণ।

কিন্তু আমরা তোরণে প্রবেশ করতে পারি না। দিলীপবাবুর দেহরক্ষীরা বাধা দেন। বলেন—স্যার! শোভাযাত্রাটা চলে যাবার পরে আমরা ভেতরে ঢুকব। তাঁরা আমাদের ঘিরে থাকেন।

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখি। কিশোর—কিশোরীদের সংখ্যাই বেশি। তারা ভারে করে ফল-ফুল ও তরি-তরকারি নিয়ে ভেতরে চলেছে। মুখে শ্রীশঙ্করদেবের জয়ধ্বনি। জনৈক পথচারী জানালেন—শ্রীমন্ত শঙ্করের ৫৪৫তম জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এই উপচার।

শোভাযাত্রা চলে যাবার পরে দেহরক্ষীদের নির্দেশে ভেতরে প্রবেশ করি। বিরাট এলাকা নিয়ে সত্র। সুবিস্তৃত অঙ্গন আর চারিদিকে মন্দির ও বাড়ি। তারই মাঝে সুবিশাল নামঘর। টিনের চৌচালা, কাঠের দেওয়াল, তিনদিকে চওড়া বারান্দা।

শ্রীবরা আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং সত্রের সম্পাদক রাধামোহন দাস সদলবলে স্বাগত জানালেন। বললেন—সামনে ঐ দেখুন নামঘর। তার বাঁদিকে দোল, পাঠাগার ও সত্রের অফিস। আর ডানদিকে সভামণ্ডপ।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে নামঘরের সামনে আসি। দরজার পাশে লেখা—মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ।

তাই বোধকরি মহিলারা সবাই বাইরে বারান্দায় বসেই ভেতর থেকে ভেসে আসা সমবেত পুরুষ-কণ্ঠের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন, নামকীর্তন করছেন। এঁরা বলেন 'নামপ্রসঙ্গ।'

ব্যাপারটা বিস্ময়কর। নিয়মের জন্য নয়, নিয়মটা পালিত হবার জন্যে। ষোড়শ শতকে যখন এই নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছিল, তখন এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও কেন ঐ বোর্ডখানিকে খুলে ফেলা হয় নি, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

দাসমশাই তাড়াতাড়ি বলেন—মেয়েরা কিন্তু একদিন এই নামঘরে ঢুকতে পারেন, যেদিন তাঁরা দীক্ষা গ্রহণ করেন।

—তার মানে মেয়েদের দীক্ষা নিতে কোন বাধা নেই। দিলীপবাবু বলেন।

—না, নেই। এক-শরণিয়া সম্প্রদায়ের বাড়ির মেয়েরা প্রায় সবাই দীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন।

—তাঁরাই নিশ্চয়ই ঐ নামঘরের বারান্দায় বসে প্রসঙ্গ করছেন? ডঃ চৌধুরী জিজ্ঞেস করেন।

—হ্যাঁ। বড় ভাল সময়ে দর্শনে এসেছেন। শ্রীশঙ্করদেবের পাঁচ-শ' পঁয়তাল্লিশ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজ বিশেষ প্রসঙ্গ হচ্ছে এবং এত ভিড় হয়েছে।

দাসমশাই শেষ করতেই তাঁর অপর এক সঙ্গী ঘড়ি দেখে বলেন—আর পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যেই প্রসঙ্গ শেষ হবে। তখন নামঘর খালি হয়ে যাবে।

দিলীপবাবু অসহায়ভাবে তাঁর দেহরক্ষীদের দিকে একবার তাকান। তারপরে বলেন এত ভিড়ে ভেতরে যাওয়া···

দিলীপবাবু শেষ করতে পারেন না। দাসমশাই বলেন—তাই ভাল হবে। ততক্ষণে আসুন স্যার, অন্যসব দর্শন সেরে নেবেন।

আমরা তাঁদের সঙ্গে নামঘরের ডানদিকে দৌলগৃহের সামনে আসি ও দর্শন করি।

তারপরে রাধামোহনবাবু আমাদের পাঠাগারে নিয়ে আসেন। এখানে সত্রের ডানদিক জুড়ে পাশাপাশি কয়েকটি ঘর। তারই একটিতে পাঠাগার। পাশের ঘরটিতে অফিস।

পাঠাগারে প্রচুর বই রয়েছে। তবে সবই প্রায় আসামে বৈষ্ণব আন্দোলন ও তার দুই নেতা শঙ্করদেব ও মাধবদেবের ওপরে। তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলী প্রায় সবই রয়েছে।

এই সত্র প্রকাশনার কিছু কাজও করেন। বছর তিনেক আগে এখানে মহাসমারোহে শ্রীমাধবদেবের পঞ্চশততম আবির্ভাব উৎসব

উদ্‌যাপিত হয়েছে। সেই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মৃতিগ্রন্থের একখানি করে কপি রাধামোহনবাবু আমাদের উপহার দিলেন।

এখানে প্রাঙ্গণের একাংশ জুড়ে একফালি বাগান। চারিদিক ঘেরা বাগান। অনেক ফুল ও ফলের গাছ। তারই মাঝে একখানি বোর্ডে লেখা—মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমাধবদেবের নিজের হাতে লাগানো রুয়া (রঙ্গিয়াল) ফুল গাছ।

সবিস্ময়ে আমরা দেখি। তারপরে এগিয়ে চলি। হাঁটতে হাঁটতে নামঘরের পেছনে আসি। এদিকে দেখছি একটা বেশ বড় দিঘি। ওপারে বিশ্রাম ভবন, বিশিষ্ট ভক্ত ও আমন্ত্রিতদের জন্য।

পেছনদিক ঘুরে সত্রের বাঁদিকে আসি। এদিকে রয়েছে যাত্রী-নিবাস, সাধারণ ভক্ত ও শিষ্যদের জন্য। আর আছে মথুরাদাস আতার ভিটি। বারান্দাযুক্ত ছোট একখানি টিনের ঘর। কাঠের দেওয়াল। গায়ে কিছু খোদাই কাজ—তার ওপরে চমৎকার রং করা।

ভিটির একদিকে নামঘর, অপরদিকে সুবিশাল সভাগৃহ বা রঙ্গালয়। চারিদিক খোলা, দোচালা টিনের হল-ঘর। মেঝে বাঁধানো। রাধামোহনবাবুর জনৈক সঙ্গী বলেন—নামঘরে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ হলেও এখানে অবারিত দ্বার। সন্ধেবেলা এলে দেখতে পাবেন, এখানে পাঠের আসর বসেছে এবং শ্রোতাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি।

আবার নামঘরের সামনে ফিরে আসি। ইতিমধ্যে প্রসঙ্গ শেষ হয়ে গিয়েছে। নামঘর প্রায় ফাঁকা।

নামঘরের প্রধান দরজার সামনে আসি। দরজার দুদিকে দারু-শিল্পের অপরূপ নিদর্শন। কাঠের ওপরে খোদাই করে দশাবতারের মূর্তিমালা, একদিকে পাঁচটি করে। কাঠের মূর্তির ওপরে রং দেওয়া হয়েছে।

শুধু সামনে নয়, নামঘরের সারা দেওয়ালেই অপূর্ব খোদাই কাজ, তার ওপরে সুন্দর রং করা। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের নানা কাহিনীর চিত্ররূপ। যেমন—রাবণের সীতাহরণ, একাদশী ব্রতর

ফল, যমপুরী, কৃষ্ণলীলা। আরও অনেক চিত্র—কৃষ্ণ অর্জুন ও অনন্ত, রেণুকা পরশুরাম ও জমদগ্নি, কৃষ্ণ সুভদ্রা বলরাম, রাধাকৃষ্ণ, গরুড়, ইন্দ্রদ্যুম্ন, কলি ধর্ম ও পরীক্ষিত, ব্রহ্মা লক্ষ্মী-নারায়ণ, অশ্বিনী-কুমার কার্তিক দুর্বাসা—অম্বরীশ, বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণ সীতা ও জনক, দশরথ ও বিশ্বামিত্র, কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা, বিভীষণ, নরসিংহ, হিরণ্যকশিপু বধ ইত্যাদি আরও অনেক মূর্তি।

চুদিকে দেওয়াল দেখে আবার প্রধান দরজায় ফিরে আসি। নামঘরে প্রবেশ করি। কিন্তু একি ঘর! এতবড় একখানি হলঘর এর আগে আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তাঁতকুচির তাঁতিদের তৈরি শঙ্করের সেই বৃন্দাবনীবস্ত্রের আকারে মাধব এই নামঘর নির্মাণ করিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই নামঘরটি লম্বায় ১২০ হাত বা ১৮০ ফুট আর চওড়ায় ৬০ হাত বা ৯০ ফুট। তার মানে ঘরখানি ১৬,২০০ বর্গফুট জমি জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় পাঁচ শ' বছর ধরে। তখন ছিল খড়ের চাল, এখন টিনের। খুঁটিও পালটানো হয়েছে। কিন্তু ক্ষেত্রফলের কোন পরিবর্তন হয় নি।

তবে এর চেয়ে বড় বিস্ময় বোধ করি ছিল সেই বৃন্দাবনীবস্ত্র। তখনকার দিনে তো বটেই, এখনও সচিত্র অতবড় একখানি তাঁতবস্ত্র বয়ন করা কোনমতেই সহজ নয়।

নামঘরের প্রায় শেষদিকে মাঝামাঝি জায়গায় উঁচু সিংহাসনে তিনখানি ভাগবত-আসন। শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমাধবদেব এবং শ্রীমথুরাদাস বুঢা আতার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই আসনের সামনে বসেই নামপ্রসঙ্গ বা নামকীর্তন করা হয়।

কথিত আছে শ্রীমাধবদেব এই নামঘর নির্মাণের পরে ঈর্ষাকাতর বিরুদ্ধবাদীরা রাজার কাছে ক্রমাগত অভিযোগ করতে থাকলেন। বলতে শুরু করলেন, মাধব এই সত্রে বীভৎসলীলা করছেন।

বাধ্য হয়ে রাজা রঘুদেব মাধবকে রাজসভায় ডেকে পাঠালেন। কোচবিহারে রাজদরবারে যাবার সময় মাধব মথুরাদাসকে এই সত্রের ভার দিয়ে গেলেন, তারপর থেকে মথুরাদাসই এই সত্র পরিচালনা

করেছেন। তিনি এখানে রঙ্গালয় নির্মাণ করলেন। নামপ্রসঙ্গ-সহ সত্রের দৈনন্দিন পূজা-পাট সভা-সমিতি ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর কতগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রবর্তন করেন। অনেকে বলেন, বৃন্দাবনী-বস্ত্র এবং বস্ত্রের আকারে নামঘর তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন।

কথা বলতে বলতে আমরা নামঘরের শেষপ্রান্তে এসে গিয়েছি। এখানে দেখছি একপাশে একটা প্রকাণ্ড বড় ঢোল ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। রাধামোহনবাবু আমাদের সেখানেই নিয়ে এলেন। তারপরে ঢোলটাকে দেখিয়ে বলেন—এটাকে আমরা বলি ডামা। প্রসঙ্গ কিম্বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের আগে এটা বাজিয়ে ভক্তদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

—জোর শব্দ হয় বুঝি! দিলীপবাবু জিজ্ঞেস করেন।

—তা তো হয়ই। তবে শব্দটা শ্রুতিমধুর।

—একবার বাজিয়েই দেখান না! ডি. সি. অনুরোধ করেন।

—এটি যখন তখন বাজানো যায় না। তবু আপনারা যখন শুনতে চাইছেন···

অতএব রাধামোহনবাবুর এক সহকারী ডামা বাজালেন। গুরু-গম্ভীর শব্দ শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। আর সেইসঙ্গে আবার মনে পড়ে যায় লাদাখের গুম্ফাগুলির কথা। সেখানে এমনি একটি করে ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র সযত্নে সংরক্ষিত। লামারা সেই ঢোল বাজিয়ে ভক্তদের আমন্ত্রণ করেন।

ডামার বাজনা শুনে মণিকূটে আসি। নামঘরের পেছনে পৃথক একখানি ঘর, অনেকটা মন্দিরের গর্ভগৃহের মতো।

ছোট একখানি ঘর। লোহার দরজা। নামঘরে মূর্তি নেই, এখানে রয়েছে। কাঠের সিংহাসনে খোদাই কাজ, কোন কোন জায়গায় রুপো দিয়ে কারুকার্য। সেই সিংহাসনের ওপরে তিনটি বিগ্রহ—দোলগোবিন্দ, শ্যামরায় ও কালীয়ঠাকুর। সবই পাথরের কৃষ্ণমূর্তি। কথিত আছে, মাধবদেবের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য কোচরাজ রঘুদেব কালীয়ঠাকুরের মূর্তিটি এখানে দান করেছিলেন। বৈষ্ণব মন্দির, তবু অব্রাহ্মণদের এই মূর্তি পূজা করার অধিকার নেই।

কেবল ব্রাহ্মণরাই এখানে পূজা করতে পারেন।

দরজার সামনে বড় একটা মাটির মটকি। ভক্তরা এখানে তেল রেখে যান। এবং এই মটকির তেল কখনই ফুরিয়ে যায় না।

ভেতরে বিগ্রহের সামনে একটা বেশ বড় প্রদীপ জ্বলছে। ঐ মটকি থেকে তেল নিয়ে প্রদীপটি জ্বালানো হচ্ছে। দরজায় তালা লাগানো। তবু প্রদীপে তেল দেবার কোন অসুবিধে নেই। একটা লম্বা হাতা রেখে দেওয়া হয়েছে। হাতায় করে তেল নিয়ে লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে প্রদীপে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে।

প্রদীপ নয়, বন্তি। রুপোর তৈরি প্রকাণ্ড প্রদীপ। এঁরা বলেন—'অক্ষয় বন্তি'। মাধবদেব নাকি এটি প্রথম জ্বালিয়েছিলেন। এবং সেই থেকে এটি জ্বলছে। অর্থাৎ প্রায় পাঁচ শ' বছর ধরে দিবারাত্র প্রদীপটি জ্বলছে। আর তাই এটি অক্ষয় বন্তি।

আমরা কালীয়ঠাকুর এবং তাঁর দুই সঙ্গী দৌলগোবিন্দ ও শ্যামারায়কে সশ্রদ্ধ প্রণাম করি।

রাধামোহনবাবু বলেন—আপনারা আর কোন সত্রে এমন প্রাচীন মূর্তি পাবেন না।

দর্শন শেষে বেরিয়ে আসি বাইরে। কয়েক পা হেঁটে একটি ইটের তৈরি মঠাকৃতি মন্দিরের সামনে আসি। এটি আগে দেখা হয় নি। ভেবেছিলাম দর্শনযোগ্য নয় বলেই ওঁরা আমাদের পাশ কাটিয়ে নামঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এখন রাধামোহনবাবু বলছেন—এই মঠে 'নাম-ঘোষা' পুথি রক্ষিত হচ্ছে। মঠের উঠোনে দোল, বহাগ বিহু ও অন্যান্য উৎসব পালিত হয়। এ সত্রের দোলযাত্রা খুবই বড় উৎসব। আসামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ভক্ত সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। যে সব যাত্রী বিশ্রামভবন কিম্বা যাত্রী নিবাসে জায়গা পান না, স্থানীয় বাসিন্দারা সানন্দে তাঁদের আতিথ্য দান করেন।

আসামের বৃহত্তম সত্র দর্শন করে আবার গাড়িতে এসে ওঠা গেল। এখন আমরা একটা কৃষি সমবায় দেখতে যাচ্ছি। তার মানে

দিলীপবাবু সরকারি কাজে চলেছেন।

বরপেটা শহর ছাড়িয়ে সোজা উত্তরে চলেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাউলি পার হয়ে বরপেটা রোডে আসা গেল। আগেই বলেছি, বরপেটা রোড বরপেটার রেল-স্টেশন এবং সদর বরপেটার চেয়ে বড় শহর, এখান থেকে মানস অভয়ারণ্য খুবই কাছে। কিন্তু আজকাল যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কারণ ভূটান সীমান্তের সেই অভয়ারণ্যটি এখন উগ্রপন্থীদের অবাধ লীলাক্ষেত্র।

রেললাইন পার হয়ে আরও উত্তরে এগিয়ে চলি। কয়েক কিলোমিটার এসে অস্ট্রেলিয়া সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা আসাম সরকারের কোকিলাবাড়ি কৃষি খামার। এখন বন্ধ হয়ে আছে। তারই ভেতরে খানিকটা জায়গা নিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগ একটি কৃষি প্রকল্প চালু করেছেন। সেখানে এসে যাত্রা বিরতি। কারণ এর পরে রাস্তা বড়ই খারাপ। অ্যামবাসাডার যেতে পারবে না। সুতরাং জিপের সওয়ার হতে হল। অনেকখানি কর্দমাক্ত পথ পার হয়ে একটা গ্রামে আসা গেল। গ্রামবাসীরা আমাদের স্বাগত জানালেন।

পঞ্চাশজন সদস্য নিয়ে এখানে একটি কৃষি সমবায়। সদস্যদের সবারই কিছু জমি আছে। কারও ২৩ বিঘা আবার কারও বা ২ বিঘা। কিন্তু সবাই সদস্য। সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ করেছেন। ধান, পাট, শাক-সবজি প্রচুর উৎপন্ন হচ্ছে। এদের নিজেদের নার্সারি রয়েছে, নিজেদের সার এজেন্সি আছে, রয়েছে দুটি শ্যালো-পাম্প।

কিন্তু এ গ্রামে মাছের চাষ হয় না, কারণ পুকুর নেই। দিলীপবাবু সরকারি সাহায্য নিয়ে পুকুর কাটিয়ে তাঁদের মাছ চাষ করার পরামর্শ দিলেন। বাঙালিদের মতো অসমীয়াদেরও প্রধান খাদ্য ডাল ভাত ও মাছ। কিন্তু মাছের বড়ই অভাব আসামে। অন্ধ্রপ্রদেশ আর মধ্যপ্রদেশ থেকেই মাছ এনে গৌহাটি ও অন্যান্য বড় শহরগুলির চাহিদা মেটাতে হচ্ছে।

সমবায়ের সদস্যরা আমাদের চা-বিস্কুট খাওয়ালেন। তারপরে বিদায় নিয়ে আবার গাড়িতে উঠলাম।

ফেরার পথে একটা মৎস্য চাষ প্রকল্প দেখা হল। সরকারি সমবায় নয়। বাংলাদেশ থেকে আগত জনৈক মুসলমান যুবক এই প্রকল্পটি পরিচালনা করছে। কলকাতায় গিয়ে সে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ শিক্ষা করে এসেছে। নিজের বাড়ির সাতটি পুকুর এবং চারিপাশের গ্রামে আরও ষাটটি পুকুর 'লিজ' নিয়ে মাছের চারার চাষ করছে। পুকুরগুলো বড় না হওয়ায় মাছ বড় করতে পারছে না। তাহলেও পরিশ্রমী যুবকটিকে দেখে বড় ভাল লাগল। শুনে খুশি হলাম তার এখানে কাজ করে পনেরোটি পরিবার অন্ন সংস্থান করতে পারছেন।

সার্কিট হাউসে ফিরে আসতে বেলা একটা। খাওয়া শেষ হতে প্রায় দুটো। শ্রীবরা বলে গিয়েছেন সাড়ে তিনটেয় আসবেন। কিন্তু আমি বিশ্রামের সুযোগ পেলাম না। উৎপল এসে জানালো তার নাটকের বন্ধুরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দিলীপবাবু বিশ্রাম করবেন। অতএব উৎপলের ঘরে এলাম।

ওরা তিনজন। সবারই বয়স বছর বিশেক। উৎপলের সঙ্গে গুরাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে কিন্তু সখের থিয়েটার নিয়ে মেতে আছে। দিন দুয়েক আগে এখানে "ৰংঘৰ"ৰ সৌজন্যত ষষ্ঠ বাৰ্ষিক সদৌ অসম একাংকিকা নাট, একক অভিন-য় আৰু চিত্ৰাঙ্কন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, সেই উপলক্ষেই ওরা গৌহাটি থেকে বরপেটা এসেছে। অসমীয়া নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে বরপেটা পথিকৃত। শঙ্করদেব এখানেই লোকশিক্ষার বাহন রূপে নাটকের প্রথম প্রচলন করেছিলেন। তাই একালের রংঘর প্রতিযোগিতা পরিচালনা সমিতি বরপেটাকেই এই প্রতিযোগিতার আদর্শক্ষেত্র রূপে নির্বাচিত করেছেন।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলা গেল। ভাষা সাহিত্য শিল্পকলা ও সংস্কৃতি নিয়েই আলোচনা। ছেলেগুলোকে ভাল লাগে আমার। ওদের বোধকরি ভাল লেগেছে আমাকে। ওরা আমাকে আজ রাতে নাটক দেখার আমন্ত্রণ জানায়।

আমি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারি না। কারণ আমরা ঘন্টা-খানেক বাদেই সুন্দরীদিয়া রওনা হব এবং সেখান থেকে সোজা গৌহাটি ফিরে যাবো।

অবশ্য কথা দিলাম, গৌহাটি থাকলে আমি রবীন্দ্র ভবনে ওদের পরবর্তী নাটক অবশ্যই দেখব। ওরা খুশি হয়ে বিদায় নেয়।

কিন্তু আমি ঘরে ফিরতে পারি না। নন্দিতার স্বামী এসে উপস্থিত হয়। সে নাকি আরও একবার এসে ঘুরে গিয়েছে। ছেলেটিকে ভাল লাগে আমার। সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান যুবক, শিক্ষিত ও ভদ্র। গতকাল বাড়িতে না থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। বলে গুৱাহাটী গেলে অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করবে।

বেশিক্ষণ গল্প করার সুযোগ পাই না। শ্রীবরা ও শ্রীবরুয়া সদলবলে এসে যান।

আজও ঠিক সাড়ে তিনটেয় পথে বেরিয়ে পড়া গেল। বরপেটা শহরের শহরতলি সুন্দরীদিয়া। শহর থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার। সুতরাং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম সত্রের সামনে।

ইট আর সিমেন্ট দিয়ে তৈরি নবনির্মিত তোরণ। এঁরা বলেন দালান।

উৎপলের দাদা ও অধ্যাপক ডঃ গোবিন্দ তালুকদার এবং সত্রের কয়েকজন কর্মকর্তা দাঁড়িয়েছিলেন তোরণের সামনে। তাঁরা আমাদের স্বাগত জানালেন।

তোরণ পার হয়ে ভেতরে আসি। তেমনি প্রাঙ্গণের শেষে নামঘর। বরপেটার চেয়ে কিছু ছোট হলেও প্রশস্ত বারান্দাযুক্ত চৌচালা সুবিশাল হলঘর। দর্শনমাত্র আমার বীরেশ্বরবাবুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি বলেছেন, সুন্দরীদিয়া সত্র অসমীয়া জাতির ঐক্য আর অখণ্ডতার প্রতীক। আগে এ জায়গার নাম ছিল শুধুই সুন্দরী। শ্রীমাধবদেব এখানে এসে দেখতে পেলেন যে, এই গ্রামের মাটি জল বালি আর নারী সবই সুন্দর। এবং এটা একটা 'দিয়া' বা দ্বীপের মতো। তাই তিনি নাম রাখলেন সুন্দরীদিয়া।

সেই নামেই সে আজ সর্বত্র সুপরিচিত।

মাধব যখন এখানে আসেন, তখন সমাজের বড়ই দুঃখের সময়। নিম্নবর্ণের ওপরে উচ্চবর্ণের শোষণ, ধর্মের নামে অনাচার আর অনৈক্যের নাগপাশে সমাজ জর্জরিত। সমাজের ঐক্য আর দেশের অখণ্ডতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেই মাধবদেব এই সত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি এই সত্রের মাধ্যমে জাতি গঠন করতে চেয়েছিলেন। ১৫৭০ সালে তিনি এখানে আসেন ও প্রায় আঠারো বছর অতিবাহিত করেন।

চলতে চলতে গোবিন্দবাবু বলেন—আগে অন্যান্য স্থানগুলো দর্শন করে নিন, তারপরে নামঘর দেখবেন।

নামঘরের বাঁদিকে একটি মঠাকৃতি মন্দির। ওঁরা বলেন, শ্রীমাধবদেবের কীর্তনঘর।

আমরা সেখানেই আসি। কয়েকজন ভক্ত ভেতরে বসে কীর্তন করছেন। সঙ্গে খোল-করতালও রয়েছে।

প্রণাম করে এগিয়ে চলি। কীর্তনঘরের পাশেই ছোট একখানি পাকাঘর। ওরা বলেন, মাধবদেব এইঘরে বসে মথুরাদাস বুঢ়া আর্তাকে দীক্ষাদান করেছিলেন।

আই গোহানীর বাসগৃহের সামনে আসি। মেঝে বাঁধানো ও চারিদিকে ইটের দেয়াল। দোচালা টিনের ঘর। সামনে চওড়া বারান্দা।

তারপরে কলয়া কীর্তনঘর ও যক্ষখেদা ভিটে দেখে মাধবদেবের পাতকুয়োর কাছে আসি। মাধবদেব এই পাতকুয়োর জল ব্যবহার করতেন। তাই চারিদিকে দেওয়াল এবং ওপরে চাল দিয়ে কুয়োটিকে সযত্নে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

উৎপল বলে—চলুন, আগে আদিভিটা দর্শন করে আসবেন, তারপরে নামঘরে যাওয়া যাবে।

প্রস্তাবটা সবারই পছন্দ হয়। সুতরাং আমরা নামঘরকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলি। সত্রের এলাকা ছাড়িয়ে খানিকটা জলা-জমি তারই ওপর দিয়ে পায়ে-চলা পথ। একটা চমৎকার বাঁশের সাঁকো।

বহুদিন এমন সাঁকো পার হই নি।

রাস্তায় উঠেই উৎপল ইসারা করে বলে—ঐ যে বীরেশ্বর স্যারের বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

আমরা দেখি। উৎপল আবার বলে—স্যার ঐ বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছেন।

—হ্যাঁ। দিলীপবাবু বলেন—তুমিও তো এখানেই জন্মেছো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। উৎপলের দাদা বলে ওঠেন—আমার বাড়িতে। আপনাদের নিয়ে যাবো সেখানে।

উৎপল আর কোন কথা বলতে পারে না।

একটু বাদেই আমরা আদি ভিটের সামনে এসে পৌঁছই। তোরণ-যুক্ত মন্দিরাকৃতি একখানি বাসগৃহ। সামনে লেখা—'আদি ভিঠি। মহাপুরুষ শ্রীমাধবদেব ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে এই ভিঠিতে বাসগৃহ স্থাপন করেন।'

গোবিন্দবাবু বলেন—১৯৮৯ সালে মহাপুরুষের পঞ্চশতবর্ষ জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে সেই ভিটের ওপরে এই স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।

আমরা দর্শন করি, প্রণাম করি। আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তারপরে ফিরে চলি নামঘরের দিকে।

চলতে চলতে গোবিন্দবাবু বলতে থাকেন—শ্রীশঙ্করদেব প্রথম পাটবাউসি আসেন। তিনি সাড়ে আঠারো বছর পাটবাউসি ছিলেন। সেইসময় শ্রীমাধবদেব গণককুচিতে থাকতেন। সেখানেও সত্র আছে। তারপরে শঙ্করদেব যখন কোচবিহারের মধুপুরে চলে যান, তখন তিনি মাধবদেবকে এ অঞ্চলে ধর্মপ্রচার ও সত্ররক্ষার দায়িত্ব দিয়ে যান। মাধবদেব তখন এই সুন্দরীদিয়া সত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পাটবাউসি সত্র পরিচালনা এবং সেখানে শঙ্করদেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দেখাশোনাও করতেন।

তিনি মথুরাদাস বুঢ়া আতার পরামর্শে ভাগ্নে রামচরণ ঠাকুরের হাতে এই সত্রের দায়িত্ব দিয়ে বরপেটা চলে যান। অনেকে বলেন

বরপেটার ভক্তর। তাঁকে প্রায় জোর করেই সেখানে ধরে নিয়ে যান।

আমরা নামঘরের সামনে ফিরে এসেছি। এ নামঘরের কাঠের দেয়ালেও দেখছি চমৎকার খোদাই কাজ, দারুশিল্পের উন্নত নিদর্শন।

নামঘরে প্রবেশ করি। বরপেটার চেয়ে আকারে কিছু ছোট হলেও সুবিশাল নামঘর। তেমনি তিনখানি আসন—শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমাধবদেব ও শ্রীরামচরণ ঠাকুরের নামে।

প্রণাম করে মণিকুটে আসি। এখানেও বন্তি জ্বলছে। তবে প্রদীপটি পুবমুখী করে রাখা। এটি নাকি এই সত্রের বৈশিষ্ট্য।

মণিকুটে বংশীগোপালরূপী কৃষ্ণমূর্তি। প্রতিদিন পূজা হয়। আমরা প্রণাম করি।

তারপরে সবার সঙ্গে পাশের ঘরে আসি। ঘরে ভেতরে একটা কুয়া। কেবল পূজার জন্য এই জল ব্যবহৃত হয়।

ফিরে আসি নামঘরে। একপাশে কিছু বাসনপত্র পড়ে আছে। তার মধ্যে কয়েকটা পেতলের সরিয়া (অনেকটা কড়াইয়ের মতো) রীতিমত দর্শনীয়। একসঙ্গে দশ-বারো মণ চাল সেদ্ধ করা যায়।

গোবিন্দবাবু বলেন—এই সত্রে প্রধান উৎসব হয় শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমাধবদেব, শ্রীমথুরাদাস ও শ্রীরামচরণের তিরোভাব তিথিতে।

দর্শন শেষে বেরিয়ে আসি সুন্দরীদিয়া সত্র থেকে। কিন্তু গাড়িতে উঠতে পারি না। উৎপলের দাদা হেসে বলেন—উৎপলের জন্মভিটে যে দর্শন করতে হবে একবার।

দিলীপবাবু হেসে বলেন—তার মানে আপনার বাড়িতে একবার যেতে হবে, এই তো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিন্তু ছ'টা বাজে। আমরা গুরাহাটী ফিরব।

—বেশিক্ষণ আটকে রাখব না স্যার। দয়া করে একবারটি পায়ের ধূলো দিতেই হবে।

অতএব আর আপত্তি করা সম্ভব হয় না।

কাছেই বাড়ি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাই। শুধু

তার জন্মস্থান দর্শন নয়, পরিচয় হয় উৎপলের পরিবার পরিজনের সঙ্গে আর জুটে যায় চা ও জলখাবার। এবং বলাবাহুল্য উৎপলের দাদা এই উদ্দেশেই নিয়ে এসেছেন আমাদের।

সেইসঙ্গে একটা বাড়তি প্রাপ্তি হয় আমার। গোবিন্দবাবু দুখানি বই দিলেন। সুন্দরীদিয়া সত্র থেকে প্রকাশিত শ্রীমাধবদেবের জন্ম-পঞ্চশত বার্ষিকী স্মৃতি সঙ্কলন এবং মাধবদেবের জীবনী। দেখে ভাল লাগল সঙ্কলনে বন্ধুবর বীরেশ্বর বরুয়ার একটি প্রবন্ধ রয়েছে।

অবশেষে বিদায়ের পালা। বিদায় নিই উৎপলের পরিবার ও প্রিয়জনের কাছ থেকে। বিদায় নিই সুন্দরীদিয়া থেকে। বিদায় নিই বরপেটার কাছ থেকে। শঙ্করদেব ও মাধবদেবের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত বরপেটা, বৈষ্ণবতীর্থ বরপেটা। শান্তি ও মৈত্রী, ঐক্য ও সংহতির পুণ্যভূমি বরপেটা। সমাজবাদের আদিপীঠ বরপেটা, তোমাকে প্রণাম।

গাড়ি ছুটে চলেছে গৌহাটির পথে। সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে পথে। এভাবে চলতে পারলে আশা করছি ন'টা নাগাদ গৌহাটি পৌঁছে যাবো।

কিন্তু আমি বরপেটা কিম্বা গুৱাহাটীর কথা ভাবছি না। আমি ভেবে চলেছি শ্রীমাধবদেবের কথা। নিতাই না হলে যেমন গৌর হয় না, নরেন না হলে যেমন রামকৃষ্ণ হয় না, তেমনি মাধব না হলেও শঙ্কর হয় না।

মহাপুরুষ শ্রীমাধবদেবের আদিনিবাস বঙ্গদেশের রংপুর জেলায়, বাণ্ডুকা গ্রামে। তাঁর পিতা গোবিন্দগিরি ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি এক জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন। একটি পুত্রসন্তানকে জন্মদান করে তাঁর স্ত্রী অমুচিতা দেবী দেহরক্ষা করলেন। তিনি সেই পুত্রের নাম রাখলেন দামোদর। পুত্র উপযুক্ত হয়ে ওঠার পরে গোবিন্দগিরি তাঁর বিয়ে দিলেন। তারপরে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন অহোমরাজ্যে, নগাঁও-য়ের বরদোয়ায়।

জমিদারির কাজে অভিজ্ঞ গোবিন্দগিরি কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় ভূঞাদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। তাঁরা তাঁকে আবার সংসার পাতার পরামর্শ দিলেন। এবং প্রায় জোর করেই তাঁদেরই বংশের এক পরমাসুন্দরী কন্যা মনোরমার সঙ্গে তাঁকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলেন। সৎ সুপণ্ডিত অমায়িক ও পরিশ্রমী গোবিন্দগিরি সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সুখ ও শান্তিতে সংসার করতে থাকলেন।

এইসময় শুরু হল কছারি উপদ্রব. আরম্ভ হল সন্ত্রাসের রাজত্ব। প্রাণের ভয়ে ভূঞাদের অনেকেই ব্রহ্মপুত্রে উত্তরপারে চলে এলেন। তাঁদের সঙ্গে গোবিন্দগিরিও এলেন উত্তর লখিমপুরে। সেখানেই ১৪১১ শকের (১৪৮৯ খ্রিঃ) জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা-প্রতিপদে মনোরমার একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করলেন। ধরাধামে আবির্ভূত হলেন মহাপুরুষ শ্রীমাধবদেব।

শিশুকাল থেকেই মাধব ধীর স্থির সাহসী ও সুন্দর। শৈশবেই তাঁর মধ্যে মহাপুরুষের অলৌকিক লক্ষণসমূহ দেখা যেতে থাকল। তাঁদের আশ্রয়দাতা হরিশিঙা বরা মাধবকে বড়ই স্নেহ করতেন। তিনি তাঁর লেখা-পড়া শেখার সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন। মাধব কিন্তু লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ় পিতাকে চাষ-বাসে সাধ্যমত সাহায্য করতেন।

এইসময় হরিশিঙা মারা গেলেন। গোবিন্দগিরি সহায়হীন হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে চলে যেতে হল সুবনসিরি উপত্যকায় ঘাগর মাঝির আশ্রয়ে। মাঝি তাঁকে চাষের জমি দিলেন। তিনিও মাধবের লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। পড়াশুনা বজায় রেখে মাধব পিতাকে চাষ-বাসে সাহায্য করতে থাকলেন।

ইতিমধ্যে মনোরমার একটি মেয়ে হয়েছে। ভারি সুন্দর মেয়ে। মাধব বোনের নাম রেখেছেন উর্বশী। আস্তে আস্তে উর্বশীও বড় হয়ে উঠেছে। মেয়ের বিয়ের চিন্তায় দরিদ্র পিতার আহার-নিদ্রা ঘুচে যাবার যোগাড় হল।

এইসময় একদিন বেলগুড়ি গায়ের যুবক ভূঞা রামদাস ওরফে

গয়াপাণির সঙ্গে মাধবের পরিচয় ঘটল। কিছুকালের মধ্যেই সে পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হল। মাধবের অনুরোধে গয়াপাণি উর্বশীর পাণিগ্রহণ করতে সম্মত হলেন। শুভদিনে শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হল।

মেয়ের বিয়ের পরে স্ত্রীকে উর্বশীর কাছে রেখে মাধবকে নিয়ে গোবিন্দ ফিরে গেলেন বাণ্ডুকা। বড়ছেলে দামোদর এতদিন পরে বাবাকে কাছে পেয়ে খুবই খুশি হলেন। ছোটভাই মাধবকে তিনি বুকে টেনে নিলেন। গ্রামের একজন বিদগ্ধ শিক্ষকের কাছে তাঁর লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই মেধাবী মাধব কায়স্থ বৃত্তি, ন্যায়, তর্কশাস্ত্র এবং নিত্যকর্ম পদ্ধতিতে প্রভূত পারদর্শী হয়ে উঠলেন। কিন্তু ভগবান বোধকরি মাধবের সুখ সইতে পারলেন না। গোবিন্দগিরি হঠাৎ ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। দু-ভাই পিতার পারলৌকিক কর্ম সম্পাদন করলেন। তারপরে দাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাধব মায়ের কাছে ফিরে এলেন।

মুণ্ডিত মস্তক মাধবকে দেখেই মা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অনেক চেষ্টায় তাঁর জ্ঞান ফেরানো গেল কিন্তু তাঁকে শয্যা থেকে তোলা গেল না। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

মাধব মায়ের রোগমুক্তি কামনা করে মা-দুর্গার কাছে পাঁঠাবলি মানত করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই মা অনেকটা ভাল হয়ে গেলেন। মাধব ভগ্নীপতি গয়াপাণিকে পাঁঠা কিনে আনতে বললেন। শেষ পর্যন্ত গয়াপানি পাঠা না এনে মাধবকে নিয়ে গেলেন শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের কাছে। শঙ্করের কাছে তর্কে পরাজিত হয়ে শাক্ত মাধব ভক্ত বৈষ্ণবে রূপান্তরিত হলেন। শঙ্করও 'প্রাণ-বান্ধব' বলে মাধবকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মণি-কাঞ্চন যোগ হয়ে গেল। মাধব ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে সন্ন্যাস জীবন-যাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

কিন্তু মাধবের মধুর স্বভাব, প্রখর পাণ্ডিত্য ও অপরূপ দেহশ্রী গুরুপত্নীর হৃদয়ে বাৎসল্য সঞ্চার করল। তিনি একদিন মাধবকে বলে ফেললেন—শিষ্য নয়, তোমাকে আমি পুত্রের স্থান দিতে চাই, তুমি

আমার মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে গ্রহণ করে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো।

বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মাধব তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁধে নিয়ে আবার গুরুদেব ও গুরুমাতার কাছে ফিরে এলেন। বললেন —দেখুন মা, এই মুহূর্ত থেকে আমি আমার অতি আদরের গুরু-কন্যাকে ভগ্নীরূপে গ্রহণ করলাম।

চরিত্রবান শিষ্যের আচরণে গুরুদেব সন্তুষ্ট হলেন কিন্তু গুরুমাতা লজ্জা পেলেন। জামাতা নয়, তিনি মাধবকে পুত্র বলেই গ্রহণ করলেন।

তারপরেই শঙ্করবিরোধীদের প্ররোচনায় অহোমরাজের অত্যাচার। প্রাণভয়ে সদলবলে শঙ্করের ধুয়াহাট হয়ে পাটবাউসি চলে আসা। জামাতা হরি ভূঞার প্রাণদণ্ড এবং মাধবের হাজোতে নির্বাসন।

রাজদরবারে যখন তাঁদের বিচার চলছিল, তখন হরি ভূঞা মাধবকে বললেন—আগে যদি আমাকে হত্যা করে, তাহলে তুমি আমাকে স্মরণ করবে। আর আগে তোমার শিরশ্ছেদ হলে আমি তোমাকে স্মরণ করব।

রাজা হরি ভূঞাকে হত্যা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাধবের শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হল—

'ভয়ো ভাই সাবধান
যাবে নাহি চুটে প্রাণ।
গোবিন্দর ফরমান,
নিকটে মিলাবে জান।
জীবন-যৌবন ঠোর,
সবে মায়াময় চোর।
দুঃখ সব করা দুর,
হরি পদে মন জুর।
ত্যাজ্য সব অভিলাষ
দুর করা মহাপাশ।
হরি পদে করা আশ,
কহয় মাধব দাস।'

কিছুকাল পরে মাধবের মা মারা গেলেন। সংসারের সঙ্গে তাঁর শেষ সূত্রটিও ছিন্ন হল। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে শ্রীগুরু এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করলেন।

এইসময় একদিন ভবানন্দ সাউদ নামে জনৈক ভক্ত শঙ্করদেবকে দর্শন করতে এলেন। তিনি শঙ্করের সামনে এসে 'নারায়ণ' বলে প্রণিপাত করলেন। তার সঙ্গে আলাপ করে শঙ্কর প্রীত হলেন। তাঁকে বললেন—চার বেদের সারবস্তু পরমমঙ্গলময় নারায়ণের নামগান করে তুমি আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছো। তাই আজ থেকে আমি তোমার নাম রাখলাম নারায়ণদাস। কালক্রমে নারায়ণদাস এক-শরণ ধর্মের একজন প্রধান প্রচারক রূপে স্বীকৃত হয়েছেন।

যাকৃগে, আবার শঙ্করদেব ও মাধবদেবের কথায় ফিরে আসা যাক। শঙ্করদেব তখন পাটবাউসিতে সত্র স্থাপন করেছেন। অনেকে বলেন সেখানে বসে শঙ্কর এক-শরণ ধর্মের পাট সঞ্চার করেছিলেন বলেই বাউসী পরগণার ঐ পুণ্যতীর্থের নাম হয়েছে পাটবাউসী।

মাধবদেব তখন গণককুচিতে বাস করছিলেন। সেখানে তিনি একটি সত্রও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে তিনি মাঝে মাঝেই পাট-বাউসি এসে গুরুকে দর্শন করে যান।

একদিন যখন তিনি গণককুচি থেকে পাটবাউসি যাচ্ছিলেন, তখন পথে জনৈক পথচারী ব্রাহ্মণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি এমন মাঝে মাঝেই পাটবাউসি যাও কেন?

—আমি আমার গুরুদেবকে দর্শন করতে যাই।

—কে তোমার গুরু?

—শ্রীশ্রীশঙ্করদেব।

ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গে পাটবাউসি চলে এলেন এবং শঙ্করের দর্শন পাবার পরে বৈষ্ণব হয়ে গেলেন।

এদিকে তখন গুরু ও শিষ্য দুজনেই সাহিত্যচর্চায় মন দিয়েছেন। গুরু ভাগবতের অনুবাদ করে চলেছেন আর শিষ্য রচনা করছেন বিভিন্ন বৈষ্ণব সাহিত্য সম্ভার।

একদিন গুরু শিষ্যকে বললেন—বড়ার পো তুমি এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করো যাতে বিশ্বস্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মা থেকে আদিকবি বাল্মীকি পর্যন্ত সবার নাম-কীর্তন করা হয়।

এইসময় শঙ্করদেব মাধবদেব দামোদরদেব ও হরিদেব প্রভৃতির মিলনে পাটবাউসি সত্র শাস্ত্র আলোচনার এক মুখ্যস্থলে পরিণত হয়ে উঠেছিল। এবং এক-শরণ ধর্মের সার্বজনীনতায় আকৃষ্ট হয়ে জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দলে দলে মানুষ ছুটে আসছিলেন।

তারপরে শঙ্করদেব কোচবিহারের মধুপুরে চলে গেলেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করলেন।

শঙ্করদেবের অবর্তমানে পাটবাউসি সত্র এবং গুরুপত্নীকে দেখা-শোনা করার জন্য মাধবদেব গণককুচি থেকে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। একদিন কথায় কথায় গুরুপত্নী তাঁকে জিজ্ঞেস করে ফেললেন—আচ্ছা মাধব, তুমি সত্যি করে বলো তো, তুমি আমাকে কি ভাবো?

—তুমি আমার মা। আমার বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী। মা, তোমাকে আমি আমার অর্ধেক শরীর বলে জ্ঞান করি।

—তাহলে, তুমি বাবা! সুন্দরীদিয়ায় এসে থাকো।

গুরুমায়ের আদেশ শিরোধার্য করে মাধব গণককুচি থেকে সুন্দরীদিয়ায় চলে এলেন। থীরামরলের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিলেন। কিছুক্ষণ আগে আমরা সেই আদিভিটা দর্শন করে ধন্য হয়েছি।

সুন্দরীদিয়ায় বসেই মাধবদেব তাঁর ভক্তিরত্নাবলী সম্পাদনা করেছেন। এই সম্পাদনা তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

তাঁর বোন উর্বশী সুন্দরীদিয়ায় এসে নিয়মিত নামকীর্তনে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁকে দেখে আরও সব মেয়েরা আসতে শুরু করলেন। মেয়েদের নামগানে অংশ নিতে দেখে মাধব ভারি খুশি হতেন। একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, যেসব পুণ্যবতী মহিলারা নামগানে অংশ নেবেন, তাঁদের "আই" বলে সম্বোধন করতে হবে।

তাই বোধকরি মাধবদেব মেয়েদের নামঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে

পারেন না। তাহলে কে এই নিয়ম প্রবর্তন করেছেন? আর কেনই বা এই কুপ্রথা আজও প্রচলিত রয়েছে?

সুন্দরীদিয়া সত্র প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরেই মাধবদেব নারায়ণদাস ঠাকুরকে তাঁর প্রিয় পার্শ্বচর রূপে পেয়ে গেলেন। নারায়ণদাসের অক্লান্ত পরিশ্রম ত্যাগ আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ে সুন্দরীদিয়া সত্র এক-শরণ ভক্তিধর্মের প্রধান পাদপীঠে পরিণত হল। মথুরাদাস বুঢ়া আতা, বরবিষ্ণু আতা, কেশবচরণ আতা, বিষ্ণু আতা, গোপাল আতা, জনার্দন আতা, হরিহর আতা, হরিকৃষ্ণ আতা, হরিবল্লভ আতা, গোবিন্দ আতা ও লক্ষ্মীকান্ত আতা প্রমুখ সেকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠিত মানুষদের আগমনে সুন্দরীদিয়া আসামের সমাজ-জীবনে অক্ষয় স্থান করে নিল। এইসব ধর্মনেতারা পরবর্তী-কালে মাধবদেবের নির্দেশে সারা অহোম এবং কোচরাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে নানা স্থানে সত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। ফলে আসাম ও উত্তরবঙ্গ একসূত্রে গ্রথিত হয়ে শঙ্করদেবের সমাজবাদকে সত্য করে তুলল।

মাধবদেব সুন্দরীদিয়া থেকে বরপেটা চলে এসেছিলেন। তিনি বরপেটা সত্রে আট বছর অতিবাহিত করেছেন। তখন বরপেটা এক-শরণ ধর্মের কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে।

তাঁর ধর্মবিজয়ে ধর্মব্যবসায়ীরা আবার ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়লেন। তাঁরা রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ দায়ের করলেন। রাজা সেসব বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু প্রজাপালনের প্রয়োজনে তাঁকে মাধবদেবকে ডেকে পাঠাতে হল।

রাজার আদেশ অমান্য করা উচিত নয়। মাধবদেব তাই বরপেটা সত্রের ভার মথুরাদাসের হাতে দিয়ে অন্যসব সত্রের ধর্মাচার্যদের ডেকে পাঠালেন। সুন্দরীদিয়ার রামচরণ ঠাকুর, চমরিয়ার বরবিষ্ণু আতা, নগাঁওয়ের বরজহা ও লাইআটি সত্রের কেশবচরণ ও হরি আতা, মাজুলির বংশীগোপাল, কমলাবাড়ির বদলা, কামরূপের গোপাল সুয়ালকুচির লক্ষ্মীকান্ত. মঙ্গলদইয়ের গোবিন্দ প্রভৃতি প্রায় সব সত্রের আচার্যগণ উপস্থিত হলেন। মাধব তাঁদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও

পরামর্শ দান করলেন। তারপরে সবার শুভেচ্ছা নিয়ে রাজধানীর পথে যাত্রা করলেন।

রাজসভায় এবারও বিরোধীরা সুবিধে করতে পারলেন না। মাধবের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ফল্গুধারায় তাঁদের সকল অভিযোগ খড়কুটোর মতো ভেসে গেল। তাঁরা এক-শরণ ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও উদারতাকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

রাজাও মাধবদেবের ধর্ম ব্যাখ্যা শুনে বড়ই প্রীত হলেন। তিনি নিজেও এক-শরণ ধর্মমত গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজসভায় ধন্য ধন্য রব উঠল।

কিন্তু সভা শান্ত হবার পরে মাধবদেব সবিনয়ে রাজাকে বললেন —আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মহারাজ, আমি আপনাকে দীক্ষা দিতে পারব না।

—কেন? রাজা বিস্মিত।

মাধবদেব উত্তর দিলেন—মহারাজ, রাজধর্ম রক্ষা করে গুরুধর্মের নিয়মনীতি পালন করা সম্ভব নয়। আর তাই বিবাহিত রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে সংসার পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী বুদ্ধদেব হতে হয়েছিল।

রাজা কিন্তু তাঁর যুক্তি মেনে নিলেন না। বললেন—আজ আপনি আমাকে আশ্রয় দান করলেন না। কিন্তু আমি যদি অন্তরে এই বাসনা বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তাহলে একদিন নিশ্চয়ই আমি আপনার চরণে ঠাঁই পেয়ে যাবো।

রাজার বাসনা কিন্তু পূর্ণ হল না। মাধবদেব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে তিনি তাঁকে প্রাসাদে নিতে আসার জন্য দোলা পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু মাধব তখন যোগাসনে সমাসীন হয়ে হরিনাম শুরু করে দিয়েছেন। রামচরণ ঠাকুর সহ সবাই কেঁদে ব্যাকুল হচ্ছেন। ভক্তের ভগবান তাঁদের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করলেন না। হরিনামরত মাধবকে তিনি কাছে টেনে নিলেন। মহাপুরুষ মাধবদেব মর্ত্যলীলা সংবরণ করলেন। সেদিন ১৫১৮ শকের (১৫৯৬ খ্রিঃ) ভাদ্র কৃষ্ণ-পঞ্চমী। তখন তাঁর বয়স ১০৭ বছর।

মহাপুরুষ মাধবদেবের বিয়োগব্যথায় সেদিন সারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা কান্নায় ভরে উঠেছিল। এবং সেদিন আসামের সমাজ-জীবনে যে শূন্যতা সৃষ্ট হয়েছে, তা আজও পূরণ করা সম্ভব হয় নি। হবার কোন সম্ভাবনাও নেই।

সুতরাং আজ আমরা শুধু তাঁর এবং তাঁর গুরুদেবের অক্ষয় আত্মার আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে পারি। বলতে পারি—তোমরা আমাদের প্রেম দাও, ত্যাগ দাও, জ্ঞান দাও। তোমরা আমাদের মানুষ করে তোলো। আর তাহলেই আমরা কেবল তোমাদের যোগ্য হয়ে উঠতে পারব। তোমরা আমাদের প্রাণের প্রণতি গ্রহণ করো।

॥ ষোলো ॥

আমাদের বত্রিশ নম্বর বিয়ের সাজে সেজেছে। আর শুধুই বা বত্রিশ বলি কেন? সেই সঙ্গে একত্রিশ মানে ধীরেনবাবুর দাদার বাড়ি এবং তেত্রিশ মানে তাঁর দিদির ফাঁকা জমি। বিরাট এলাকা জুড়ে প্যাণ্ডেল। শুধু প্যাণ্ডেল করতেই নাকি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা খরচ পড়েছে।

তবে বিয়ে কিন্তু আমাদের বাড়ির কারও নয়। ধীরেনবাবুর বড় ভাইপোর বিয়ে। দাদা নেই সুতরাং তিনিই বর-কর্তা। তাঁকেই সব তদারকি করতে হচ্ছে। তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে কিছু কম ব্যস্ত নয় আর সেই ব্যস্ততার কিছু ছোঁয়া আমাদেরও গায়ে এসে লেগেছে। যেমন এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অশোক আজ কলকাতা থেকে বিমানে গৌহাটি এসেছে। অর্থাৎ আমরা এখন আর শুধু ভাড়াটে নই, সেইসঙ্গে ওঁদের পরিবারের সদস্য হয়ে গিয়েছি।

আগামীকাল. বিয়ে, আজ জোরণ। জোরণ মানে বোধকরি আত্মীয়তা জুড়ে দেওয়া। অনুষ্ঠানটি হবে পাত্রীর বাড়িতে এবং পাত্রের তাতে কোন ভূমিকা নেই। ছেলের বাড়ির লোকেরা গয়না-গাটি কাপড়-চোপড ও খাবার-দাবার নিয়ে কনের বাড়িতে যাবেন। আগেই বলেছি, শ্রীশঙ্করদেবের প্রভাবে আজও আসামে পণপ্রথার শোষণ নেই। বরং পাত্রপক্ষ জোরণের সময় সাধ্যমত মেয়ের উপহার ও তার বাড়ির লোকজনের জন্য খাবার-দাবার নিয়ে যান। খাবার-দাবার বলতে চাল-ডাল তরি-তরকারি মাছ মিষ্টি ও পান-সুপারি। সেখানে পেতলের বটা বা পানদান বিনিময়ের মাধ্যমে দু-পক্ষের সম্পর্ক জোড়া লাগানো হয়।

তারপরে মেয়েকে সিঁদুর পরানো। বিয়ের আগেই বরের অনুপস্থিতিতে কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন বরের মা, অথবা মাতৃস্থানীয়া কেউ। ধীরেনবাবু ভাইপোর ভাবী স্ত্রীকে সিঁদুর পরিয়েছেন

তাঁর বৌদি মানে কনের বিধবা শাশুড়ী। আমাদের সমাজে যেখানে বিধবারা বিয়ের কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন না, সেখানে ব্যাপারটা খুকুদের কাছে খুবই বিস্ময়কর ঠেকেছে।

খুকু বুলা বন্দিতা ও মিসেস হরগোপাল পাত্রপক্ষের সঙ্গে জোরণে গিয়েছিল। দলে মেয়েদের সংখ্যাই ছিল বেশি। পুরুষ বলতে পাত্রের অভিভাবক স্থানীয় কয়েকজন ও তার ভাই এবং বন্ধুরা।

যাবার সময় আরেকটা ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়েছি। আমাদের, কেবল আমাদেরই বা বলি কেন, ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই দেখেছি বরের বাড়ি কিম্বা কনের বাড়ি যাবার সময় মেয়েরা তাঁদের সবচেয়ে জাঁকালো মানে চটকদার রঙিন পোশাক পরে নেন। কিন্তু এখানে দেখলাম, সবাই সাদা কিম্বা খুবই হালকা রঙের মেখলা অথবা শাড়ি পরে গেলেন। বন্দিতার কাছ থেকে খুকু ও বুলা আগেই খবরটা পেয়ে গিয়েছিল। তাই ওদের অসুবিধেয় পড়তে হয় নি। কিন্তু মিসেস হরগোপাল অন্ধ্রের মেয়ে। তিনি তাঁদের দেশের নিয়ম মতো প্রথমে একখানি লাল বেনারসী পরে ভারি লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি ওপরে এসে শাড়ি পাল্টে গিয়েছেন।

আমরা বিয়ে বাড়ি যাই সন্ধ্যার সময় আর ওঁরা গেলেন দুপুরবেলা। ফিরে এলেন বিকেলে। এসে খুকু ও বুলা তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলছিল। আমি আর অশোক চা খেতে খেতে শুনছিলাম সেসব কথা। ওরা বলছে—এঁদের মধ্যে পণপ্রথা নেই, দাবি-দাওয়া নেই। কিন্তু তাই বলে ভেবো না, মেয়ে-জামাইকে এঁরা কিছুই দেন না। যৌতুক না থাকলেও উপহার দেবার নিয়ম আছে। ওখানে তো দেখে এলাম গয়না থেকে শুরু করে সব কিছুই দিয়েছেন। আর দেখে এলাম প্যাণ্ডেল। এঁরা যদি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে থাকেন, ওঁরা করেছেন লাখখানেক টাকা।

এই বিয়ের ব্যাপারে আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন কথায় কথায় ধীরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনাদের নিমন্ত্রিত কত?

—দেড় হাজার।

আঁতকে উঠেছি। বলেছি—সে কি মশাই। শুধু খাওয়াতেই তো লক্ষাধিক টাকা লেগে যাবে।

—না, না। ধীরেনবাবু হেসে বলেছেন—এ আপনাদের মতো কনুই ডুবিয়ে খাওয়া নয়। খাওয়া মানে খানদুয়েক লুচি একটু ডাল-তরকারি আর গুটিদুয়েক মিষ্টি। এখানে কেউ বাড়িতে 'নো মিল' করে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে আসেন না।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। তারপরে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে আবার বললেন—নিয়মটা ভাল লাগে না আমার। মানুষকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে ডেকে এনে এসব খাওয়াবার কোন মানে হয় না। তাই আমি ঠিক করেছি, আগামী বছর আমার মেয়ের বিয়েতে আমি মাছ-মাংস আইসক্রিম, সবই খাওয়াবো, আপনাদের মতো করে খাওয়াবো। এবং যেখানেই থাকুন, আপনারা কিন্তু আসবেন বলে কথা দিয়েছেন।

আমরা মৃদু হেসে মাথা নেড়েছি।

গতকাল এ বাড়িতে তেমন ব্যস্ততা ছিল না। কারণ জোরণের সব ব্যাপারটাই হয়েছে মেয়ের বাড়িতে। কেবল রওনা হবার সময় কিছু ডাকা-ডাকি হাঁকা-হাঁকি। আর ফিরে আসার পরে কিছু আলাপ-আলোচনা। কিন্তু আজ বিয়ে। যিনি যতটুকুই খান, দেড় হাজার লোকের আদর-আপ্যায়ন। সুতরাং সকাল থেকেই কর্ম ব্যস্ততা। খাবারের সব ব্যাপারটাই হচ্ছে পাশের ফাঁকা জমিতে। এ দু-বাড়িতে শুধুই 'রিসেপশান।' অতএব আলো আর ফুলের অঢেল ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে কিছু গান-বাজনা। তবে আমরা মাইকের অত্যাচারে মোটেই জর্জরিত নই। গান বাজছে, কিন্তু এই দোতলা থেকেও তার সামান্যই কানে আসছে।

সন্ধে হতেই নিমন্ত্রিতরা আসতে আরম্ভ করে দিলেন। খাওয়াও শুরু হয়ে গেল। পাত্র নিজেই অভ্যাগতদের দেখাশোনা করছে। রাত বাড়ছে কিন্তু তার সাজগোছ করার নাম নেই।

সুযোগ পেয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করে ফেললাম বরকর্তাকে। তিনি

বলেন—আমরা তো ও বাড়িতে রওনা হচ্ছি রাত বারোটার পরে। মানে দু-বাড়িতেই এই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যাবার পরেই তো বিয়ে। এখন যে সবে রাত ন'টা, বরের সাজগোছ করতে আর কতক্ষণ লাগবে?

—তা বিয়ে কখন শেষ হবে?

—সে ধরুন গিয়ে প্রায় ভোর রাতে।

—বর-কনে কখন এ বাড়িতে আসবে?

—কাল সকালে, বিয়ের পরে। কনে তো আবার চলে যাবে।

—কোথায়?

—কেন! তার বাপের বাড়িতে।

আমরা একটু অবাক হই।

ধীরেনবাবু বলেন—হ্যাঁ, বিয়ের পরে বরের সঙ্গে কনে এ বাড়িতে চলে আসবে। ওরা আসার পরে কিছু স্ত্রীয়াচার হবে। তারপরে শাশুড়ি নতুন বউকে নিয়ে যাবে রান্নাঘরে। সেখানে ডাল-ভাত মাছ মিষ্টান্ন ইত্যাদি রান্না করা থাকবে। নতুন বউ সেগুলি স্পর্শ করবে। তারপরে সে ফিরে যাবে বাপের বাড়িতে। কারণ কালরাত্রিতে দেখা হতে নেই স্বামীর সঙ্গে। পরদিন সে চলে আসবে শ্বশুরবাড়ি। তখন থেকে সে এ বাড়ির বউ।

আমরা বিয়েতে যাই নি। কারণ বিয়েতে কেবল ওঁদের নিকট আত্মীয় কয়েকজন ও পাত্রের বন্ধুরা গিয়েছে। তবু ওদের রওনা হওয়া পর্যন্ত জেগে ছিলাম! শুতে রাত একটা বেজে গিয়েছে। তাই আজ সকালে আর প্রাতঃভ্রমণে বের হই নি। এবং উঠি-উঠি করেও বিছানা ছাড়তে পারছিলাম না। এমন সময় প্রভাত ঘরে এসে জানালো—দাদু, সেদিনের সেই ছেলেটি এসেছে, সঙ্গে একটি মেয়ে।

এই সাতসকালে কে এলো? সেদিনের ছেলেটি বলতে সে কাকে বোঝাচ্ছে বুঝতে পারি না। আমার কাছে তো অনেকেই আসে।

যে-ই এসে থাকুক, সে আমার কাছেই এসেছে। অতএব তাড়াতাড়ি উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে বাইরের ঘরে আসি।

এযে দেখছি শান্তনু। তাহলে তো সঙ্গের মেয়েটি নিশ্চয়ই কাকলি। চিঠিতে কয়েক বছরের পরিচয়। কিন্তু এই আমি ওকে প্রথম দেখছি। মাঝারী গড়ন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী। পরনে সালওয়ার-কামিজ, মুখখানি ভারি মিষ্টি।

প্রায় ছুটে এসে প্রণাম করে আমাকে। তারপরে দুহাত দিয়ে আমার একখানি হাত ধরে স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করে—ভাল আছো জেঠু?

—হ্যাঁ মা। ভাল, খুব ভাল। আগে যতটা ভাল ছিলাম, এখন তার চেয়ে আরও অনেক অনেক ভাল।

—কেন বল তো?

—এখন যে তুমি এসেছো।

—জেঠু তুমি ভারি দুষ্টু।

মৃদু হেসে ওকে পাশে নিয়ে সোফায় বসি

শান্তনু একটাও কথা বলে নি এতক্ষণ, এবারে অভিমানভরা কণ্ঠে বলে—জেঠু আজ মেয়েকে পেয়েছে, আজ আর ছেলের দিকে নজর দেবারই সময় হচ্ছে না। সে এগিয়ে এসে প্রণাম করে আমাকে।

তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে তাকে আমার আরেকপাশে বসিয়ে বলি—নারে বাবা, ছেলের দিকেও নজর আছে। তবে মেয়েটাকে আজই প্রথম দেখলাম তো।

—তুমি ওর কথা ছেড়ে দাও জেঠু। ও ভারি হিংসুটে

আমি হেসে ফেলি। শান্তনুও হাসে। হাসি থামলে বলি—তোমরা কি আজই চলে যাবে?

—হ্যাঁ জেঠু। পরশু থেকে আমার গানের পরীক্ষা, পরের সপ্তাহে কলেজে উইকলি টেস্ট শুরু হয়ে যাবে।

—কিন্তু কাল সারারাত বাসে ছিলে, আজও তাই করতে হবে। পরপর দু-রাত 'বাস-জার্নি' করলে শরীর খারাপ না হয়ে যায়।

—কিছু হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। পর পর দু-রাত বাসযাত্রা। অবাক হয়ে ভাবি. এ তো শুধু আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। মনে পড়ে ষোলো বছর আগের কথা। তখনও জোড়হাটের এই বয়সী আরেকটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এমনি আকুল হয়ে উঠেছিল। তার মানে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনেও ভালোবাসার সেই 'ট্রাডিশান' সমানে চলেছে।

আমি আবার ওকে দেখি, সত্যি মুখখানি ভারি মিষ্টি আর কথায় বাঙাল টান। সেদিনই শান্তনু বলেছে. ওরা মেহারের (চট্টগ্রাম) সাধক স্বামী সর্বানন্দের বংশধর, ভট্টাচার্য। ওর বাবার যখন বয়স বছর দশেক, তখন দেশ বিভাগ। বাবা-মা ও ভাই-বোনের সঙ্গে তিনিও প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছিলেন আসামে। প্রথমে ডিব্রুগড়ে, তারপরে জোড়হাটে। তারপরে অনেক কষ্ট, অনেক সংগ্রাম। এখন সবাই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। ওর বাবা বিমলবাবু ব্যবসা করেন। শান্তনু বাবাকে সাহায্য করে আর কাকলি বি. এ পড়ে।

কিন্তু আর এসব কথা ভাবার সময় পাই না। প্রভাতের কাছে খবর পেয়ে খুকু বুলা অশোক ও ববি হৈহৈ করে এ ঘরে এসে যায়। আমার কাছে শুনে শুনে কাকলিকে দেখার আগ্রহ ওদেরও কিছু কম নয়।

প্রণামের পালা শেষ হলে আবার কথাবার্তা শুরু হয়। এবারে শান্তনু তার কিটব্যাগ খুলে একবাক্স মিষ্টি খুকুর হাতে দেয়। আর তারপরেই কাকলি তার ঝোলাব্যাগ খুলে একটা খুব ছোট আরেকটা বেশ বড় প্যাকেট বের করে আমার দিকে হাত বাড়ায়।

হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করি—কি ?

—খুলেই দেখো না।

ছোট প্যাকেটটা খুলে দেখি, একসেট পেন।

—লিখবে কিন্তু। কাকলি বলে ওঠে।

আমি মাথা নেড়ে পেন সেট-টা ববির হাতে দিই। তারপরে বড় প্যাকেট-টা খুলে ফেলি।

—নাগা শাল। অশোক বলে ওঠে।

আর সেইসঙ্গে কাকলির অনুরোধ—এটাও কিন্তু তোমাকে গায়ে দিতে হবে জেঠু!

কি বলব? ওকে কেমন করে বোঝাবো, আমার কয়েকখানি শাল রয়েছে এবং দিশী উলের এই নাগা শাল এত গরম যে কলকাতার শীতে গায়ে রাখা খুবই কষ্টকর।

কিন্তু কাকলি কষ্ট পাবে বলে আমার কষ্টের কথা বলতে পারি না। একটু হেসে বলি—গায়ে দেব বৈকি! তুমি পছন্দ করে জোড়হাট থেকে বয়ে এনেছো, আর আমি গায়ে দেব না?

—তোমার পছন্দ হয়েছে জেঠু!

—নিশ্চয়ই।

বুলা আমার হাত থেকে শালখানি নিয়ে একটু দেখে বলে—এত সুন্দর জিনিস, পছন্দ হবে না?

—সত্যি। খুবই সুন্দর শালখানা। খুকুও বুলাকে সমর্থন করে।

খুশি হয় কাকলি। পাবার আনন্দের চেয়ে দেবার আনন্দ কিছু কম নয় এ সংসারে। তবে সবাই সে আনন্দ আস্বাদন করতে জানে না, এই যা। ভেবে আনন্দ পাচ্ছি কাকলি আমার তেমন মেয়ে নয়। মনে মনে জীবনদেবতাকে বলি, ঠাকুর মেয়েটাকে তুমি ভাল রেখো, তাকে বড় করে তোলো।

তারপরে ভাবি, এতো শুধু উপহার নয়, এ যে জীবনের পরম সম্পদ, বেঁচে থাকার প্রেরণা। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে যদি কোনদিন বেঁচে থাকার বাসনা ফুরিয়ে আসতে চায়, তাহলে এদের এই নিস্বার্থ ভালোবাসার উপহার আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে, আমি ফুরিয়ে যাই নি।

জানি বিনিময়ে আমি হয়তো এদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারব না. কিন্তু জীবন দেবতার অসীম করুণায় এদের এই ভালোবাসা ভাবীকালের লেখকদের জন্যও অক্ষয় হয়ে থাকবে।

হে পরম করুণাময়, তুমি যে এদের ভালোবাসায় আমার মতো

একজন অক্ষমের অখ্যাত জীবনকে এমন মহিমময় করে তুললে, তার জন্য তোমাকে প্রণাম, শত শত প্রণাম।

সারাদিন বাড়ির ছেলে-মেয়ের মতই ওরা আমাদের মধ্যে কাটিয়ে দিল। দিনটা যে কোথা দিয়ে কিভাবে কেটে গেল, আমরা টেরই পেলাম না। হয়তো ওরা দুজনেও নয়। তারপরে একসময় সবাই বুঝতে পারলাম দিন ফুরিয়ে এসেছে। মিলনের দিনটির অবসান আসন্ন, এবারে বিদায়ের পালা। শান্তনু ও কাকলিকে বিদায় দিতে হবে। আবার কবে দেখা হবে, আমরা কেউ জানি না। কোনদিন দেখা হবে কি না তাও জানা নেই। কেবল জানি আজকের এই আনন্দময় দিনটির স্মৃতি জীবনের পরমসুখস্মৃতি হয়ে রইল।

চোখের কোলে জল নিয়ে বিদায় নিল কাকলি। বলল—আজ আসি, আবার দেখা হবে জেঠু!

সজল চোখেই বিদায় দিলাম তাকে। বললাম—হ্যাঁ মা, দেখা হবে বৈকি! আবার দেখা হবে।

মানুষ আশায় বেঁচে থাকে।

একটু বাদে গোধূলির ম্লান আলোয় ল্যাম্ব্‌-রোডের বাঁকে শান্তনুর সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল কাকলি।

॥ সতেরো ॥

মাত্র দিন সাতেকের জন্য অশোক এবারে গৌহাটি এসেছে। এসেছে দুটি কারণে। প্রথমত ধীরেনবাবুর ভাইপোর বিয়ে, দ্বিতীয়ত ব্যবসার কাজে ওর একবার শিলং যাওয়া দরকার।

আমারও আবার শিলং যাবার দুটি কারণ। প্রথম কারণ আমার ভাইঝি মৌসুমী এখন শিলঙে থাকে। জামাই অসীম সেখানে চাকরি করে। গতবছর বিয়ের পরে ওরা যে শিলং এসেছে, আর কলকাতায় যেতে পারে নি। আমি আড়াই মাস গৌহাটি থেকেও যদি ওর সঙ্গে একবার দেখা না করে যাই, তাহলে মেয়েটা কেঁদে ভাসাবে।

দ্বিতীয় কারণ, আমার এবং দিলীপবাবুর পরম স্নেহাস্পদ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এখন শিলঙের কমিশনার-কাম-সেক্রেটারি। আমি গৌহাটি এসেছি শুনে তিনি বারদুয়েক ফোন করে আমাকে শিলং যেতে বলেছেন। কয়েকবছর আগে আমি যখন দ্বিতীয়বার গারো পাহাড়ে গিয়েছিলাম, তখন রঞ্জনবাবু গোয়ালপাড়ার এস. ডি. ও.। তিনি আমাকে খুবই সাহায্য করেছিলেন।

তাছাড়া আমরা সকলেই কয়েকবার করে শিলং গিয়েছি, আমি শিলংকে কেন্দ্র করে 'মায়াময় মেঘালয়' লিখেছি। তবু আবার আজ শিলং যাচ্ছি কারণ শিলং কখনো পুরোন হয় না। আর তা হয় না বলেই কবিগুরু বিনা নিমন্ত্রণে বার তিনেক শিলং এসেছিলেন।

দিলীপবাবুর দিসপুরের বাংলো থেকে সকাল ন'টা নাগাদ রওনা হলাম। নংপো বাজারে চা খেয়ে উমিয়াম হ্রদের তীরে একটু পায়চারি করে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ শিলঙের আসাম ভবনে পৌঁছন গেল। শহরের প্রধান পথের পাশে বেশ খানিকটা উঁচুতে বাগান ঘেরা সুদৃশ্য ও সুবিশাল বাড়ি। গতবার শিলঙে এসেও এখানেই বাস করেছি।

খাওয়া-দাওয়ার পরে আমার ক্লান্ত সহযাত্রীরা শয্যা গ্রহণ করল আর আমি ওদের যাবতীয় আপত্তি উপেক্ষা করে জালালকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। শিলং বোধকরি ভারতের একমাত্র শৈলাবাস যেখানে গাড়ি চড়ে সর্বত্র যাওয়া যায়। অতএব এখানে 'পেস্‌মেকার' আমার আরোহণ কিম্বা অবরোহণের অন্তরায় হবে না।

প্রথমেই এলাম মহেশদার (লেখক 'ব্রহ্মপুত্র') বাসায়। গতবছর মহেশদা বৌদি আর তাঁদের ছোটছেলে বাচ্চুর সঙ্গে শুধু দেখা হয়েছিল। আজ দুই মেয়ে মালা ও রত্না এবং তাদের স্বামী ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। মালা শিলচরে থাকে। কয়েক-দিন হল এখানে এসেছে। শুধু বাপ-মা ভাই-বোন নয়, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই তো শিলঙে। মহেশদার আদিবাড়ি শ্রীহট্ট। কিন্তু তিনিও এখানেই জন্মেছেন। তাঁরা চারপুরুষ ধরে শিলঙের স্থায়ী বাসিন্দা। এবং এমন অসংখ্য পরিবার রয়েছেন শিলঙে। অবিভক্ত আসামের রাজধানী ছিল শিলং। তখন শ্রীহট্টের মানুষরাই সেক্রে-টারিয়েট থেকে পুলিশবাজার পর্যন্ত প্রভাবশীল ছিলেন। খাসি গারো এবং জয়ন্তীয়া পাহাড়ের প্রায় প্রত্যেক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় শ্রীহট্টবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। দুর্ভাগ্যের কথা আজ নাকি তাঁদেরও বিদেশী বলা হচ্ছে।

অসহায়ের মতো কথাগুলো বললেন মহেশদা। জিজ্ঞেস করলেন—এখন আমরা কোথায় যাবো বলতে পারেন ?'

আমি কোন উত্তর দিতে পারি না। চুপ করে থাকি।

মহেশদা আবার বললেন—অথচ আসল ব্যাপারটা কি জানেন। ··

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি বলেন—স্থানীয় অধিকাংশ মানুষ আজও আমাদের ভালোবাসেন। কিন্তু কিছু মানুষ বহিরাগতদের প্ররোচনায় হঠাৎ হামলা শুরু করে দেয়। তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে রামনাম জপ করা ছাড়া আর কোন উপায় পাই না।

ব্যাপারটা বড়ই দুঃখের। অথচ তেরো-চোদ্দ বছর আগে আমি যখন শিলং চেরাপুঞ্জি সোভারপুঞ্জি কিম্বা শেলা গাঁয়ের পথে পথে

ঘুরে বেড়িয়েছি, তখন সর্বত্র সবার কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা আর আন্তরিক আতিথ্য লাভ করেছি। মনে পড়ছে নরিত্রা ওয়ান্‌স্‌শুর টিল্‌বিডোরা নিস্টিনা সিলভার-ব্লেড শোভনা বিশ্বেশ্বরীদেবী ও আরও কতজনের কথা। তারা যে আজও আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে আছে। রাজনীতি মানুষকে কত নিচে নামিয়ে আনতে পারে, 'শেষের কবিতা'-র শিলং বোধকরি তার একটি নিকৃষ্টতম উদাহরণ।

আগামীকাল বিকেলের দিকে মহেশদা আসাম হাউস-এ আসবেন বলে কথা দিলেন। তবে সেইসঙ্গে একথাও জানিয়ে রাখলেন—সন্ধের আগেই কিন্তু চলে আসব ভাই।

—কেন বলুন তো ?

—আজকাল সন্ধের পরে শিলঙের পথে একা চলাফেরা করে একেবারেই নিরাপদ নয়।

মহেশদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে বসি। জালালকে বলি—পোলো বাজারে চলো।

—সেখানে কে থাকেন স্যার ?

—আমার মেয়ে।

—আপনার নিজের মেয়ে ?

—না। আমার ছোট ভাইয়ের মেয়ে। আমার মেয়ে নেই। সে-ই আমার মেয়ে।

—তাই তো হবে স্যার! কোথায় থাকেন ?

—পোলো বাজার ছাড়িয়ে যে বৌদ্ধ মন্দিরটি আছে, তারই কাছে একটা বাড়িতে।

—জায়গাটা ভাল স্যার!

আমি ওর দিকে তাকাই। জালাল আবার বলে—একে তো ওটা বাঙালি পাড়া, তার ওপরে পাশেই সি. আর. পি. ক্যাম্প। ওখানে আপনার মেয়ের কোন ভয় নেই স্যার।

জালাল মুসলমান, জালাল অসমীয়া। সে-ও একজন শান্তিকামী সংসারী মানুষ। মহেশদার কিছু কথা তার কানে এসেছে। তাই

সে আমাকে আশ্বস্ত করছে, মৌসুমী ও অসীমের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করতে চাইছে। অথচ অসীম এখানে চিরদিনের জন্য থাকতে আসে নি। সে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ বিভাগের একজন ইঞ্জিনিয়ার। অর্থাৎ সে শিলংবাসীদের সেবা করার জন্যই এখানে পড়ে রয়েছে। কিন্তু তাকেও সর্বদাই নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে হয়।

বাসা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। কেনই বা লাগবে? একে তো জালালের জানা জায়গা। তার ওপরে আসাম হাউসে পৌঁছেই ওদের ফোন করেছিলাম। ফলে ওরা রাস্তার ওপরে কড়া নজর রেখেছিল। গাড়ি থামতেই দুজনে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে।

প্রণাম করে মেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর আনন্দের আতিশয্যে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল। অসীম তাকে সামলাবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু সে বেচারী ক'জনকে সামলাবে? আমারও যে তখন দু-চোখের কোল বেয়ে আনন্দাশ্রুর ঢল নেমেছে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে আমরা দুজনে নিজেরাই নিজেদের সামলে নিই। চোখ মুছে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোমার চেষ্টা করি। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। চারিদিকের বাড়ি থেকে ওদের পরিচিত বেশ কয়েকজন বেরিয়ে এসেছেন এবং সমস্বরে অসীমকে প্রশ্ন করছেন—কি হয়েছে?

বেচারী অসীম কোনমতে জবাব দেয়—না না খারাপ কিছু নয়। জেঠাকে পেয়ে আনন্দে কেঁদে দিয়েছে।

তাঁদের অট্টহাসির মাঝে আমরা ঘরে এসে বসি। তাঁরাও কয়েকজন আমাদের সঙ্গে আসেন। একে একে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়। এইসময় ওদের ল্যাণ্ড-লেডি ইন্দিরাদেবী ঘরে আসেন। তাঁর অটোগ্রাফ খাতায় আমার সই দেখিয়ে আমাকে অবাক করে দিলেন। তারপরে অবশ্য ব্যাপারটা খুলে বলেন। চোদ্দ বছর আগে আমি যখন শিলং এসেছিলাম, তখন তাঁর এক পরিচিতের বাড়িতে বসে আমি এই স্বাক্ষর করেছিলাম। সত্যই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার মেয়ে-জামাই তাহলে আমার প্রিয়জনের আশ্রয় লাভ করেছে।

বেশিক্ষণ বসা গেল না। সন্ধে হতেই উঠে পড়তে হল। রঞ্জনবাবু আসবেন। এখানে তিনি একা থাকেন। তবু তাঁর বাংলোতে আজ আমাদের ডিনারের নেমন্তন্ন।

শুনে মৌসুমী বলে ওঠে—তাহলে কাল দুপুরে তোমরা সবাই এখানে খাবে।

—না রে মা। দুজন ড্রাইভার নিয়ে আমরা ন'জন, তার ওপরে রঞ্জনবাবু। এই দশজন লোকের রান্না করা ও খাওয়াবার ঝামেলা করা তোর একার পক্ষে অসম্ভব।

মৌসুমী সরাসরি প্রতিবাদ করতে পারে না, চুপ করে কিছু একটা ভাবছে। আমি জিজ্ঞেস করি—তোর এই ঘরে এতগুলো মানুষকে কোথায় বসতে দিবি, কোথায় খেতে দিবি?

ওরা উত্তর দিতে পারে না। আমি আবার বলি--তাছাড়া কালকের দিনটা আমরা এখানে ঘুরে বেড়াবো, কোথা থেকে কোথায় যাবো, কিছু ঠিক নেই।

একবার একটু থামি। তারপরে আবার বলি—বরং কাল বিকেলে তোরা দুজনে আসাম ভবনে চলে আয়। সবার সঙ্গে দেখা হবে।

শেষ পর্যন্ত ওরা আমার প্রস্তাব মেনে নেয়। আমি আসাম ভবনে ফিরে চলি।

রঞ্জনবাবুর বাংলোয় আসা গেল। বাংলোটি শুধু বড় এবং সুন্দর নয়, অবস্থানটি অপরূপ। গাছে ছাওয়া একটা টিলার ওপরে। নিচের বড় রাস্তা থেকে মোটরপথ উঠে এসেছে গাড়ি বারান্দায়। পথের দু-পাশে নানা রকমের ফুলগাছ আর গাড়ি বারান্দার চারপাশে নানা জাতের ফার্ন ও ক্যাক্‌টাস। বাংলোটির নাম BENNORE

বুলা মুগ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে—এতো সেই 'শেষের কবিতা'-র শিলং!

—হ্যাঁ। খুকু যোগ করে—

'চুমিয়া যেয়ো তুমি
আমার বনভূমি
দখিন-সাগরের সমীরণ,

যে শুভখনে মম
আসিবে প্রিয়তম,
ডাকিবে নাম ধরে অকারণ।'

খুকু থামতেই ববি যোগ করে—

'Blow gently over my garden
Wind of the southern sea
In the hour my love cometh
And calleth me.'

অর্থাৎ খুকু যে ববিকে শান্তিনিকেতনে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে কোন ভুল করে নি, ববি তার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে দিল।

কিন্তু আমি ভাবি অন্য কথা। এমন বাংলোতে বেচারী রঞ্জনকে একা পড়ে থাকতে হচ্ছে। তাঁর স্ত্রী দিল্লীতে চাকরি করে। সেটা অবশ্য প্রধান কারণ নয়। তার দুই মেয়ে দিল্লীতে স্কুলে পড়ে। অতএব মাকে সেখানেই থাকতে হচ্ছে।

বাংলোর ভেতরে ঢুকেও বিস্মিত হতে হয়। ভেবেছিলাম ব্যস্ত অফিসারের একক নিবাসে এসে একটা অগোছালো ব্যাচেলরের গুহা দেখতে পাবো। কিন্তু আশ্চর্য। বিশাল বাড়ির বড় বড় ঘরগুলো প্রত্যেকটি সুন্দর ও সুচারুরূপে সুসজ্জিত।

স্বাভাবিকভাবেই আমরা ওঁর ঘর-গৃহস্থালির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠি।

কোলের কুকুরটাকে আদর করতে করতে মৃদু হেসে রঞ্জন বলেন—আসলে এর প্রায় সবটুকু কৃতিত্বই আমার স্ত্রী ও মেয়েদের এবং এই টিপ্‌সি চ্যাটার্জির। সে সাদা ল্যাপ-ডগটিকে দেখিয়ে দেয়।

—ওর নাম বুঝি টিপসি? অশোক জিজ্ঞেস করে।

রঞ্জন মাথা নাড়েন।

—তা এদের কৃতিত্ব কি রকম? দিলীপবাবু প্রশ্ন করেন—বৌমা তো এখানে প্রায় থাকেই না। আর টিপ্‌সি তো ঘর সাজাতে পারে না।

—স্যার। আপনার বৌমা এখানে না থাকলেও স্কুল ছুটি হলে মেয়েদের নিয়ে শিলং চলে আসে। তখন তারা তিনজন সারাদিন বসে বাগানের পরিচর্যা করে আর ঘর-দোর গোছায়। আর টিপ সি ঘর গোছাতে না পারলেও স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে পারে।

—মানে ?

—মানে ওরা যে জিনিসটা যেখানে যেমন ভাবে রেখে যায়, সেটা সেখান থেকে কারও সরাবার সাধ্য নেই। আপনি বাসিফুল ফেলে দিয়ে ফুলদানিতে তাজা ফুল রাখতে পারেন, কিন্তু ফুলদানিটা ঠিক যথাস্থানে রাখতে হবে। দরজা-জানলার পর্দা কিম্বা চাদর-বেডকভার কাচায় ওর কোন আপত্তি নেই, কিন্তু যেটি যেখানে ছিল সেটিকে ঠিক সেখানে পাততে হবে।

—বা! ভারি মজা তো। বুলা মন্তব্য করে।

—আরও মজার কি জানেন, এখানে আমার অসুখ-বিসুখ হলে দিনে সর্বদা আমার কাছে বসে থাকে আর রাতে পাশে শুয়ে থাকে। এদের কাছ থেকে মানুষকে বিশ্বস্ততার পাঠ, New lessons of Loyalty শিক্ষা করতে হবে।

আমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে টিপ্‌সির দিকে তাকাই। সেও চেয়ে চেয়ে আমাদের দেখছে। বোধকরি বুঝতে পেরেছে যে রঞ্জন চ্যাটার্জি টিপ্‌সি চ্যাটার্জির প্রশংসা করছেন।

রঞ্জনবাবু মিথ্যে বলেন নি আবার এ কথাও সত্য যে তিনিও অগোছালো নন। তা যদি হতেন, তবে তার স্ত্রী মেয়েরা এবং টিপ্‌সির সাধ্য ছিল না, এতবড় বাড়ি এমন ছিমছাম করে রাখার। তিনিও যে অত্যন্ত গোছানো প্রকৃতির মানুষ। তা সেবারে গোয়ালপাড়ায় গিয়ে জেনে এসেছি। কারণ তখন তিনি বিয়েই করে নি।

যাক্ গে, আজকের কথায় ফিরে আসা যাক। আজ খুকু গান গাইল, রঞ্জন আবৃত্তি করলেন। তারপরে ডিনার সেরে আমরা যখন আসাম ভবনে ফিরে এলাম, তখন রাত এগারোটা বেজে গিয়েছে।

ক্লান্ত শরীরে আনন্দমুখর দিনটি সুখস্মৃতি চারণ করতে করতে একসময় নিদ্রার কোলে চলে পড়লাম।

অবিভক্ত আসামে দিলীবাবু বেশ কয়েকবছর শিলঙে কাজ করেছেন। তাছাড়া এখন তিনি আসাম সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। অতএব তাঁর এখানে আসার খবর পেয়ে অনেকেই দেখা করতে এলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁকে আমাব সবচেয়ে বেশি ভাল লাগল, তিনি মেঘালয় সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব, মিস্টার সিয়েম।

সিয়েম মানে রাজা। বৃটিশ যুগের আগে খাসি পাহাড়ে বেশ কয়েকজন সিয়েম রাজত্ব করতেন। তাঁদেরই কারও বংশধর হবেন। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের যুগোপযোগী করে তুলেছেন। লেখা-পড়া শিখে রাজপদ ফিরে পেয়েছেন।

কথায় কথায় ভদ্রলোক বলেন—হ্যাঁ, খুবই দুঃখের কথা, গত দু-তিন বছর দুর্গাপূজার সময়ে শিলঙে গোলমাল হয়েছে। আর তাই গতবছর পুজোর আগে বেশ কিছু বাঙালি ও অসমীয়া তাঁদের পরিবার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এবারে আমরা স্থির করেছি, কিছুতেই এখানে কোন গোলমাল হতে দেব না। সবাইকে অনুরোধ করছি, আপনারা কেউ শিলং থেকে বাইরে যাবেন না। বরং যাঁদের পরিবার বাইরে রয়েছেন, তাঁদের কাছে আবেদন রাখছি, এবার সবাই একসঙ্গে শিলঙের পুজো দেখুন।

মিস্টার সিয়েম কথা থামিয়ে একবার রঞ্জনের দিকে তাকান। তারপরে আবার বলেন—এবং আমরা আশা করছি মিসেস চ্যাটার্জিও তাঁর মেয়েদের নিয়ে এবারে শিলঙের পুজো দেখবেন।

রঞ্জন মাথা নাড়েন। বলেন—আমি ওদের পুজোর আগেই এখানে নিয়ে আসছি।

সিয়েমসাহেব আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসেন। এবং এবারে ইংরেজি ছেড়ে বাংলায় বলেন—আমরা শহরবাসীদের দেখাতে চাইছি

যে 'আপনি আচরি ধর্ম পরেকে শেখাও'। কমিশনার তাঁর নিজের পরিবার দিল্লী থেকে শিলঙে নিয়ে এলে শহরবাসী আমাদের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করবেন।

আরও কিছুক্ষণ আড্ডা দেবার পরে ওঁরা একে একে বিদায় নিলেন। আজ রবিবার সুতরাং রঞ্জনের সেক্রেটারিয়েটে যাবার তাড়া নেই। তিনি আসাম ভবনেই রয়ে গেলেন।

আমরাও তৈরি হয়ে নিলাম। কিন্তু মেঘালয়ের রাজধানীতে যে বৃষ্টি নামার কোন নিয়ম নেই। বৃষ্টির জন্য বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকতে হল। আর তারপরেই মেঘভাঙা সোনালী রোদে শিলং আবার হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠল। হাস্যমুখর শিলঙের পথে বেরিয়ে পড়লাম। বলা বাহুল্য আজ আমাদের গাইড রঞ্জনবাবু।

প্রথমেই এলাম U. Hipsonroy নামে জনৈক ভদ্রলোকের কাছে। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত আই. এফ. এ. এস.। এখন সেঙখাসি বা সনাতনপন্থী খাসি সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

তাঁর কাছে আমরা খাসি সমাজ ও সংস্কৃতি এবং ধর্ম, বিশেষ করে তাঁদের নিরাকার ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারলাম। কথায় কথায় তিনি বললেন—মিশনারীদের এত প্রচার সত্ত্বেও খাসি পাহাড়ে আমাদের সেঙখাসিদের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি।

সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামরত এই মানুষটিকে ভাল লাগে আমার। বিদায় নেবার সময় তিনি তাঁর রচিত তুখানি বই আমাকে উপহার দিলেন।

হিপসনরায়ের বাড়ি থেকে আমরা পুলিশ বাজারে এলাম। একটা রেস্তরাঁয় লাঞ্চ সেরে নিলাম। তারপরে দিলীপবাবু রঞ্জন ও অশোককে নিয়ে শিলং পিক্-এ চলে গেলেন। সেখানে অশোক একজন প্রাক্তন সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করবে। শিলং-পিক্ ভারতীয় বিমানবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর। সেখানে দিলীপবাবুরও একজন আত্মীয় আছেন।

ওঁরা চলে যাবার পরে আমরা শিলং দর্শনে বের হলাম। কয়েক-

বার শিলং এসে বার বার দেখেও যে জায়গাগুলো পুরনো হয়ে যায় নি, সেগুলোই দর্শন করা যাক। প্রথমেই ওয়ার্ড লেক, তারপরে লেডী হায়দারী পার্ক ও গল্‌ফ কোর্স ঘুরে লাবান বাজার। ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ শিলং এসে যে ঘরখানিতে বাস করে গিয়েছেন, সেখানি দর্শন করা গেল।

আর সেখানেই আমরা প্রাক্তন অফিসের কর্মী রূপককে পাওয়া গেল। রূপক শিলঙের ছেলে। ওকে পেলে শিলং দর্শন সহজ হয়। এবং রূপক প্রতিবারই হাসিমুখে আমার এ অত্যাচার মেনে নেয়।

রূপককে গাড়িতে তুলে নিয়ে আমরা রবীন্দ্রস্মৃতিধন্য স্থান দর্শনে যাত্রা করি। প্রথমে 'জিৎভূমি'। কবি ১৯২৩ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই বাড়িতে বাস করে গিয়েছেন। এখানে বসে 'শিলঙের চিঠি' ও 'রক্তকরবী' রচনা করেছেন।

তারপরে যে বাড়িতে এলাম, তখন তার নাম ছিল 'ব্রুক সাইড'। কারণ বাড়িটার পাশ দিয়ে চমৎকার একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। মালিক ছিলেন কে. সি. দে, সি. আই. ই। গতবারও এসে আমরা নাম দুটি দেখে গিয়েছি। এবারে দেখছি পুরনো গেটটা ভেঙে ফেলায় নামদুটি হারিয়ে গিয়েছে। সরকার বাড়িটাকে অধিগ্রহণ করে এখানে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলছেন। তাঁরা নতুন তোরণ তৈরি করবেন।

কবিগুরু এ বাড়িতে বিশদিন কাটিয়েছেন। ১৯১৯ সালের ১১ই থেকে ৩১শে অক্টোবর। সেবারে তিনি শিলং থেকে সিলেট গিয়েছিলেন। সেখান থেকে চাঁদপুর ও গোয়ালন্দ হয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন।

অবশেষে আমরা এলাম 'সিডলি হাউস'। ১৯২৭ সালের মে-জুন মাস কবি এখানেই কাটিয়েছেন। এ বাড়িতে বসে তিনি 'সুসময়' ও 'দেবদারু' প্রভৃতি কবিতা এবং 'যোগাযোগ' উপন্যাস রচনা করেছেন।

পথে রামকৃষ্ণ মিশন দর্শন করে সন্ধ্যার আগে আসাম ভবনে ফিরে এলাম। এসে দেখি মহেশদা মৌসুমী ও অসীম আমাদের জন্য

অপেক্ষা করছে। চা-য়ের ফরমাস করে ড্রয়িং-রুমে এসে বসা গেল।
হাসি-ঠাট্টা গান-গল্পে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, কেউ টের পেলাম না। একসময় মহেশদা বলে ওঠেন—আরে এযে দেখছি ন'টা বাজে।

অতএব বিদায়ের পালা। জালালকে বললাম, মহেশদাকে পৌঁছে দিয়ে মৌসুমীদের বাড়ি দিয়ে আসতে।

গাড়িতে ওঠার আগে মেয়েটা আবার কাঁদতে শুরু করে দিল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল—তুমি কালই শিলং থেকে চলে যাচ্ছ কেন? কয়েকটা দিন থেকে যাও না আমাদের কাছে।

ওর মাথায় হাত রেখে বলি—তুই তো জানিস ওরা গাড়ি নিয়ে গৌহাটি চলে গেলে আমার পক্ষে বাসে করে একা ফিরে যাওয়া কষ্টকর। তাছাড়া আগামী শনিবার আমাকে নগাঁও যেতে হবে।

আর কোন কথা না বলে সে গাড়িতে উঠে বসে। আমি বলি—গৌহাটি থেকে ফোন করব।

সে মাথা নাড়ে। জালাল দরজা বন্ধ করে গাড়ি ছেড়ে দেয়। একটু বাদে গাড়িটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যায়, সেই সঙ্গে মেয়েটাও।

॥ আঠারো ॥

দিলীপবাবু এক কথার মানুষ। আজও সেই সকাল ন'টা। তাঁর নীল মারুতি ঠিক ন'টায় বত্রিশ নম্বরের সামনে। তবে আজ তিনি নেই, শুধুই জালাল। আজও যে আমাদের দিসপুর হয়ে যেতে হবে, তাঁকেই আমরা কোয়ার্টার্স থেকে গাড়িতে তুলে নেবে।

আমি ও ববি গাড়িতে এসে বসি, জালাল গাড়ি ছেড়ে দেয়। ঠিক কথা, আজ ববি আমার সঙ্গে যাচ্ছে। উৎপল ও ডঃ চৌধুরি যাচ্ছেন না, অশোক কলকাতায় ফিরে গিয়েছে।

দিলীপবাবুর তৈরি হয়েই ছিলেন। সাড়ে ন'টার মধ্যেই তাঁর বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। হাজো ও বরপেটা যাবার সময় আমরা উত্তর আসামে গিয়েছি, আজ চলেছি দক্ষিণে। সাঁইত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আজ আমরা 'আপার' আসামের দিকে চলেছি।

গৌহাটি-শিলং পথের সঙ্গম জোড়াবাট ছাড়িয়ে আধঘণ্টার মতো পথ চলে পৌঁছলাম জাগি রোড, গৌহাটি থেকে ৫০ কিলোমিটার। এখন সকাল সওয়া দশটা।

দিলীপবাবু বলেন—জাগি রোড বেশ বড় জায়গা।

—হ্যাঁ। ববি যোগ করে—এখানে সিল্কের কারখানা ও কাগজের কল রয়েছে।

—ইন্‌সপেকশান বাংলো এবং থানা আছে। জালাল জানায়।

আমি দেখি। শুধু বড় নয়, ভারি সুন্দর জায়গা। ডানদিকে খানিকটা দূরে সবুজ পাহাড়। তারই পাদদেশে জনপদ—বাড়ি-ঘর বাজার ও কল-কারখানা, পথের দু-পাশেই সব কিছুই যেন রঙিন ছবির মতো।

কাগজের কলটা জনপদ পার হয়ে শহরতলিতে। ববি বলে—ভারত সরকারের কারখানা, হিন্দুস্থান পেপার মিল্‌স।

সেই সাঁইত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক। এই সড়ক নগাঁও কাজিরাঙ্গা জোড়হাট শিবসাগর হয়ে ডিব্রুগড় চলে গিয়েছে। কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্য নগাঁও জেলায়। পনেরো বছর আগে আমি এই পথ ধরেই জোড়হাট থেকে শিবসাগর হয়ে ডিব্রুগড় গিয়েছিলাম, এসেছিলাম কাজিরাঙ্গা। কাজিরাঙ্গা ভ্রমণের সঙ্গী ছিল প্রগতি। আজ তাই পথে বেরিয়ে বার বার তার কথা মনে পড়ছে, আমার অসমীয়া বোন প্রগতি শর্মার কথা।

কিন্তু থাক। তার কথা নয়। তার চেয়ে নগাঁওয়ের কথা ভাবা যাক। নগাঁওয়ের কথা আমি প্রথম শুনেছি শৈশবে, আমার বাবা-মায়ের কাছে। আমার ছোট পিসেমশাই নগাঁওতে কর্মজীবন অতি-বাহিত করেছেন, বাবা-মা তাঁদের কাছে বেড়াতে এসেছিলেন। আমিও সেবারে হোজাই থেকে গৌহাটি ফেরার পথে নগাঁও এসেছিলাম। কিন্তু রাত্রিবাস করি নি, দেখতে পারি নি শঙ্করদেবের পুণ্য জন্মভূমি।

নগাঁও প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে প্রায় সোয়া শ' বছর আগের মিস্টার ও মিসেস পি. এইচ. মুরের কথা। ফাদার পিট হল্যাণ্ড মুর আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশনের মিশনারি রূপে ১৮৮০ সালে নগাঁও এসেছিলেন। এবং তিনি ও তাঁর স্ত্রী বিশ বছর আসামে সেবাকার্য করেছেন।

তাঁরা ১৮৭৯ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে কলকাতায় এলেন। ২১শে ডিসেম্বর কলকাতা থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ। সেখান থেকে স্টিমারে (কখনওবা নৌকোয়) ধুবরি, গোয়ালপাড়া, গৌহাটি ও তেজপুর প্রভৃতি জায়গায় থেমে ১৫ই জানুয়ারী মধ্য রাতে শিলঘাটে পৌঁছলেন।

বাকি রাতটুকু স্টিমারে কাটিয়ে পরদিন অর্থাৎ ১৮৮০ সালের ১৬ই জানুয়ারি সকালে মিস্টার ও মিসেস মুর স্টিমার থেকে নামলেন। নগাঁও রওনা হলেন। তখন শিলঘাট থেকে নগাঁও ৩২ মাইল। সেই পথের প্রথম ৪ মাইল গরুর গাড়ি, তারপরে ১২ মাইল পালকি এবং বাকি ষোল মাইল ঘোড়ায় চড়ে সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় তাঁরা নগাঁও

এলেন। অর্থাৎ কলকাতা থেকে নগাঁও আসতেই তাঁদের ছাব্বিশদিন সময় লেগেছিল। আমেরিকা থেকে জাহাজে কলকাতায় আসার কথা বাদই দিলাম। অথচ এই সুদীর্ঘ যাত্রাকালে আরাম ও ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে অচেনা জায়গায় অজানা পরিবেশে চলে আসার জন্য তাঁরা কখনও কোন আপসোস করেন নি। বরং সেই ক্লান্তিকর যাত্রাশেষে নগাঁওয়ের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কি আনন্দ! মিসেস পিট তাঁর রোজনামচায় লিখছেন—

'At 7 a.m. we left the steamer, with happy heart, in prospect of soon seeing NOWGONG, our future home.' ('Twenty Years in Assam' by Mrs. P.H. Moore, 1900)

অথচ তখন তাঁদের কিই বা বয়স। পঁচিশ থেকে তিরিশ। দুজনেই উচ্চশিক্ষিত। মিস্টার পিট ন্যুইয়র্কের থিয়োলজিক্যাল সেমিনারি থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন। সুতরাং সেকালে দেশে তাঁর একটা কাজ জুটত না, একথা মনে করার কোন কারণ নেই।

তাঁরা বিশ বছর (১৮৭৯-১৮৯৯ খ্রিঃ) আসামে ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু আরেক গোলার্ধের এক অখ্যাত ও অনুন্নত রাজ্যে অতিবাহিত করলেন।

কিন্তু কেন? তাঁরা আমেরিক্যান। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষায় তাদের কোন স্বার্থ ছিল না। এবং একথাও সত্য যে শুধু চাকরি এবং খৃস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্যই তাঁরা এই আত্মত্যাগে শামিল হন নি। কারণ কেবল এই উদ্দেশে দুটি জাগ্রত যৌবনকে এভাবে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা যায় না।

তাঁরা এসেছিলেন একটা আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। সে আদর্শ বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতা। সে আদর্শের একমাত্র লক্ষ্য—আর্তের সেবা, নিরক্ষরের শিক্ষা আর নিরন্নের অন্ন। তাঁরা এসেছেন, স্থানীয় ভাষা ও রীতিনীতি রপ্ত করে নিজেদের সেই পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। নগাঁওয়ের মানুষের দুঃখ দেখলে চোখের জল

ফেলেছেন, তাঁদের আনন্দে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠেছেন।

আশ্চর্য। আজও আমরা সেইসব মহাপ্রাণের প্রকৃত মূল্যায়ণ করে উঠতে পারলাম না। এবং দুর্ভাগ্যের কথা যে আমরা এখনও এঁদের সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলেই চিহ্নিত করে রেখেছি। অথচ অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই মানুষগুলো তাঁদের সারাজীবনের সাধনা দিয়ে আমাদের দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যে অপরিহার্য অবদান রেখে গিয়েছেন, সেটুকু না হলে আজও আমরা বোধকরি মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে রইতাম।

কিন্তু আমি এখন এসব কি ভাবছি? আমি আজ নগাঁও চলেছি। জাগি রোড পার হয়ে এলাম। অতএব অতীতের কথা না ভেবে বর্তমানের জাতীয় সড়কের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

আমার পথের দু-পাশেই অলকাপুরী আসাম। যেদিকেই তাকাচ্ছি, দৃষ্টি ফেরাতে পারছি না। কোথাও কাছে সবুজ পাহাড়, কোথাও দূরে ধূসর পাহাড় কোথাও বা কেবলি সমতল। পথ থেকে পাহাড় কিম্বা পথ থেকে দিগন্ত পর্যন্ত শুধুই সবুজ। কোথাও ঘন, কোথাও ফিকে কোথাও বা সোনালী সবুজ। কোথাও নারকেল আর সুপারির সারি, কোথাও বাঁশবন আর কলাবাগান. কোথাওবা মাটির ঘর।

সত্যই অলকাপুরী। কেনই বা হবে না? সারা রাজ্যের সুদীর্ঘ সমতলের প্রায় সবটাই যে উপত্যকা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। আসাম তাই এতো উর্বর, এমন সবুজ—আসাম অলকাপুরী।

—বাঃ! জায়গাটা তো ভারি সুন্দর! ববি বলে ওঠে।

হ্যাঁ। সে ঠিকই বলেছে। আমিও বাঁদিকে তাকাই।

জালাল গাড়ি থামায়।

—শুধু সুন্দর নয়, বিচিত্র-সুন্দরও বলতে পারো। দিলীপবাবু বলেন—এ জায়গাটার নাম জঙ্গল বলহু গড়। কোন রাজা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এখানে পরিখা কেটে একটা গড় তৈরি করেছিলেন। গড়টা এখন ঐ মাটির ঢিবি আর সেই প্রায় বুজে আসা পরিখার বিভিন্ন

জায়গায় তিন সারিতে সরকারে কৃষি ও মৎস্য দপ্তর এই ডজনখানেক ছোট-বড় পুকুর কাটিয়েছেন আর ফুল ও ফলের বাগান বানিয়েছেন।

—কেন? পিক্‌নিক স্পট্‌ তৈরি করবেন বলে? ববি দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করে।

দিলীপবাবু উত্তর দেন—এটা পিক্‌নিক্‌ স্পট্‌ হয়েছে ঠিকই, শীতকালে বহু দল এখানে পিক্‌নিক্‌ করতেও আসে। তাহলেও এটা কেবল পিক্‌নিক্‌ স্পট্‌ নয়, সেইসঙ্গে জোড়হাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রধান শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র। এখানেই তাঁদের একটি ফিশারিজ কলেজ। তাছাড়া এখানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছের চাষ ও হাঁস-মুরগি পালনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

দেখা শেষ হলে জালাল গাড়ি ছেড়ে দেয়। আমরা আবার নগাঁও-য়ের দিকে এগিয়ে চলি। আর মাত্র ১৮ কিলোমিটার কারণ এই জঙ্গল বলছু গড় গৌহাটি থেকে ৮৫ কিলোমিটার।

আমি বলছি নগাঁও, কারণ অসমীয়ারা তাই বলেন। বাঙালিরা অনেকে এখনও বলেন নওগা। তবে ইংরেজদের 'Nowgong। নামটি আর ব্যবহৃত হয় না। এখন ইংরেজিতেও লেখা হয় 'Nagaon'.

দিলীপবাবু নগাঁও-য়ের কথাই বলতে শুরু করেছেন—জেলাসদর নগাঁও শহরের অবস্থান ২৬° ২০´ ১৫´´ ও ২৬° . ১´ ২৪´´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৯২° ৪১´ ও ৯১° ৪১´ ৫১´´ পূর্ব দ্রাঘিমায়। কোলং নদীর দুই তীরেই শহর। দূরত্ব গৌহাটি থেকে ১০৩ কিলোমিটার আর জোড়হাট থেকে ১৮০ কিলোমিটার। এর আগে নগাঁও-য়ের নাম ছিল খাগারিজান। নগাঁও নামের অর্থ নতুন গ্রাম।

নগাঁও আসাম রাজ্যের একটি প্রাচীনতম জেলা। ১৮৩৩ সালে এই জেলা গঠন করা হয়। প্রথমে বছর খানেক জেলাসদর ছিল পুরনিগোদাম। তারপরে প্রায় বছরচারেক রঙ্গাগোরা নামে একটি জনপদে। অবশেষে ১৮৩৯ সাল থেকে স্থায়ীভাবে জেলাসদর নিয়ে আসা হয় নগাঁও। আগে এ জেলায় কোন মহকুমা ছিল না। মাত্র ১৯৭১ সালে মারিগাঁও, ১৯৮৩ সালে হোজাই এবং ১৯৮৯ সালে

কালিয়াবোর মহকুমা সৃষ্টি করা হয়েছে।

নগাঁও শহরে পৌরসভা গঠিত হয়েছে ১৮৯৪ সালে অর্থাৎ আগামী বছর পৌরপ্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ পালন করা হবে। ১৯৯১ সালের গণনা অনুযায়ী নগাঁও শহরে জনসংখ্যা ৯৩,৩২৪ জন। কিন্তু বিশ বছর আগেও সংখ্যাটি ছিল মাত্র ৫৬,৫৩৭। অনেকে বলেন এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশ। কথাটা কোনমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

নগাঁও কৃষিপ্রধান জেলা। প্রধান ফসল ধান পাট চা আখ ও শাক-সবজি। এখন মোটর ও রেলযোগে নগাঁও থেকে সর্বত্র যাওয়া যায়। গৌহাটি ও জোড়হাট থেকে নিয়মিত বাস চলাচল করে।

সার্কিট হাউস ছাড়াও নগাঁও শহরে রয়েছে বিভিন্ন দপ্তরের ডাক-বাংলো, টুরিস্ট লজ এবং কয়েকটি ভাল হোটেল। একটি মেয়েদের কলেজ সহ গুটিছয়েক কলেজ এবং বেশ কয়েকটি বড় স্কুল। আছে কয়েকটি সিনেমা হল ও একটা স্টেডিয়াম, সেখানে রাজ্য স্তরের খেলাধূলা হয়। মাঘ-বিহুর সময় কোলং নদীর তীরভূমি উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। শিবরাত্রির সময় বেশ বড় মেলা হয় নগাঁও শহরে। আর বিখ্যাত কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্য এই জেলায় অবস্থিত।

আমরা মাথা নাড়ি। দিলীপবাবু বলতে থাকেন—তাহলেও আসামের জনজীবনে নগাঁও জেলার সবচেয়ে বড় পরিচয় বটদ্রবা বা বরদোয়া…

—শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের জন্মস্থান। ববি বলে ওঠে।

দিলীপবাবু মাথা নেড়ে বলেন—শহর থেকে মাত্র চোদ্দ কিলোমিটার। আমরা সেই পুণ্যভূমি দর্শন করার জন্যই আজ নগাঁও চলেছি। সমাজসেবার ক্ষেত্রে নগাঁও শহরের সবচেয়ে ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠান শ্রীমন্ত শঙ্করদেব মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ। শঙ্করদেব মিশন ১৯৫০ সাল থেকে একটি চক্ষু হাসপাতাল, একটি অন্ধ বিদ্যালয় এবং অনাথ আশ্রম পরিচালনা করছেন। আর ভারত সেবাশ্রম সংঘের সেবাকার্যের কথা কিই বা বলতে হবে? নগাঁও শহরে তাঁদের

একটি কেন্দ্র রয়েছে। বিপন্ন মানুষের সেবায় তাঁরা সর্বদাই সচেতন। এ ছাড়া নগাঁও শহরে একটি 'স্টেট ডেস্টিটিউট হোম' আছে।

থামলেন দিলীপবাবু। ববি বলে—আঙ্কল বুঝি এইভাবে 'টিপ্‌স' দিয়ে দাদুকে হাণ্ডো আর বরপেটা বেরিয়ে নিয়ে এসেছেন ?

আমি উত্তর দিই—তুমি ঠিকই অনুমান করেছো।

—তাহলে তো আঙ্কল তোমার ফ্রেণ্ড ফিলোসফার-কাম-গাইড। ববি আমার দিকে তাকায়।

একটু হেসে দিলীপবাবু প্রতিবাদ করেন—না, না, এসব ব'লো না। নগাঁওতে অনেকদিন ডেপুটি কমিশনার ছিলাম, তাই তোমাদের কাছে তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

পরিচয় পাবার অনতিকাল পরেই অর্থাৎ দুপুর পৌনে বারোটা নাগাদ আমরা নগাঁও সার্কিট হাউসের সামনে উপস্থিত হলাম। প্রধান পথের পাশে সুবিশাল এলাকা নিয়ে বেশ বড় সার্কিট হাউস। সামনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। তার প্রায় মাঝখানে একটি গোলাকার ফুল বাগান। তারপরেই সার্কিট হাউসের গাড়ি বারান্দা। সার্কিট হাউসের সবটা জুড়েও খোলা চওড়া বারান্দা। সেখানেই ডেপুটি কমিশনার শ্রীশইকিয়া সহ কয়েকজন অফিসার অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন। তারপরে ডেপুটি কমিশনার জানালেন, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দুটি সুইট-য়ের একটি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে কারণ অপরটিতে রয়েছেন আসামের রাজস্ব মন্ত্রী।

—ঠিক আছে। দিলীপবাবু বলেন—আমাদের একটা স্যুইট হলেই চলে যাবে তবে একখানা বাড়তি খাট লাগবে, আমরা তিনজন।

—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে স্যার। মিস্টার দত্ত বলেন—চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।

মিস্টার দত্ত মানে কৃষি বিভাগের জয়েন্ট ডিরেক্টার সৌম্যেন দত্ত। দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। মধ্যবয়সী। ভদ্রলোককে ভাল লাগে।

আমরা ভেতরে আসি। প্রথমেই কার্পেট মোড়া ও মূল্যবান

আসবাবপত্রে সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম, পেছনে ডাইনিং রুম আর পাশে বাথরুম যুক্ত সুবিশাল বেডরুম। বলাবাহুল্য দেওয়াল থেকে দেওয়াল পর্যন্ত কার্পেট এবং দু-খানি খাট সহ বেশ কিছু মূল্যবান সোফা চেয়ার টেব্‌ল আলনা ও আলমারি। এক কথায় রীতিমত বিলাস-বহুল ব্যবস্থা। দিলীপবাবু একটু হেসে ববিকে জিজ্ঞেস করেন—কি কষ্ট হবে না তো ?

ববি আরেকবার ঘরখানিকে দেখে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে—একটু হয়তো হবে, তবে মনে হচ্ছে মানিয়ে নেওয়া যাবে।

—দুষ্টু ছেলে! দিলীপবাবু সহাস্যে মন্তব্য করেন।

ববি হেসে দেয়।

হাতমুখ ধুয়ে আমরা ড্রয়িং রুমে ফিরে আসি। বেয়ারা চা পরিবেশন করে। মিস্টার দত্ত উপস্থিত অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে অবশেষে বলেন—ইনি অধ্যাপক ডক্টর নরেন কলিতা। শ্রীশঙ্করদেবের ওপরে একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ।

ভদ্রলোক প্রতিবাদ করে ওঠেন—না, না, এভাবে বলবেন না। তিনি হচ্ছে অন্তহীন জ্ঞানসমুদ্র আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তাঁর কতটুকু সিঞ্চন করতে পারে ?

কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়েই সৌম্যেনবাবু বলেন—তাই আপনারা আসছেন শুনে আমি ওঁকে অনুরোধ করেছিলাম, বরদোয়া দর্শনে সঙ্গী হতে। উনি কলেজ ছুটি নিয়ে চলে এসেছেন।

—খুবই খুশি হলাম। কিন্তু আমরা কি আজই বরদোয়া যাচ্ছি ?

ডি. সি. এবং সৌম্যেনবাবু প্রায় একই সঙ্গে বলে ওঠেন—হ্যাঁ স্যার! আজই যেতে হবে। আগামীকাল এখানে বন্‌ধ হবার কথা। আজ একবার ঘুরে আসা ভাল। বন্‌ধ সফল না হলে কাল আবার যাওয়া যাবে।

—কিন্তু আমাদের যে লাঞ্চ্‌ হয় নি। আপনাদেরও তো খেয়ে আসা দরকার।

—আমরা সবাই খেয়ে এসেছি স্যার। সৌম্যেনবাবু বলেন—

আপনাদের লাঞ্চ্ রেডি। একটু থেমে তাঁর পাশের যুবকটিকে বলেন—প্রণব, একবার খবর নাও তো।

ছেলেটি তাড়াতাড়ি চলে যায়। সৌম্যেনবাবু বলেন—আমাদের একজন বিভাগীয় কর্মী। নাম প্রণবকুমার বরা। বেশ ভাল ছবি তোলে। তাই ওকে ক্যামেরা নিয়ে আমাদের সঙ্গী হতে বলেছি।

অর্থাৎ ভদ্রলোক আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখেন নি। বিশেষজ্ঞ থেকে আলোকচিত্র শিল্পী পর্যন্ত সবাইকে সংগ্রহ করে রেখেছেন। কিন্তু আমি কি এই আয়োজনের প্রতি সুবিচার করতে পারব? আমি কি সেই পুণ্যতীর্থের কথা কিছু অন্তত বলে উঠতে পারব আমার পাঠক-পাঠিকার কাছে? আমি কি পারব শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ের ব্যবধান সামান্য কিছু কমিয়ে ফেলতে?

সৌম্যেনবাবু বলেন—আপনারা লাঞ্চ্ করে নিন, তারপরে বেরিয়ে পড়া যাবে।

তাই করা হল। অর্থাৎ খেয়ে নিয়েই আবার এসে গাড়িতে ওঠা গেল। আমরা তিনজন এবং ড. কলিতা সৌম্যেনবাবুর গাড়িতে বসলাম। আমরা পেছনে ও নরেনবাবু সামনে। সৌম্যেনবাবু নিজেই তাঁর গাড়ি চালাচ্ছেন। প্রণব এবং সৌম্যেনবাবুর আরও দুজন সঙ্গী দিলীপবাবুর গাড়িতে উঠলেন। শ্রীশইকিয়া এবং এ. ডি. সি. শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এখান থেকেই বিদায় নিলেন। দু-খানি গাড়ি এগিয়ে চলল।

যাক্ গে বাঁচা গেল। আগামীকাল বন্‌ধ ঘোষিত হলেও এখানে সিকিউরিটির ঝামেলা নেই। তার মানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব করুণাময়। পুলিশের বন্দুক বাদ দিয়েই আমরা তাঁর পুণ্যজন্মভূমিতে পদার্পণ করতে পারব। মনে মনে তাঁকে আরেকবার প্রণাম জানিয়ে শঙ্কর-তীর্থ বটদ্রবার পথে যাত্রা শুরু করি।

॥ উনিশ ॥

—ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দশ শতকের কোন সময় কামতাপুরের (আসাম) রাজা দুর্লভনারায়ণ গৌড়রাজ ধর্মনারায়ণকে অনুরোধ করলেন: অনুগ্রহ করে আপনার রাজ্যের সাতটি ব্রাহ্মণ ও সাতটি কায়স্থ পরিবারকে আমার এই দূতের সঙ্গে আমার রাজ্যে এসে বসতি স্থাপনের অনুমতি দান করুন। আমি তাঁদের পরিবার পালনের সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে বাধিত হব এবং আপনার এই উদার অনুগ্রহের জন্য আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

ধর্মনারায়ণ সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন এবং গৌড় থেকে সাতটি ব্রাহ্মণ ও সাতটি কায়স্থ পরিবার আসামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁদেরই পরবর্তীকালে 'বরভূঞা' বলা হতে থাকে। 'বর' মানে 'বড়' নয়, বর মানে অনেক।

ভূঞারা প্রথমে হাজো অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন, তারপরে বটদ্রবায় চলে আসেন। শ্রীমন্ত শঙ্করের আদিপুরুষের নাম চণ্ডীবর।

আমরা মাথা নাড়ি। কথায় কথায় নরেনবাবু আমাদের কাছে শঙ্করদেবের মহাজীবনের কথা বলছেন। আমরা মনযোগ দিয়ে শুনছি। আগেই শুনেছি যে বটদ্রবা বা বরদোয়ায় যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নরেনবাবু তার একজন অন্যতম উদ্যোক্তা ও প্রধানপুরুষ। আমরা তাই মনযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনছি। নরেনবাবু বলে চলেছেন—সাতষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত শ্রীশঙ্কর বটদ্রবায় বাস করেছেন। চুয়ান্ন বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল সূর্যবতী আর দ্বিতীয়ার কালিন্দী, কালিন্দী আই।

শঙ্করদেব তৎকালীন কথ্য ভাষায় ন'খানি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ব্রজবুলি ভাষায় ছ'খানি নাটক বা 'অঙ্কীয়া-নাট', তিরিশ অধ্যায় 'কীর্তনঘোষা',

দু' শ' চল্লিশটি 'বরগীত,' একখানি সংস্কৃত ভক্তি রত্নাকর রচনা করেছেন। তিনি কথ্য ভাষায় ভাগবতের অনুবাদ করেন। কথ্য ভাষায় তিনিই প্রথম সাহিত্য রচনা করে ভারতীয় সাহিত্যে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন।

আমরা মাথা নাড়ি। নরেনবাবু বলতে থাকেন—আপনারা তাঁর বৃন্দাবনী বস্ত্র বয়নের কাহিনী শুনেছেন। সে-ও কি কম কথা। তবে সেই বস্ত্র বয়নের প্রধান তাঁতি ছিলেন গোপাল। শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পরে শঙ্করদেব তাঁরই নাম রেখেছিলেন মথুরাদাস। তিনিই মথুরাদাস বুঢ়া আতা।

আমরা আবার মাথা নাড়ি। এবং সেইসঙ্গে মহাপুরুষের প্রতি পুনরায় শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। আর মনে মনে ভাবি, আমি সত্যই ভাগ্যবান। আজ আমি তাঁর জন্মভূমি দর্শন করতে চলেছি।

আর বেশিক্ষণ গাড়িতে বসে থাকতে হয় না। মাত্র ১৪ কিলোমিটার পথ। বেলা আড়াইটে নাগাদ আমরা বটদ্রবা সত্রের সামনে উপস্থিত হলাম।

গাড়িতে বসেই তোরণ দেখতে পেলাম। অর্ধচন্দ্রাকার সুবিশাল তোরণ। গাড়ি নিয়ে যাতে ভেতরে না যাওয়া যায়, তাই সারা তোরণ জুড়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। আজ অবশ্য ঐ সিঁড়ি না থাকলেও গাড়ি নিয়ে ভেতরে যাওয়া যেত না। কারণ তোরণের সামনে বাঁশের মাচা, মিস্ত্রি কাজ করছে। তোরণটির সংস্কার সাধন করা হচ্ছে।

গাড়ি থেকে নেমে আমরা তোরণটিকে দেখি। বড় বড় কয়েকটি মূর্তিযুক্ত সুন্দর তোরণ। দু-দিকের হাতি ও ঘোড়ার এবং ওপরের পরী মূর্তিগুলি ভাল লাগে আমার।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার অবকাশ নেই। সময় সংক্ষিপ্ত। সন্ধ্যার মধ্যে সব কিছু দেখে নিতে হবে। অতএব বাঁশের অবরোধ অতিক্রম করে সত্রে প্রবেশ করি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা গায়ে একটা শিহরন বয়ে যায়। আমি শ্রীমন্ত শঙ্করের পুন্যজন্মভূমিতে পদার্পণ করেছি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত

প্রথম সত্রে এসেছি। জীবনদেবতা, তুমি বড়ই করুণাময়।

তোরণের পরে চওড়া বাঁধানো পথ। পথের বাঁদিকে কোমর সমান ইটের দেওয়াল। তারপরে অনেকখানি খালি জায়গা, সেখানে নানা জাতের ছোট-বড় গাছ।

ডানদিকে পথের পাশে নাটঘর। বিরাট লম্বা অনেকটা উঁচু একখানি টিনের চৌচালা, ইটের দেওয়াল, বাঁধানো মেঝে। পথের পাশে কোন দরজা নেই। কিন্তু আগাগোড়া লোহার জাল দেওয়া জানলা।

একটু বাদেই কার্যালয়। সামনে লেখা—'শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেবগোস্বামী—সত্রাধিকার, শ্রীশ্রীনরোয়া সত্র, বরদোয়া (বটদ্রবা)।'

দেখা হল সত্র পরিচালন সমিতির সভাপতি ও দুজন পুরোহিতের সঙ্গে। আমাদের অপেক্ষাতেই তাঁরা বসেছিলেন কার্যালয়ের সামনে।

নমস্কার বিনিময়ের পরে সভাপতি বলেন—আগে চলুন, আপনাদের দেখিয়ে দিই। তারপরে অফিসে বসে চা খাওয়া যাবে, কথাবার্তাও হবে।

আমরা তাঁদের পেছনে হাঁটতে শুরু করি। একটু বাদে সহাস্যে সভাপতি বলেন—ডঃ কলিতা যখন সঙ্গে রয়েছেন, আমরা না থাকলেও আপনাদের কোন অসুবিধে হত না।

—না, না, তা কেন? আপনারা সঙ্গে আসায় ওঁদের সুবিধে হবে বৈকি! নরেনবাবু প্রতিবাদ করেন।

আমরা কীর্তনঘরের সামনে আসি। বরপেটা নামঘরের মতো বড় নয়, কিন্তু বাড়িটা বেশ আধুনিক এবং ভাল, সাজানো-গোছানো। প্রকাণ্ড সিংহদ্বার—দুদিকে দুটি দণ্ডায়মান সিংহমূর্তি। দরজা পার হয়েই চওড়া বারান্দা। একদিকে গোল গম্বুজের সারি আরেকদিকে বড়-বড় দরজা-জানলা যুক্ত নামঘর।

ভেতরে আসি। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত ও সুসজ্জিত কীর্তনঘর। বরপেটার মতো বড় না হলেও ছোট নয়। পেছনের অংশে মাঝামাঝি জায়গায় ভাগবতের আসন। তিনখানি নয়, একখানি আসন।

প্রণব বলে—প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় এখানে নামপ্রসঙ্গ হয়।

—আমাদের এখানে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়, তাঁরাও নামপ্রসঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতির কথা শুনে অবাক হই। এটি আদি-নামঘর। এখানে যখন মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়, তখন বরপেটায় কেন এই অন্যায় নিয়ম? কে এই প্রথার প্রচলন করেছেন? মাধবদেব? মনে তো হয় না। তাহলে? না। কথাটা জিজ্ঞেস করা উচিত হবে না। অতএব নীরবে এগিয়ে চলি।

আসনের সামনে আসি। কয়েকটি দণ্ড ও ছত্র সহ পূজার নানা উপকরণে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য আসন। সামনে কয়েকসারি ছোট-ছোট রঙিন বাল্‌ব জ্বলছে। ঘরের সর্বত্র প্রচুর আলো ও পাখার ব্যবস্থা। তবু আসনের সামনে একটি তেলের প্রদীপ জ্বলছে। না, প্রদীপ নয়, বন্তি—অনির্বাণ পুণ্যশিখা। পাঁচ শ' বছর ধরে প্রজ্বলিত রয়েছে। সমাজের সকল অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করে চলেছে।

আমরা আসনের আরো সামনে আসি। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা, যাঁর দেখা পাই নি, কেবল তাঁর অপরূপ রূপ কল্পনা করতে পারি, এটি তাঁরই আসন। আমরা তাঁর পুণ্যাসনকে প্রণাম করি।

অহোম আমলে নির্মিত একটি পেতলের দরজা পার হয়ে মণিকূটে আসি। এখানে কোন বিগ্রহ নেই। এখানেও ভাগবতের আসন। বাগ্ময় মূর্তি। অন্য কিছু নেই। কেনই বা থাকবে? এটি তো অন্যান্য নামঘরের মতো সাধারণ মণিকূট নয়, এটি যে সেই পরম পবিত্রক্ষেত্র। আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' বছর আগে এখানেই আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীমন্ত শঙ্কর। এই তাঁর পুণ্যজন্মভূমি। তাঁর অক্ষয় আত্মাকে প্রণাম করি। প্রার্থনা করি—তুমি পুনরায় আবির্ভূত হও। আমাদের আলো দাও। সমাজের সকল বিভেদ দূর করে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করো, আমাদের মানবধর্মে দীক্ষিত করো। তোমার স্বপ্ন সফল হয়ে উঠুক। মাটির পৃথিবী মানুষের পৃথিবীতে পরিণত হোক।

আবার ফিরে আসি কীর্তনঘরে। সভাপতি আমাদের কয়েকটি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র দেখালেন—দবা মানে বড়ঢোল, খোল, করতাল ও

নেগেরা অর্থাৎ নাগরা ইত্যাদি।

নরেনবাবু বলেন—আগে প্রসঙ্গের সময় সাধারণত মুসলমান ভক্তরা নাগরা বাজাতেন।

কীর্তনঘর দেখে পদশিলা গৃহের সামনে আসি। এটি কীর্তনঘরের বাঁদিকে অবস্থিত। সুসজ্জিত কাঠের সিংহাসনে সেই পবিত্র পদচিহ্ন। একখানি বেশ বড় পাথরের ওপরে মহাপুরুষের পায়ের ছাপ। সিংহাসনের সামনে বটা হরাই ও পঞ্চপ্রদীপ সহ কিছু পুজোর উপকরণ।

উপকরণ নয়, পদচিহ্নের দিকে চোখ পড়তেই আবার আমার শরীরে শিহরস জেগে ওঠে। পাঁচ শ' বছর ধরে এই চরণচিহ্ন সযত্নে পূজিত হয়ে আসছে, এবং আগামী পাঁচ হাজার বছরেও যে চিহ্ন ক্ষয় হবে না, আমি তারই সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি দেখি, তাকিয়ে থাকি আর মনে মনে প্রণাম করি।

নরেনবাবু বলেন—উৎসবের সময় এলে এখানে এক মিনিটও দাঁড়াতে পারতেন না। পেছনের দর্শনার্থীরা আপনাকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিতেন।

—তখন খুব ভিড় হয় বুঝি?

—হ্যাঁ। খুবই ভিড়।

আজ কিন্তু কেবল আমরা ক'জন। তাই বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি, অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি মহাপুরুষের চরণচিহ্নের দিকে। তারপরে তাঁর কাছে আবার আগের প্রার্থনাটি জানিয়ে এগিয়ে চলি।

হাঁটতে হাঁটতে মণিকূটের পেছনে এসেছি। এখানে একটা ভারি সুন্দর পুকুর। জলপদ্ম গাছে বোঝাই। কয়েকটা হাঁস জলকেলি করছে। সভাপতি বলেন—এটা মহাপুরুষের সময়ের পুকুর। আমরা বলি হাটী পুখুরি।

পুকুরপাড় ছাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে গোড়া বাঁধানো একটা গাছের নিচে এসে থামতে হল। ববি জিজ্ঞেস করে—এটা কি গাছ?

—হরীতকী। আমরা বলি শিলিখা। এই গাছের গোড়ায় বসে ঐ পাথরখানির ওপরে সাচিপাত রেখে মহাপুরুষ পুঁথি রচনা করতেন।

—তাহলে এই গাছ এবং ঐ পাথরখানি রীতিমত ঐতিহাসিক।

—নিশ্চয়ই। সেইসঙ্গে পবিত্রও বটে। দিলীপবাবু যোগ করেন।

পুণ্য-বৃক্ষ ও পুণ্য-প্রস্তরকে প্রণাম করে পুনরায় পরিক্রমা শুরু করি।

তারপরে ওঁরা আমাদের একটা সাচিগাছের কাছে নিয়ে এলেন। নরেনবাবু বলেন—শ্রীশঙ্করদেবের সময়ে যে সাচিগাছটি এখানে ছিল অর্থাৎ যে গাছের বল্কলে বা সাচিপাতে তিনি তাঁর অধিকাংশ পুঁথি রচনা করেছেন, সেটি কিছুকাল আগে মরে গিয়েছে।

নরেনবাবু থামতেই সৌম্যেনবাবু যোগ করেন—সেকালে সাচিপাতে পুথি রচনা করা হলেও, সাচিগাছের প্রধান বৈশিষ্ট্য কিন্তু তার বল্কল নয়, কাণ্ড মানে কাঠ। এই গাছের কাঠ চন্দনের চেয়ে সুগন্ধী। তাই মধ্যপ্রাচ্যে এ কাঠের খুবই চাহিদা। নিয়মিত রপ্তানি করা হয়। এই কাঠ পুড়িয়ে মধুর সুবাস ছড়িয়ে তাঁরা মাননীয় অতিথিদের অভ্যর্থনা করেন।

সাচিগাছ থেকে পাটনাদের সামনে আসি। 'পাটনাদ' মানে পাতকুয়ো। এটি মণিকূটের ডানদিকে অবস্থিত। শ্রীশঙ্কর এই কুয়োর জল ব্যবহার করতেন।

আর তাই কুয়োটির চারদিকে ঘর তৈরি করা হয়েছে। মন্দিরাকৃতি চমৎকার একখানি টিনের ঘর। পাথরের মসৃণ মেঝে। দেওয়ালে সুন্দর খোদাই কাজ।

আমরা দর্শন করি। তারপরে সবার সঙ্গে আবার হাঁটতে থাকি। কোথায়? বুঝতে পারছি না।

প্রকাণ্ড এলাকা নিয়ে সত্র। ইটের দেওয়াল আর তারকাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা। নামঘর নাটঘর যাত্রীনিবাস অফিস কোয়ার্টার্স পুকুর বাগান সবই আছে। সারা এলাকা জুড়েই গাছের বাহার। নারকেল-সুপারি, আম-কাঁঠাল, তেঁতুল-হরিতকী থেকে দুর্মূল্য সাচিগাছ, কি নেই এখানে। আর গাছে গাছে পাখির জলসা। দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে পথ চলেছি। চলছি আর ভাবছি—এই

সেই পুণ্যভূমি যেখানে ভূঞা-শঙ্কর শ্রীমন্ত-শঙ্করে রূপান্তরিত হয়েছেন। এই পবিত্রক্ষেত্রে পাঁচ-শ' বছর আগে যে বর্ণবৈষম্যহীন সমাজবাদের বীজ বপিত হয়, উত্তরকালে তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এখানেই ধ্বনিত হয়েছিল, সর্বকালের সর্বদেশের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

তারপরে এই মহাতীর্থ থেকে প্রেমধর্মের যে প্লাবন শুরু হয়, তাতে শিবসাগর থেকে কোচবিহার পর্যন্ত ভেসে গিয়েছিল। আমি সেই মানবতীর্থ বটদ্রবা সত্রের পথে পদচারণা করছি।

সামনের দিকে নজর পড়তেই ভাবনা থেমে যায়। আমরা কি তাহলে কোন নদীর তীরে এসে গেলাম ?

—না, না। নরেনবাবু বলেন—নদী নয়, আকাশীগঙ্গা, একটা বড় দিঘি।

তাই বটে। কিন্তু এতো সেই আমার দেশের দিঘি, আমরা বলতাম সাগর। আর এঁরা বলছেন গঙ্গা—আকাশীগঙ্গা। অথচ আসামে গঙ্গা নেই। তাহলেও সার্থকনামা আকাশীগঙ্গা। শান্ত-স্থির দিঘির জলে আকাশের ছায়া পড়েছে, আকাশ এসে মিলিত হয়েছে গঙ্গার বুকে, তাই দুয়ে মিলে আকাশীগঙ্গা।

শুধু জল নয়, তার তীরভূমিও ভারি সুন্দর। চার-পাড় জুড়েই সারি সারি গাছ—নারকেল সুপারি আম কাঠাল কলা আর কলাবতীর বন।

—কিন্তু গঙ্গায় কোন ঘাট নেই কেন ?

—আকাশীগঙ্গায় স্নান-তর্পণ সবই নিষেধ।

গঙ্গায় গঙ্গাস্নান নিষিদ্ধ! বিচিত্র ব্যাপার! তবু নিয়ম মানে নিয়ম। বৈষ্ণব ধর্মে অনিয়মের কোন স্থান নেই।

অতএব সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন না করে ওঁদের কথা শুনি। ওঁরা বলেন —তীর্থদর্শনের নিয়মানুযায়ী যাত্রীদের গঙ্গা পরিক্রমা করে গঙ্গাকে কিছু দান দিতে হয়।

—তার মানে টাকা-পয়সা জলে ফেলতে হয় ? ববি জিজ্ঞেস করে।

জনৈক পুরোহিত মাথা নেড়ে বলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর এই নিয়ে একবার একটা ভারি মজার ঘটনা ঘটেছে।

—কি রকম?

—একবার একজন মুন্সেফ নগাঁও থেকে এখানে এলেন, সঙ্গে স্ত্রী ও দুটি ছেলে মেয়ে। ছেলে ছোট। সে বায়না ধরল, আকাশী-গঙ্গায় একটি টাকা ফেলতে হবে। কিন্তু মুন্সেফ মিতব্যয়ী, তিনি মেহনতের টাকা জলে দিতে রাজি হন না।

কিছুক্ষণ বাদেই বিচিত্র এক ঘটনা ঘটল। মুন্সেফ তখন সপরিবারে আকাশীগঙ্গা পরিক্রমা করছেন। হঠাৎ পা পিছলে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে তিনি জলে পড়ে গেলেন। তাঁরা তিনজনের কেউ সাঁতার জানতেন না।

ছেলের কিন্তু কিছুই হল না। বরং সে তাঁদের উদ্ধারকর্তার ভূমিকা পালন করল। তার চিৎকার শুনে কয়েকজন যাত্রী ছুটে এসে মুন্সেফ এবং তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে জল থেকে তুলে আনলেন।

—তারপরে মুন্সেফ নিশ্চয়ই আকাশীগঙ্গায় দান দিলেন?

—হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্য শেষ পর্যন্ত তাঁর আপসোসের অন্ত রইল না।

—কেন?

—দান দেবার পরে তিনি জানতে পারলেন, সাঁতার না জানলেও জলে পড়ে গিয়ে তাঁদের কোন ক্ষতি হত না। কারণ আকাশীগঙ্গায় কেউ ডুবে মরে না।

আকাশীগঙ্গার বুকে সূর্যাস্ত দেখে আমরা আবার সত্রে ফিরে চলেছি। সেখানে চা-পানের পরে রওনা হব নগাঁও। পথে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে নামতে হবে একবার। নরেনবাবু বলেছেন, আসামের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের অবদান ও বর্তমান যুগে তার প্রভাব নিয়ে গবেষণার উদ্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়ে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওখানে ২২০ খানি পুঁথি সংরক্ষিত হচ্ছে। পুঁথিগুলি সাচিপাত, তুলাপাত

(হাতে তৈরি কাগজ) কিম্বা কলের কাগজের ওপরে হস্তলিপি। শঙ্করদেব ও মাধবদেবের হাতে লেখা পুঁথিও রয়েছে।

কিন্তু সত্র কিম্বা গবেষণাকেন্দ্র নয়, আমি ভাবছি শ্রীমন্ত শঙ্করের কথা। তাঁর যে আজ বড়ই প্রয়োজন। কারণ আজকাল আমরা এদেশে প্রায় প্রতিদিন বিপ্লবের নামে হত্যা আর ধ্বংস দেখতে পাচ্ছি। অথচ সমাজে শোষণ আর দুর্নীতি কমছে না, অত্যাচার আর অবিচার বন্ধ হচ্ছে না।

এইসব বিপ্লবীদের কাছে শঙ্করের পথ আর মতকে তুলে ধরতে হবে। কারণ তাঁর চেয়ে বড় বিপ্লবী উত্তর-পূর্ব ভারতে আবির্ভূত হন নি। তিনি রক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটিয়ে সমাজের সকল শোষণ আর অবিচার বন্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আজকের সমাজ বিপ্লবে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সহিষ্ণুতা। শঙ্করদেব সহিষ্ণুতার পরম প্রতীক। আমার বিশ্বাস তিনি এই অস্থিরতার যুগেও আমাদের কাম-বাসনাহীন এক জলন্ত ভালোবাসার সন্ধান দিতে পারেন। সেই ভালোবাসার আগুন সমাজের সবখানি অন্যায়ের খাদ পুড়িয়ে মানুষের জীবনকে খাঁটি সোনার মতো উজ্জ্বল আর পবিত্র, মহৎ আর সুন্দর করে তুলতে পারে।

॥ কুড়ি ॥

সময় সতত সঞ্চরমান। দিন বসে থাকে না। দিনের পরে রাত, রাতের পরে আবার দিন। এমনি করে সময় বয়ে চলে। এ চলার শেষ নেই।

কথাটা অজানা নয়। তবু এখানে আসার পরে ববি যখন বলল —তুমি আর মাসি দুজনেই আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরছ।...খুব একটা দেরি কোথায়, মাত্র তো আড়াই মাস। দেখতে দেখতে এসে যাবে।

তখন একটু চিন্তাতেই পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সত্যই এসে গেল। আজ সতেরোই অক্টোবর রবিবার। একুশে বিকেলের ফ্লাইটে আমরা কলকাতায় ফিরছি। পরদিন থেকে পুজো।

আর তাই আজ দুপুরে মিসেস বাণী ভট্টাচার্য তাঁর বাসায় আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন এবং এখন বেড়াতে নিয়ে চলেছেন গৌহাটির ওপারে।

এতবার গৌহাটি এসেও ওপারে যাওয়া হয় নি। ওপার থেকে নাকি গৌহাটিকে ছবির মতো সুন্দর দেখায়। তাছাড়া ওপারে রয়েছে দুটি বিখ্যাত মন্দির—দৌল গোবিন্দ আর দীর্ঘেশ্বরী।

মিসেস ভট্টাচার্য তাঁর গাড়ি নিয়ে আমাদের বাসায় এসেছেন সকাল দশটায়। আমরা আগেই স্নান সেরে নিয়েছিলাম। জল-খাবার খেয়ে নিয়ে সাড়ে দশটা নাগাদ গাড়িতে উঠেছি। আমি ও ববি ড্রাইভারের পাশে বসেছি, খুকু বুলা ও মিসেস ভট্টাচার্য পেছনে।

গাড়ি সরাইঘাট পুল পার হয়ে বাঁদিকের পথ ধরে নেমে এসেছে ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমিতে। তারপরে একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে রেললাইন পার হয়ে আমিনগাঁও। সরাইঘাট পুল তৈরি হবার আগে আমিনগাঁও একটা জমজমাট রেল-শহর ছিল। যাত্রীদের এখানে ট্রেন থেকে নেমে

ফেরি স্টিমার ধরে ওপারে গিয়ে আবার রেলে চাপতে হত। এখন আমিনগাঁও কেবল রেলওয়ে সাইডিং আর রেল-কলোনি। তাহলেও মিসেস ভট্টাচার্যের অনেক স্মৃতি এই প্রাক্তন রেল-শহরকে নিয়ে। তিনি তাঁর ডাক্তারী জীবনের প্রথম দিকের দু-একটি স্মৃতি রোমন্থন করে চলেন।

রেল-কলোনি পার হয়ে আমরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে পৌঁছলাম। ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে পথ, ভারি সুন্দর। কিন্তু ওপারের দৃশ্য আরও রমণীয়। দেখতে পাচ্ছি কামাখ্যা পাহাড়, গৌহাটির বাড়ি-ঘর আর ব্রহ্মপুত্রের বুকে উমানন্দ—স্বপ্নসুন্দর সবুজদ্বীপ।

এখন বেলা সওয়া এগারোটা। ব্রহ্মপুত্রের তীর ধরেই চলেছি এগিয়ে, সেই পুবদিকে। উমানন্দ আমাদের সোজাসুজি, ডাইনে। এখন সে আর শুধু সবুজ নয়, সেইসঙ্গে গোলাকার। কামাখ্যা সরে গিয়েছে পেছনে, শহর গৌহাটি এসেছে এগিয়ে। কিন্তু অদৃশ্য হয়েছে সরাইঘাট পুল। কারণ ব্রহ্মপুত্র বাঁক নিয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের পথটাও। পথটি যে মালার মতো মহানদকে রয়েছে জড়িয়ে।

সাড়ে এগারোটায় দৌল গোবিন্দ মন্দিরের সামনে পৌঁছলাম। এ জায়গাটাকে বলে উত্তর গুয়াহাটী, পিনকোড—৭৮১০৩০।

জায়গাটা বেশ জম-জমাট। পথের পাশে প্রচুর দোকান-পাট। বেশির ভাগ ফুল ও পূজার উপকরণের। তবে মুদি মনোহারি জামা-কাপড়, শর্যাদ্রব্য এবং ইলেক্ট্রনিক্স ইত্যাদির দোকানও রয়েছে।

গাড়িতে জুতো রেখে নেমে আসি পথে। পূজার ডালি কিনে মন্দির তোরণে আসি। তোরণের সামনে লেখা—'শ্রীশ্রীদৌল গোবিন্দ মন্দির' বাঁদিকে একটা গণেশ মূর্তি। সিদ্ধিদাতা গণপতিকে প্রণাম করে ছ'ধাপ সিঁড়ি বেয়ে পথ থেকে প্রাঙ্গণে পৌঁছই।

প্রাঙ্গণ জুড়ে বাঁধানো পায়েচলা চওড়া পথ। পথটি গিয়ে শেষ হয়েছে মন্দিরের সামনে। পথের দুপাশেই অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। অর্থাৎ প্রাঙ্গণটি বেশ বড়। মন্দিরটি একতলা, অনেকটা লম্বা। সামনে লেখা—'মহাপ্রভু শ্রীশ্রী দৌল গোবিন্দ মন্দির।'

পথের শেষে সিড়ি, সারা মন্দির জুড়েই। দেওয়াল নেই, খোলা মন্দির। কেবল কোমর সমান লোহার 'ফেন্‌সিং'। অনেকগুলি গোল ও চৌকো স্তম্ভের ওপরে ছাদটা দাঁড়িয়ে। ছাদের মাঝখানে সাদা গম্বুজ—মন্দির শিখর।

আট ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসি মন্দিরে। গর্ভগৃহে প্রবেশ করি। দোলমঞ্চের ওপরে কাঠের সিংহাসনে শ্যামচাঁদ, কৃষ্ণ-পাথরের অনিন্দ্যসুন্দর বিগ্রহ। পাশে একটা কৃত্রিম কদমগাছ, সেখানেও গোবিন্দ—দোল গোবিন্দ। ওরা পুজো দেয়, আমি প্রণাম করি।

গর্ভগৃহের বাইরে একপাশে আরেকটি দোলমঞ্চ। ভক্তদের প্রদীপ ও ধূপ নিবেদনের জন্য। ধাপে ধাপে প্রদীপ জ্বলছে, ধূপকাঠির ধোঁয়া উড়ছে, ভারি সুন্দর সুবাস। মিসেস ভট্টাচার্য আর আমার দুই ভাগনি আলোকসজ্জায় অংশ নেয় আর আপন মনে দোল গোবিন্দের কাছে মনস্কামনা নিবেদন করে।

সভামণ্ডপটি বেশ বড়। বৃহত্তর অংশ দালান, খানিকটা জায়গায় শুধু টিনের চাল। আলো ও পাখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। আগাগোড়া মোজাইক করা মসৃণ মেঝে। বহু ভক্ত নর-নারী দর্শন শেষে বিশ্রাম করছেন। আমরাও বসে পড়ি।

বেলা বারোটায় গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু খুলল কয়েক মিনিট বাদেই। আর তারপরেই শুরু হল ভোগারতি। তাড়াতাড়ি উঠে গর্ভগৃহের সামনে আসি।

ভোগারতি শেষ হতেই সবার সঙ্গে সারি বেঁধে বসে পড়ি সভা-মণ্ডপে। স্বেচ্ছাসেবকরা সামনে একটি করে শালপাতার বাটি রেখে গেল। তারপরে শুরু হল প্রসাদ বিতরণ—ভেজানো মুগ, নারকেল ফালি, আদাকুচি ও একটি করে পাকা কলা।

প্রসাদ পেয়ে দোল গোবিন্দজিকে পুনরায় প্রণাম জানিয়ে প্রশান্ত চিত্তে গাড়িতে এসে বসি। গাড়ি এগিয়ে চলে। এখন বেলা সাড়ে বারোটা।

এবারে পথের দৃশ্য আরও সুন্দর। ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে

ছায়াশীতল পথ। ব্রহ্মপুত্র অপরূপ কিন্তু তার চাইতেও ভাল লাগছে গৌহাটিকে। পরপারে সে যেন এক মায়াময় মোহনগরী। সত্যিই তাই, নইলে আমি এতগুলো দিন এমন আনন্দে কাটিয়ে দিলাম কেমন করে? অলকাপুরী আসামের মধ্যমণি গুরাহাটী, তোমাকে প্রণাম। আমি আবার ফিরে আসব তোমার কাছে।

দৌল গোবিন্দ থেকে ছ' কিলোমিটার পথ পার হয়ে বেলা পৌনে একটার সময় দীর্ঘেশ্বরী দেবালয়ের দ্বারে উপস্থিত হলাম।

পথের বাঁ পাশে গাছে ছাওয়া পাহাড়, আর ডানপাশে ব্রহ্মপুত্র। মোটরপথ থেকে একটা পায়ে চলা চড়াই পথ উঠে গিয়েছে পাহাড়ে। সেই পথের ওপরেই মন্দির তোরণ, লেখা রয়েছে—'শ্রীশ্রীদীর্ঘেশ্বরী দেবালয়'।

সারি বেঁধে পথচলা শুরু করি। কোথাও বাঁধানো সিঁড়ি, কোথাও বা পাথর কেটে ধাপ। আমার ভাগনিরা সমানে সাবধান করছে আমাকে—আস্তে আস্তে চলো, বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙো·· ইত্যাদি। ওদের বোধকরি খেয়াল নেই যে আমাদের সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার রয়েছেন, যিনি একটা রেলওয়ের চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন।

খানিকটা উঠে পথের বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে গণপতির মূর্তি খোদিত। ভক্তদের তেল-সিঁদুরে প্রলিপ্ত। সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চলি।

কয়েক ধাপ উঠেই শ্রীহনুমান। ভক্তপ্রবর মহাবীরকে প্রণাম করে আবার এগিয়ে চলি।

কিন্তু চলার কি উপায় আছে? মহানদ আর তার ওপারে মহানগরীর দিকে দৃষ্টি পড়লেই পা দুটি আপনা থেকে অচল হয়ে যাচ্ছে। বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে, আমি অলকাপুরী আসামের পথে পদচারণা করছি। এপথে চোখ মেলে চলতে হয়, আর চলতে চলতে অলকাপুরীর অপরূপ রূপ আস্বাদন করতে হয়। খুকু ও বুলা বৃথাই ভয় পাচ্ছিল। আমার সাধ্য কি, তাড়াতাড়ি পথ চলি?

দেখতে দেখতে পথ চললেও একসময় চড়াইপথ শেষ হল। আমরা পাহাড়টার প্রায় সমতল শিখরে উঠে এলাম। পাহাড়টির নাম সীতাচল।

ববি জিজ্ঞেস করে—দীর্ঘেশ্বরী কি বৈদিক দেবি?

—নিশ্চয়ই। মিসেস ভট্টাচার্য উত্তর দেন। বলেন—দীর্ঘেশ্বরী হলেন স্বয়ং শিবজায়া সতী। এটি একান্ন পীঠের অন্যতম। এখানে সতীমায়ের দক্ষিণ-অঙ্গ পতিত হয়েছে। একে গুপ্ত-কামাখ্যাও বলা হয়। এবং এখানেই মার্কণ্ডমুনির আশ্রম ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই দীর্ঘেশ্বরী দেবালয়ের উল্লেখ রয়েছে। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে, এই তীর্থ দর্শন না করলে তীর্থদর্শন অপূর্ণ থেকে যায়।

তীর্থদর্শন অপূর্ণ থাকত কি না জানা নেই আমার, তবে এখানে না এলে নিঃসন্দেহে গুয়াহাটী ভ্রমণ অসমাপ্ত রয়ে যেত। সত্যই অপূর্ব অবস্থান। এখান থেকে যে গুয়াহাটীকেই আমার অলকাপুরী বলে মনে হচ্ছে।

অনেকখানি প্রায় সমতল জায়গা নিয়ে মন্দির এলাকা। প্রথমেই দেবির চরণ-চিহ্ন, পথের পাশে একখানি পাথরে। প্রণাম করি।

কয়েক পা হেঁটে ডানদিকে সেবাইতদের বাসগৃহ আর বাঁদিকে মন্দির। বালি সিমেণ্ট লোহা ইট পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরি আধুনিক মন্দির। এখনও কিছু কাজ বাকি রয়েছে।

ভারত সরকারের সবচেয়ে বড় দপ্তর রেল। রেলের চাকা অচল হলে জনজীবন স্তব্ধ। স্থানীয় সেই রেলবিভাগের স্বাস্থ্যশাখার প্রধান ছিলেন মিসেস ভট্টাচার্য। অতএব এখানে এসে তাঁর পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হবে না, এমন আশঙ্কার কোন কারণ থাকতে পারে না।

সেবাইতদের ঘরের সামনে পৌঁছতেই কানে আসে—এই যে দিদি, আসুন আসুন!

তাকিয়ে দেখি জনৈক যুবক সেবাইতদের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে ডাকছেন। তাঁর পাশে একটি বিবাহিতা যুবতী।

—তুমি এখানে? ডাক্তারদিদি বিস্মিতা, পুলকিতাও বটে।

—আজ্ঞে, আমি যে এই মন্দিরের একজন ট্রাস্টি। আজ রবিবার তাই একটু দেখাশোনা করতে এসেছি। আর এ আমার স্ত্রী। যুবক পাশের যুবতীকে দেখিয়ে দেন। সে নমস্কার করে।

প্রতি নমস্কার জানিয়ে আমরা সেই বারান্দায় এসে দাঁড়াই। সেবাইত বেরিয়ে আসেন। একটা লম্বা টুল দেখিয়ে বলেন—বসুন।

আমরা আসন গ্রহণ করি। একটু বাদে মিসেস ভট্টাচার্য যুবকটির সঙ্গে পরিচয় করে দেন। নাম, অমরেন্দ্র বরদলৈ। বাড়ি উজানবাজারে।

সঙ্গে সঙ্গে খুকু বলে ওঠে—তাহলে তো আপনি আমাদের প্রতিবেশি। আমরা ল্যাম্ব্‌ রোডে থাকি।

অমরেন্দ্র খুশি হয়। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে বলে—চলুন, এবারে দর্শন করে নেবেন।

আমরা উঠে দাঁড়াই। স্বামী-স্ত্রী সঙ্গী হয়।

প্রথমে ওরা আমাদের নিয়ে আসে সেবাইতের ঘরের পেছনে। পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ভারি সুন্দর ঝরনা এসেছে নেমে। গিয়ে পড়ছে পাশের জলাশয়ে। নাম সীতাকুণ্ড। ঝরনার জলে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে আমরা ওদের সঙ্গে মন্দিরে চলি।

চলতে চলতে অমরেন্দ্র বলে—এ মন্দিরের প্রধান উৎসব দুর্গা-পূজা। পুজোর তিনদিনই এখানে পাঁঠা মাগুরমাছ এবং মোষ বলি দেওয়া হয়।···

আঁতকে উঠি। শৈশবের সেই নিষ্ঠুর স্মৃতি জেগে ওঠে। আমাদের বাড়িতেও মোষ বলি দেওয়া হত। একটা পৈশাচিক ব্যাপার। সৌভাগ্যের কথা আমাদের কিশোর বয়সেই কাকারা সেই অকারণ হত্যা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মন্দিরে উঠে আসি। অমরেন্দ্র বলে—অহোমরাজ শিব সিংহ প্রথম এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমান মন্দিরটি তৈরি হয়েছে ১৯৮৭ সালে।

নাট-মন্দিরে শ্বেতপাথরের দোলমঞ্চের ওপরে মা-অন্নপূর্ণার

বাঁধানো চিত্র। প্রণাম করে এগিয়ে চলি।

নাটমন্দিরের শেষে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি নিচে। কামাখ্যা মন্দিরের অনুকরণে একটি কৃত্রিম গুহামন্দির তৈরি করা হয়েছে। পাথর নয়, কংক্রিটের গুহা। ভেতরে আলো আর আঁধারের হেয়ালি। নাটমন্দিরে বৈদ্যুতিক আলো আর এখানে তেলের প্রদীপ।

তারই স্বল্পালোকে দর্শন করি দেবি দীর্ঘেশ্বরীকে। তাঁর পাশে শিব ও গণেশ। প্রণাম করি।

সেবাইত জানান—এই পীঠে সাপ আছে। মাঝে মাঝেই তারা মায়ের মূর্তিকে বেষ্টন করে থাকে। তখনও কিন্তু মায়ের কাছে আসায় কোন বাধা নেই। সাপ কিছুই বলে না।

—গণেশের বাহনরাও এখানে বাস করে। অমরেন্দ্র যোগ করে।

দর্শন শেষে উঠে আসি ওপরে। সেবাইতের বারান্দায় এসে বসতে হয় আরেকবার। তিনি সেই শালপাতার বাটিতে করে একই প্রসাদ অর্থাৎ ভেজানো মুগ নারকেল আর আদাকুচির প্রসাদ পরিবেশন করলেন। এটি আসামের নিজস্ব প্রসাদ। বরপেটা নগাঁও, সর্বত্রই এই প্রসাদ পেয়ে এসেছি। প্রসাদের ব্যাপারে দেখছি শাক্ত আর বৈষ্ণবে কোন পার্থক্য নেই।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আরেকবার এসে দাঁড়াই সেই পদশিলার সামনে। এখান থেকে মহানদ আর মহানগরীকে ভারি সুন্দর দেখায়। মহানদ যেন সবুজের মাঝে রূপোলি প্রবাহ। আর মহানগরীর সারি সারি বাড়িগুলো খেলাঘর। খেলা তো বটেই। সংসারের চেয়ে বড় খেলা আর কি আছে এ ভুবনে?

কিন্তু আর অলকাপুরী আসামের রূপ আস্বাদন নয়। দুটো বেজে গিয়েছে। ড. ভট্টাচার্য ও তাঁর ভাগনে আমাদের অপেক্ষায় না খেয়ে বসে রয়েছেন। এখান থেকে মালিগাঁও যেতে অন্তত একঘণ্টা লাগবে।

অতএব তাড়াতাড়ি পা চালাই। চলতে চলতে ভাবি, খাবার পরে একবার যেতে হবে দেবযানীদের কোয়ার্টার্সে। এবারেও অন্নগ্রহণ হয়ে উঠল না ওদের বাড়িতে। তাই দু-বোন অভিমান করবে। ভাঙাতে

কিছু সময় লাগবে!

অথচ বেশিক্ষণ বসা যাবে না। কারণ মিসেস ভট্টাচার্য বলেছেন, আমবাড়ি ফেরার পথে নামতে হবে জনার্দন দেবালয় ও শুক্রেশ্বর মন্দিরে। ঐ মন্দিরের ঘাট থেকে ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্য অপরূপ। শুনে খুকু আর বুলা উৎসাহিত হয়েছে।

আমি আপত্তি করতে পারি নি। অতএব ওদের সঙ্গে আমাকেও গিয়ে দাঁড়াতে হবে সেই ঘাটে। পনেরো বছর আগে গৌহাটি এসে প্রথম সন্ধ্যায় দাঁড়িয়েছিলাম যেখানে।

সেদিন আমাকে নিয়ে এসেছিল প্রগতি। ঐ ঘাটে বসে আমি তাকে বলেছিলাম কৈলাস ও মানস-সরোবরের কথা আর সে বলেছিল ব্রহ্মার পুত্র ব্রহ্মপুত্রের জন্মকাহিনী। তাই সে ঘাটে গিয়ে দাঁড়ানো আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর। তবু আজ যেতে হবে ওদের সঙ্গে।

অতএব অতীতের কথা আর নয়। তার চেয়ে ব্রহ্মপুত্রকে দেখতে দেখতে ফিরে চলা যাক। এপারে দীর্ঘেশ্বরী ওপারে শুক্রেশ্বর। এপারে আমি ওপারে প্রগতি। দুয়ের মাঝে বয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র—জীবন-নদী।

আগামীকাল এবারের মতো অলকাপুরী আসামের কাছ থেকে বিদায় নেব। বিকেলের ফ্লাইট ধরে মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরব। পরশু থেকে পুজো। আমি কলকাতায় পুজো দেখতে পারব। ববি তার কথা রেখেছে।

আজ তাই অনেকেই দেখা করতে এসেছেন। সকালে বীরেশ্বরবাবু, ডাক্তার ও মিসেস ভট্টাচার্য, দুপুরে উৎপল দেবযানী ও আরো কয়েকটি ছেলে মেয়ে, বিকেলে বন্দিতা ও মিসেস বরুয়া। আর এই সন্ধ্যাবেলা এসেছেন সুখময়বাবু ও দিলীপবাবু।

বিদায় নিতে আসা মানে আড্ডা দিতে আসা। তা-ই সকাল থেকেই শুরু হয়েছে আড্ডা এবং এখনো তার জের চলেছে।

কথায় কথায় হঠাৎ সুখময়বাবু আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন—আচ্ছা, আপনি প্রগতি সম্পর্কে এমন নীরব কেন? সেদিন নবকান্তবাবুকেও তার কথা কিছুই বললেন না। তাহলে আপনার প্রগতি কি একটা Fictitious Character?

—Oh no! She is not a fiction. Pragati is real, very real……

প্রতিবাদে প্রায় ফেটে পড়ি। নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে যাই। আমার তো এমন উত্তেজিত হয়ে পড়া উচিত ছিল না। আমার নীরবতাই যে ওদের কৌতূহলী করে তুলেছে।

—তাহলে তুমি কেন বলছ না সে কোথায় আছে, কেমন আছে? কেন তুমি শহীদ কনকলতা ছাত্রী নিবাসের সামনে আনমনা হয়ে যাও, কেন তুমি জোড়হাটে যেতে চাও না?

এবারে বুলা আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কি উত্তর দেব? অসহায় ভাবে দিলীপবাবুর দিকে তাকাই।

তিনিও দেখছি ওদের দলে। শান্তস্বরে আমাকে পরামর্শ দেন—সবাই যখন শুনতে চাইছেন, তখন বলে দিন সবকথা। তাতে এঁদের যেমন কৌতূহল মিটবে, তেমনি আপনার বুকটাও হালকা হয়ে যাবে।

—কিন্তু আসাম ভ্রমণের শেষ সন্ধ্যায় সেই বিষাদসিন্ধু মন্থন করে হলাহল পান করব? তাহলে যে 'অলকাপুরী আসাম' 'ট্র্যাজেডি' হয়ে উঠবে!

—উঠুক গে! ট্র্যাজেডি যে জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য। হলাহল পান করেছিলেন বলেই তো মহাদেব নীলকণ্ঠ হতে পেরেছেন।

তবু নীরব থাকি।

দিলীপবাবু আবার বলেন—আপনি তো কেবল প্রগতির দাদা নন, সেইসঙ্গে আপনার পাঠক-পাঠিকার রিপোর্টার। তাঁদের কাছে সত্য গোপন করবার কোন অধিকার নেই আপনার।

—আমাকে একটু সময় দিন, আমি আসছি।

কাউকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ভেতরে চলে আসি।

স্যুটকেস খুলে জেরক্স পৃষ্ঠাগুলো নিয়ে ফিরে আসি সামনের ঘরে।

ববি জিজ্ঞেস করে—ওগুলো কি?

—'বিস্ময়' নামে একটি অসমীয়া পত্রিকার অক্টোবর ১৯৯০ সংখ্যার কয়েকটি পৃষ্ঠা।

—তার মানে তিন বছর আগের পত্রিকা!

—হ্যাঁ। তিন বছর আগে ১৯৯০ সালের ১৭ই অগাস্ট মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে প্রগতি তাঁর সম্ভাবনাময় জীবনের যতি টেনে দিয়েছে।

—কেমন করে?

—১৯৯০ সালের নভেম্বার মাস। জাতীয় গ্রন্থাগারে বসে কাজ করছি, এমন সময় অসমীয়া বিভাগের লক্ষ্মী মুখোপাধ্যায় প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল আমার কাছে। বলল, শঙ্কুদা একটা বড়ই দুঃসংবাদ। আপনার প্রগতি আত্মহত্যা করেছে।...

—আত্মহত্যা! ওরা প্রায় সমস্বরে বলে ওঠে।

আমি মাথা নাড়ি। বলি—লক্ষ্মীর হাতে সেদিন ছিল 'বিস্ময়' পত্রিকাটি।

—কি লিখেছে? ববি জিজ্ঞেস করে।

পৃষ্ঠাগুলো ওর হাতে দিই। বলি—তুমিই সবাইকে পড়ে শোনাও।

ববি পড়তে শুরু করে—

'প্রগতিৰ আত্মহত্যা

বন্দুকৰ ট্রিগাৰ টিপিলে কোনে?

অজানাৰ আহবান অনুভব করিছিল প্রগতিয়ে। · অজানাৰ প্রতি বিৰাট মোহ আছিল প্রগতিৰ।...নদ-নদী, গিরি-গুহা, মরু প্রান্তৰৰ ৰহস্যই আকর্ষণ কৰিছিল প্রগতিক। ওঠৰ (আঠারো) বছৰ বয়সতে (বয়সে), কটন কলেজৰ পি-ইউ বার্ষিকত পঢ়ি থকা সময়তে (পড়ার সময়ে) বংগৰ প্রখ্যাত পৰিব্রাজক লেখক শংকু মহাৰাজলৈ চিঠি

লিখিছিল প্রগতিয়ে,—"মই (আমি) অসমৰ এজনী ছোৱালী (একটি মেয়ে)। অপৰিচিতা হৈও (হয়েও) আপোনালৈ (আপনাকে) চিঠি লিখিবলৈ (লিখতে) সাহস কৰিছো, আপোনাৰ কিতাপবোৰত (বই-গুলির মধ্যে) চিত্রিত হোৱা আপোনাৰ সুন্দৰ মনটোৰ (মনের) পৰিচয় পায় (পেয়ে)।...বাংলা মই (আমি) পঢ়িব পাৰোঁ (পড়তে পারি), কিন্তু লিখিব ভালকৈ নোৱৰো (লিখতে তেমন জানি না)। লিখা ভুল হলে ক্ষমা কৰিব।...আপনাৰ কিতাপ পঢ়ি হিমালয় আৰু ব্রহ্ম মণ্ডলৰ প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভৱ কৰিছোঁ।

শংকু মহাৰাজৰ মতে, অসমলৈ (আসামে) সেয়েই (সেই) আছিল তেওঁৰ (তাঁর) প্রথম আমন্ত্রণ।

প্রগতিৰ আমন্ত্রণৰ পিছত (পরে) '৭৬ চনত (সনে) অসমৰ যোৰহাটত অনুষ্ঠিত নিখিল ভাৰত বংগসাহিত্য সম্মিলনৰ অধিৱেশনত যোগদান কৰিবলৈ (করতে) শংকু মহাৰাজ অসমলৈ আহিছিল। প্রগতিৰ যোৰহাটৰ ঘৰলৈ গৈ (বাড়িতে গিয়ে) খবৰ পাইছিল, প্রগতিয়ে গুৱাহাটীর কটন কলেজৰ ছাত্রী-নিৱাসত পঢ়ি আছে।...

প্রগতিয়ে গুৱাহাটীতে শংকু মহাৰাজক কৈছিল, "কৈলাস আৰু মানস-সৰবৰলৈ মই আপোনাৰ লগত যাম (সঙ্গে যাবো) শংকুদা! মোৰ কোনো কষ্ট নাহয় (হবে না)। মই আপোনাৰ লগত সমান তালত (তালে) খোজকাঢ়ি (হেঁটে) যাম। আপনি মোক (আমাকে) লগত নিব, শংকুদা?"

সেই শংকুদা প্রগতিক আশীর্বাদ কৰি বংগলৈ ঘুৰি গৈছিল (বাংলায় ফিরে গিয়েছেন) আৰু অসম ভ্রমণৰ কথাৰে লিখা তেওঁৰ (তাঁর) কিতাপ "অমৰাবতী আসাম" অসমীয়া ভনী (বোন) প্রগতি শর্মাৰ নামত উচ্ছুর্গা (উৎসর্গ) কৰিছিল।..."

—ব্যস। এই পর্যন্তই থাক। দিলীপবাবু বাধা দেন। ৰবি থেমে যায়। দিলীপবাবু আবার বলেন—পত্রিকাটি পাবার পরেই শঙ্কুবাবু এই প্রতিবেদনের জেরক্স কপি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ব্যাপারটা নিয়ে কিছু অনুসন্ধান করেছি।

—কি জানতে পারলেন, সত্যই আত্মহত্যা ? সুখময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

—তাহলে গোড়া থেকেই বলতে হয়। একটু ভেবে নিয়ে দিলীপবাবু শুরু করেন—

ভাল কলেজে পড়াবেন বলে প্রগতির বাবা তাঁর প্রথম সন্তান প্রগতিকে প্রি-ইউনির্ভার্সিটি পড়াতে জোড়হাট থেকে গুয়াহাটী নিয়ে এলেন। ভর্তি করলেন কটন কলেজে। রেখে গেলেন শহীদ কনকলতা ছাত্রী নিবাসে। সেখানেই আপনার সঙ্গে তার প্রথম দেখা।

দিলীপবাবু আমার দিকে তাকান। আমি মাথা নাড়ি। তিনি আবার বলতে থাকেন—

কিন্তু বাবার আশা পূর্ণ হল না। প্রগতির পরীক্ষার ফল ভাল হল না। সে ফিরে গেল জোড়হাটে। সেখান থেকে জুলজি অনার্স নিয়ে বি. এস. সি. পাশ করল।

এম. এস. সি. পড়াবার জন্য বাবাকে আবার তাঁর আদরের মেয়ে প্রগতিকে পাঠাতে হল গুয়াহাটী। এইসময় একটি মুসলিম ছাত্র ইতিহাস নিয়ে এম. এ. পড়ার জন্য গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এলো।

প্রগতি ফর্সা এবং সুশ্রী, ছাত্রটি কালো এবং দেখতে মোটেই ভাল নয়। কিন্তু সে বেশ স্মার্ট এবং ভাল নাটক করে। তাই প্রগতি তার সঙ্গে মেলামেশায় আপত্তি করে না। কিন্তু মেলামেশার শেষ পরিণতি যে এমন হবে, তা বোধকরি প্রগতি কল্পনাও করতে পারে নি।

তখুনি মেলামেশার কোন দুষ্ট পরিণতি অবশ্য হল না।

পরের বছর ১৯৭৯ সালে 'বিদেশি খেদা'-র নামে সারা আসাম জুড়ে শুরু হল এক সর্বগ্রাসী ধ্বংসযজ্ঞ। ১৯৮০ সালে আন্দোলন আরও উগ্রমূর্তি ধারণ করল। এক অভাবনীয় অনিশ্চয়তায় সারা আসাম ছেয়ে গেল।. স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। রেল-তেল বন্ধ, আপিস-কাছারি কর্মহীন। অনিয়ম অত্যাচার সন্ত্রাস সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ···

তারই মধ্যে গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র য়ুনিয়নের সাধারণ

নির্বাচন ঘোষিত হল। নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করবার জন্য একটি রাজনৈতিক দল সাধারণ সম্পাদকের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সেই ছাত্রটিকে 'নমিনেশন' দিলেন। 'বয়ফ্রেণ্ড'-এর প্রতি প্রগতির আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল।

১৯৮১ সালে ওরা দুজনেই এম. এ. পাশ করল। পরীক্ষার পরেই প্রগতি ফিরে গিয়েছিল জোড়হাট। পাশ করার পরে সে কয়েকমাস স্কুলে শিক্ষকতা করল। তারপরে বিশ্বনাথ চারি আলী কলেজে (জেলা তেজপুর) একটা Lecturership পেল। কিছুদিনের মধ্যেই সে শিক্ষকতায় সুনাম অর্জন করল। খুবই স্বাভাবিক। বাবা অধ্যক্ষ, মা শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষকতা ছিল ওর রক্তে। এবং আমার ধারণা অধ্যাপনার আনন্দসাগরে ভাসতে ভাসতে সে ফেলে আসা জীবনের প্রেমপর্বের অধ্যায়টি প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল। অথবা বলা যায় ঝালুক-বাড়ির 'রোমান্স' জীবনযুদ্ধের মরুবালিতে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু নিয়তির বিধান খণ্ডাবে কি?

'বয়ফ্রেণ্ড' আসাম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে আবার তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। চাপা পড়ে যাওয়া প্রেম পুনরায় অঙ্কুরিত হল এবং কিছুদিনের মধ্যেই পল্লবিত হয়ে উঠল। তারা বিবাহপাশে আবদ্ধ হল। যতদূর জানতে পেরেছি অন্য ধর্মে বিয়ে করায় উভয়পক্ষের অভিভাবকরাই বিয়েতে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন।

পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনের বছর তিনেক নাকি ওরা মোটামুটি শান্তিতেই কাটিয়েছে। এবং প্রগতি দুটি কন্যাসন্তানকে জন্মদান করেছে। বড়টির নাম মল্লি, ছোটটির মিতু।

তারপরেই নাকি স্বামীর আচার-আচরণ বদলাতে শুরু করে। ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশ খসে পড়ে, বেরিয়ে আসে ধর্মীয় গোঁড়ামি। এবং তা কিছুদিনের মধ্যেই প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

অশান্তির আরও একটা কারণ ছিল। প্রগতির স্বামীর তিনটে আগ্নেয়াস্ত্র, তার শিকারের নেশা। আর প্রগতি প্রকৃতি-প্রেমিকা। আকাশ-মাটি পাহাড়-জঙ্গল নদ-নদী পশু-পাখি ও মানুষ, সবই তার

বড় আপন। শিকারকে সে মনে করত নিষ্ঠুরতা। সে বিশ্বাস করত এতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, অকারণে পশু-পাখি হত্যা করলে পাপ হয়। বিয়ের পরে প্রথম দিকে মিঞা কিছুদিন বিবির অনুরোধ রক্ষা করেছে। কিন্তু তারপরে সে প্রায়ই শিকারে যেতে শুরু করল। প্রগতির নিষেধ অমান্য করতে থাকল। ফলে শুরু হয়ে গেল ঝগড়া-ঝাটি।

হঠাৎ স্বামী প্রগতির চলা-ফেরায় বাধা-নিষেধ আরোপ করতে আরম্ভ করল। সে প্রগতিকে পরদানশিন করতে চাইল। প্রতিবেশিদের সঙ্গে মেলামেশায় আপত্তি জানাতে থাকল।

অসহায় প্রগতি হাঁপিয়ে উঠল। অথচ স্বামীর ঘর ছাড়া তার নিশ্বাস নেবার মতো আর কোন আশ্রয় নেই। এই বিয়ের জন্য সে চাকরি ছেড়েছে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। বাপ-মা ভাই-বোন সবাইকে ফেলে চলে এসেছে। কিন্তু তার স্বামী তো সে বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করল না।

অতএব তাকে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, মেয়ে দুটিকে মানুষ করে তুলতে হবে। সংসারের সবকাজ এবং মেয়েদের মানুষ করার মধ্যেই সে পড়াশুনা করে আসাম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসল এবং লিখিত বিষয়গুলিতে পাশ করল। ইণ্টারভিউ পেল। কিন্তু স্বামী তাকে ইণ্টারভিউ দিতে যেতে দিল না।

অনুশোচনা ও হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়ল প্রগতি। মেয়েদের ভবিষ্যত নিয়েই সে বেশি বিচলিত। তাকে বুদ্ধি জোগাবার কেউ নেই। সান্ত্বনা দেবার মতো কোন আপনজন নেই তার। যাকে আপন করার জন্য বাপ-মা ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, সবাই পর হয়ে গেছে, সে-ই আজ তাকে অবিরত আঘাত করছে। এই সময় কানে এলো তার স্বামী জনৈকা পরস্ত্রীর ওপরে আসক্ত।

প্রগতি প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু স্বামীর স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। বরং সে দিন দিন আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে থাকে।

থামেন দিলীপবাবু। ওরা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে।

এবারে আমি বলে উঠি—তাহলেও প্রগতি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

—কারণ?

—প্রথমত মেয়েদেব প্রতি মমতা। দ্বিতীয়ত তার ছিল যেমন সাহস, তেমনি আত্মবিশ্বাস। আত্মহত্যা করার মতো দুর্বল চিত্তের মেয়ে ছিল না সে।

—আমারও তাই বিশ্বাস। দিলীপবাবু সমর্থন করেন আমাকে।

বুলা বলে ওঠে—তাহলে কি তাকে মেরে ফেলা হয়েছে?

—সেটা এখন আর প্রমাণ করা সম্ভব নয়। দিলীপবাবু বলেন—শম্ভুবাবুর কাছ থেকে দুঃসংবাদ পেয়ে আমি ডেপুটি কমিশনারের কাছে একটা Enquiry পাঠিয়েছিলাম। ওরা আমাকে Radiogram পাঠিয়ে জানায়, 'Smti Pragati Sharma daughter of Sri Dwijen Sharma committed suicide after having difference of opinion with her husband...'

—পুলিশ কি প্রগতির স্বামীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করেছিলেন?

—বোধহয় না। কারণ সে একজন প্রভাবশালী সরকারি অফিসার, প্রাক্তন ছাত্র নেতা। এবং একটি রাজনৈতিক দলের আশ্রিতও বটে।

—একটা কথা আপনি কিন্তু বাদ দিয়ে গেলেন। খুকু দিলীপবাবুকে বলে। তিনি তার দিকে তাকান। খুকু বলে—প্রগতি তার স্বামীর বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু সেই বন্দুকের ট্রিগার কে টিপেছে?

—প্রগতি নিজে।

—কোন প্রমাণ আছে?

—নেই। কিন্তু অন্য কোন প্রমাণের অভাবে সেটাই সাব্যস্ত।

—মানে সাব্যস্ত করা হয়েছে?

—হয়তো তাই।

—তা যুক্তিটা কিভাবে সাজানো হল?

—প্রগতির পাঁচ বছরের মেয়ে মল্লি। স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সকালে স্কুল বসে। সেদিন সকাল সাতটায় চা করে এনে প্রগতি স্বামীকে ঘুম থেকে জাগায়। বলে, চা খেয়ে নিয়ে মেয়েটাকে স্কুলে দিয়ে এসো। স্বামী বলে, আমি পারব না। আমার কাজ আছে। তুমি দিয়ে এসো।

এই নিয়ে প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপরে কলহ। ঠিক তখুনি নাকি ওর স্বামী সিগারেট ধরাবার জন্য পাশের ঘরে যায়। হঠাৎ প্রগতির চিৎকার তার কানে আসে, আমি কি করতে পারি? দেখবে? এই যে দেখে যাও···

সে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে ফিরে আসে। দেখে প্রগতি নাকি ঘরের কোণে রাখা গুলিভরা বন্দুকটা চোয়ালে ঠেকিয়ে ধরেছে। বলছে, এই দেখো আমি কি করতে পারি? প্রগতি পা দিয়ে ট্রিগার টিপে দেয়।

বন্দুক গর্জে ওঠে। রক্তাক্ত প্রগতি বিছানায় লুটিয়ে পড়ে।···

দিলীপবাবু আর কিছু বলতে পারেন না। সবাই চুপচাপ। একটা অখণ্ড নীরবতা। আমি শুধু নীরবে ভাবি, সহিষ্ণুতার অভাবে সংসারে প্রতিনিয়ত এমন কত শত অঘটন ঘটছে। তবু আমাদের শিক্ষা হচ্ছে না।

সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করে ববি আবার 'বিস্ময়' পত্রিকা থেকে পাঠ শুরু করে—

'I do my thing
and you do
your thing.
I am not in this world
to live up
to your expectations—
And you are
not in this
world to live
up to mine.
you are you
and I am I.
And if, by chance
we find
each other
its beautiful · '

পাঠ শেষ হলে ববি বলে—প্রগতি মারা যাবার পরে তার ডায়েরিতে এই কবিতাটি পাওয়া গেছে। কবিতাটি উধৃত করে 'বিস্ময়' পত্রিকার প্রতিবেদক মন্তব্য করেছেন, প্রগতি নিজেই তার 'এপিটাফ' (Epitaph) অর্থাৎ কবরের ওপরে কি লিখতে হবে, তাও লিখে রেখে গিয়েছে। জানি না তার স্বামী সেটি লেখাবার ব্যবস্থা করেছে কি না।

আবার সবাই চুপচাপ। একটু বাদে বুলা দিলীপবাবুকে জিজ্ঞেস করে—আপনি এই মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে আর কোন Enquiry করিয়েছিলেন?

—না। তবে কিছুদিন আগে ওদের দুজনের এক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে-ও একজন এ. সি. এস এবং প্রগতির স্বামীর Batchmate. দুঃসংবাদ পেয়ে সে ছুটে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। গিয়ে দেখে, প্রগতি নেই। তার মরদেহ Post-mortem-এর জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সারা শোবার ঘর ও বিছানা জুড়ে রক্ত। তখনও মুছে ফেলা হয় নি। এবং সেদিকে প্রগতির স্বামীর কোন খেয়ালও নেই। Post-mortem শেষে স্ত্রীর মরদেহ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে যাতে কবরস্থ করা যায়, সে তারই ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। এমন কি মা-মরা মেয়ে দুটোর দিকে পর্যন্ত নজর নেই। সে রীতিমত হাঁকডাক করছে, একে-ওকে টাকা দিচ্ছে, ওখানে-সেখানে ফোন করছে আর সবাইকে তাড়া লাগাচ্ছে। তার আচরণ অনেকটা বারোয়ারী পূজামণ্ডপে সম্পাদকের মতো।

বিস্মিত ও বিভ্রান্ত সহপাঠী বান্ধবী ও বন্ধুপত্নীর অন্তিম যাত্রায় অংশ নিয়েছে। অভাগিনী প্রগতির জন্য চোখের জল ফেলেছে। কিন্তু কিছুই করতে পারে নি। কেবল থেকে থেকে তার মনে একটার পর একটা প্রশ্নের উদয় দিয়েছে। অথচ কাউকে সেগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে নি। অবশেষে সেই প্রশ্নগুলো বুকের মধ্যে জমা করে নিয়ে সজল চোখে সে ফিরে গিয়েছে ঘরে। এবং আজও সে প্রশ্ন-গুলোর উত্তর খুঁজে পায় নি।

—প্রশ্নগুলো কি?

—বিছানায় বসে ট্রিগার টিপলে সারা ঘরে এত রক্ত এলো কোথা থেকে? প্রগতির স্বামী ঐ সময়ে বন্দুকে গুলি ভরে রেখেছিল কেন? ওটা তো শিকারে যাবার সময় নয়। প্রগতিকে আত্মহননে উদ্যত দেখে স্বামী তাকে বাধা দিল না কেন? এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পরে কোন স্বামী কি অতখানি সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকতে পারে? স্ত্রীর মরদেহ কবরস্থ করার জন্য কেন তার অত ব্যস্ততা? পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি কিম্বা অন্য কোন কারণে সে কি প্রগতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল?

একবার থামেন দিলীপবাবু। তারপরে আবার বলেন—সবচেয়ে বড়কথা প্রগতি যে নিজেই ট্রিগার টিপেছে, তার একমাত্র সাক্ষী প্রগতির স্বামী। তখন ঘরে আর কেউ ছিল না। এমনকি পাঁচ বছরের মেয়ে মল্লিও নয়।

এবং আপনারা শুনে চমকে উঠবেন, প্রগতির এই আত্মহত্যা কিম্বা হত্যাকাণ্ডের মাত্র মাসছয়েক বাদে তার স্বামী আবার বিয়ে করেছে আর এবারে স্বধর্মে। যতদূর খবর পেয়েছি, নতুন বউকে নিয়ে সে এখন সুখেই সংসার করছে।

আবার আসামের কথা বলতে বসে, যেখানে 'অমরাবতী আসাম' শেষ করেছিলাম, সেখান থেকেই শুরু করতে হয়েছিল। কিন্তু তখন জানতাম না যে বিধাতার বিচিত্র বিধানে 'অলকাপুরী আসাম'-ও সেই একই প্রগতিকে দিয়ে শেষ করতে হবে।

সেদিন আসাম থেকে বিদায় নেবার সময় গুরাহাটী বিমানবন্দরে প্রগতি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল—দমদমে ল্যাণ্ড্ করেই একটা পোস্টকার্ড ড্রপ করে দেবেন।

আগামীকাল বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকতে পারলে সে নিশ্চয়ই বলে বসত—বাড়ি পৌঁছেই আমাকে একটা ফোন করে দেবেন।

কিন্তু হায়, এখন সে যেখানে রয়েছে, সেখানে যে টেলিফোন করা যায় না! তাই তো মনে মনে তাকে বলি—বোনটি আমার! তুমি যেখানেই থাকো, তোমার আনন্দ আর বেদনার স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

এবং আমি তোমার হয়ে জীবনদেবতার কাছে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করে চলেছি—হে মানুষের ভগবান, তুমি প্রগতির মা-মরা মেয়ে দুটিকে প্রগতির মতই প্রাণময়ী করে গড়ে তোলো। তাদের মধ্যেই যেন আমার প্রগতি বেঁচে থাকতে পারে, তার অতৃপ্ত আত্মা শান্তি লাভ করে।

আমি বিশ্বাস করি, জীবনদেবতা আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করবেন আর প্রগতির শাশ্বত-আত্মা শান্তি লাভ করবে।

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়াং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥' (শ্রীগীতা ২/২০)

শরীর হত হলেও আত্মা অক্ষত থাকে। প্রগতিও রয়েছে। রয়েছে অলকাপুরী আসামের আকাশে বাতাসে মাটিতে আর ব্রহ্ম-পুত্রের জলে। রয়েছে আমার বুকের মাঝে।